ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র

ইব্রাহীম খাঁ

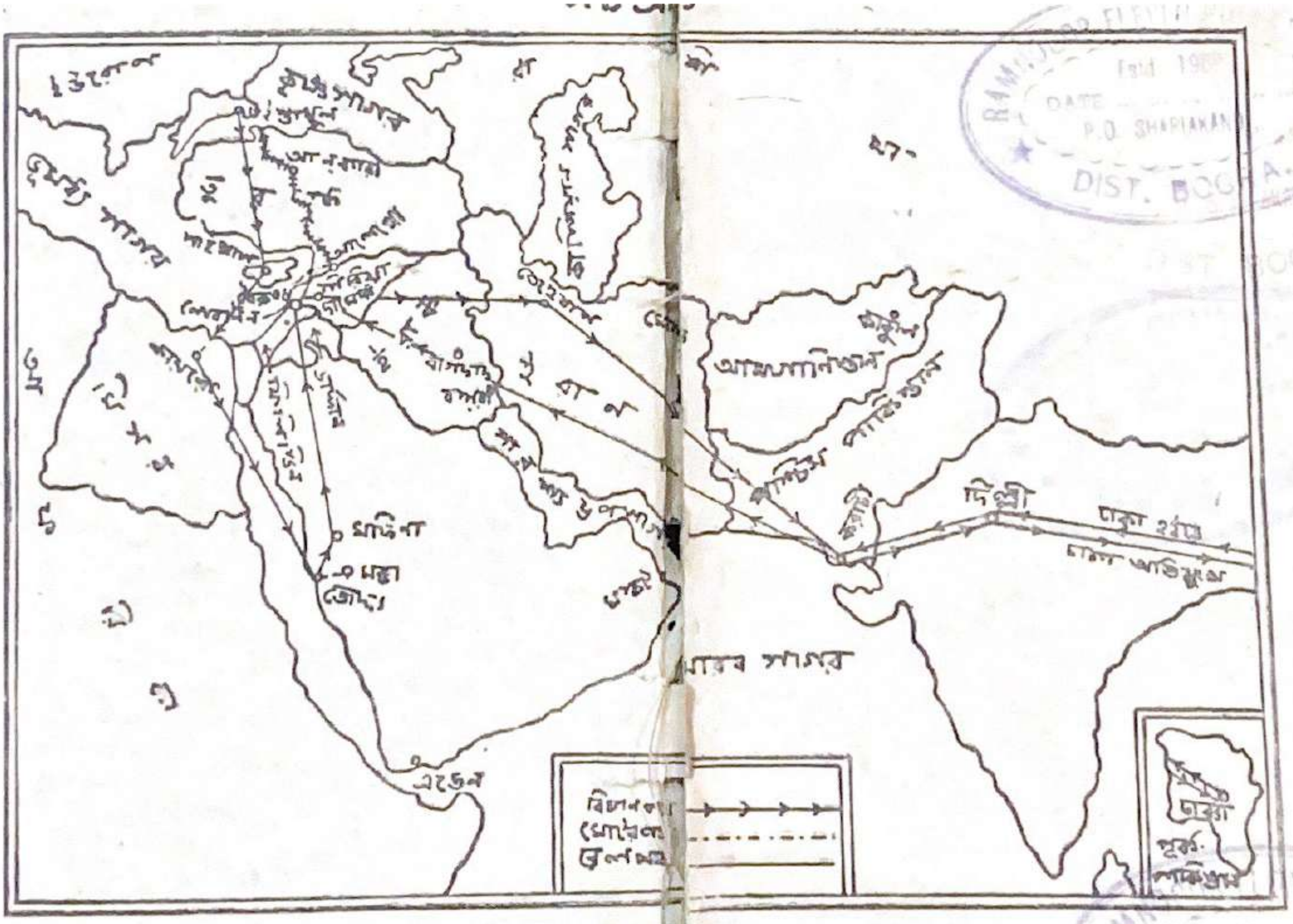
ইউরোপ
কৃষ্ণ সাগর
ইস্তাম্বুল
আনকারা
তুর্কি
ভূমধ্য সাগর
সাইপ্রাস
আলেপ্পো
সিরিয়া
দামেস্ক
বৈরুত
জেরুজালেম
কায়রো
মিশর
লোহিত সাগর
জর্দান
আ ফ্রি কা
মদিনা
মক্কা
জেদ্দা
এডেন
বাগদাদ
বসরা
পারস্য উপসাগর
মাস্কট
কাস্পিয়ান সাগর
তেহরান
ই রা ন
এশিয়া
মেশেদ
আফগানিস্তান
কাবুল
পশ্চিম পাকিস্তান
করাচী
দিল্লী
ঢাকা হইতে
ঢাকা অভিমুখে
আরব সাগর
বিমানপথ
মোটরপথ
রেলপথ
ঢাকা
পূর্ব পাকিস্তান

Estd 19
DATE
P.O. SHARIAKAN
DIST. BOG A.

ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র

RAMNOGOR ELEVEN BULLET CLUB
Estd. 1967
DATE ... ...
P.O. SHARIAKANDI,
DIST. BOGRA.

ইব্রাহীম খাঁ

পাকিস্তান ব্রাঞ্চ
অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস
লাহোর করাচী ঢাকা
১৯৬১

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, আমেন হাউস, লন্ডন, ই.সি.৪
গ্লাসগো নিউইয়র্ক টোরন্টো মেলবোর্ন ওয়েলিংটন বোম্বাই
কলিকাতা মাদ্রাজ করাচী ঢাকা লাহোর কেপটাউন ইবাদান

(Letters from a Traveller to Istanbul
by Ebrahim Khan)

প্রথম প্রকাশ ১৯৫৪

দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৬১

তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৬২

দাম দু'টাকা পঞ্চাশ পয়সা

RAM[illegible] ELEVEN BULLET CLUB
Estd. 1967
DATE ....
P.O. SHA[illegible]
DIST. BOGRA.

মুদ্রাকর ঃ এ. আর. খান, ইডেন প্রেস, ৪২/এ, হাটখোলা রোড, ঢাকা

RAMNOGOR ELEVEN BULLET CLUB
Estd. 1967
DATE ... ...
P.O. SHARIAKANDI,
DIST. BOGRA.

ভূমিকা

ইস্তাম্বুল যাত্রীর অনেকগুলি পত্র আজাদে প্রকাশিত হয়। তখন পাঠক সমাজের অনেকে একে বইয়ের আকারে ছাপাতে পরামর্শ দেন। তাঁদের এই পরামর্শকে কাজে পরিণত করার ব্যাপারে অকসফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস যে সহযোগিতা করেছেন, সেজন্য তাঁদেরে ধন্যবাদ। আর যে সহৃদয় পাঠক বন্ধুদের আগ্রহে আমি এই ছাপান কাজে প্রবৃত্ত হই, আজ তাঁদেরেও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বইয়ে ব্যবহার-করা শব্দের সম্বন্ধে দুটি কথা ঃ

বাংলা শব্দের বানান সহজ করার জন্য বহু বছর হতে একটা তাকিদ চলে আসছে। এই তাকিদের জওয়াবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহজ বানান পদ্ধতি সমর্থন করেছেন এবং ‘পর্বত’, ‘সর্বদা’, ‘উজ্জল’ প্রভৃতি বানানকে জায়েজ করে নিয়েছেন। আমি আরো সহজ বানানের পক্ষপাতী এবং তদনুযায়ী কতকগুলি শব্দের নতুন বানান ব্যবহার করেছি।

আরবী ফারছি হতে নেওয়া শব্দের বানানে ‘ছে’, ‘ছিন’ ও ‘ছোয়াদ’ অক্ষরত্রয়ের বদলে ‘ছ’ এবং শিনের বদলে ‘শ’ ব্যবহার করেছি। কারণ সংস্কৃত ‘স’ দিয়ে ঐ হরফত্রয়ের বদলী দিতে গিয়ে আমরা উচ্চারণে করে ফেলেছি ‘ইশলাম’, ‘কাশেম’, ‘হোশেন’, ‘ইদ্রিশ’—ইত্যাদি। আমার বিবেচনায় ‘ইছলাম’, ‘কাছেম’, ‘হোছেন’, ‘ইদ্রিছ’, লিখনে ভুল কম হয়। ‘ছাদি’, ‘রছুল’, ‘মছনভি’, ‘মছজিদ’ লিখেছি; কিন্তু ‘হিসাব’, ‘সুলতান’, ‘সিরীয়া’, ‘মিসর’ প্রভৃতি শব্দের বানান বাংলা ভাষায় হজম হয়ে গেছে বলে ওগুলির বানান শুদ্ধ করতে চেষ্টা করি নাই।

ইব্রাহীম খাঁ

RAMNOGOR ELEVEN BULLET CLUB
Estd. 1967
DATE ... ...
P.O. SHARIAKANDI,
DIST. BOGRA.

সূচী

পৃষ্ঠা

করাচীর পত্র (১ম) … … ১
বৈরুতের পত্র … … ৬
আলেপ্পোর পত্র … … ১৩
আঙকারার পত্র … … ২২
ইস্তাম্বুলের পত্র … … ৪০
নিকোশিয়ার পত্র … … ৭৩
কায়রোর পত্র … … ৮৭
জেদ্দার পত্র … … ১১৩
মক্‌কা শরীফের পত্র … … ১২২
মদীনা শরীফের পত্র … … ১৫৭
দামেস্কের পত্র (১ম) … … ১৭৩
দামেস্কের পত্র (২য়) … … ১৭৯
তেহরাণের পত্র (১ম) … … ১৮৬
তেহরাণের পত্র (২য়) … … ২০৮
করাচীর পত্র (২য়) … … ২২৪

Estd. 1907
DATE
P.O.
DIST. BOGRA.

ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র

করাচী
২২শে আগস্ট, ১৯৫১

—————————,

আমি ইস্তাম্বুল চল্লাম।

শুনে চমকে উঠলেন, না? উঠবারই কথা। করটীয়ার অন্য বন্ধু বান্ধবেরাও চমকে উঠবেন; অভিমান ভরে ভাববেন, কৈ, আমাদেরও তো উনি আগে কিছু জানান নাই।

এ অভিযোগ করবার অধিকার তাঁদের আছেঃ সিকি শতাব্দী কাল পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে এত অন্তরঙ্গ ভাবে ছিলাম। কিন্তু এ সংবাদ পাওয়ার সব চেয়ে বেশী অধিকার আপনার নিজের।

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে যখন তুরস্কের দুষমনেরা এসে ইস্তাম্বুল জুড়ে বসে, তখন আপনার চোখে ঘুম ছিল না। সে আমলে আপনার আমার সাথে যাঁরা খিলাফত আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের অনেকের স্মৃতি ভান্ডারে আজো প্রীতির সাথে সঞ্চিত আছে আপনার রচিত সেই সুন্দর গানটির কথা—

তোমহারা ছুরজ ডুবু ডুবু হ্যায়,
তভী তোমহারী খবর নাহি হ্যায়.
তখত তোমহারী উলট রহি হ্যায়,
তভী তোমহারী খবর নাহি হ্যায়।

কত সভায় গীত হয়েছিল সেই গান; শুনে কতজনের চোখের পানিতে ভিজে গেছে বুকের বসন!

আসল কথা, ইস্তাম্বুলী দাওয়াতটা এমন আচমকা এসে পৌঁছল, আর তার পরই অফিসের কাজ গোছানো, ছুটীর ব্যবস্থা করা, টীকা নেওয়া, পাসপোর্টের হ্যাঙ্গাম মিটানো ইত্যাদি কাজের এমন বিষম তাড়াহুড়া পড়ে গেল যে আপনাকে লিখবার আর ফুরছৎই হল না।

সেদিন ১৫ই জুন। বিকাল বেলা। নিশ্চিন্তে জয়নাগ রোডের অফিসে বসে কাজ করছি। মনজুরী-দফতরের সহকারী পাশে দাঁড়িয়ে ফাইলের পর ফাইল দেখিয়ে যাচ্ছেন আর খুঁতখুঁত করছেন (কি জানি কেন তার মেজাজটা সেদিন খোশ ছিল না) 'এই দেখুন, স্যার,—স্কুলের মনজুরীর ম্যাদ কবে শেষ হয়ে গেছে, তবু এখনো আবার মনজুরী পাওয়ার জন্য কোন দরখাস্ত নাই। এই রকম ব্যাপার একটি নয়, দুটি নয়, বহু।' আমি সংক্ষেপে বল্লাম 'বটে'। আমি কোন বিরক্তি প্রকাশ না করায় আমার সহকারীর বিরক্তি যেন কিছু বেড়ে গেল। বল্লেন, 'অথচ এঁরা পরে এসে জোঁকের মত ধরে বসবেন। চলতে থাকবে অনুরোধ-উপরোধ, চিঠি-পত্র, সুপারেশ-জিম্মাদার।' আমি সহকারীর দিকে মুখ তুলে চাইলাম। বল্লাম, 'ওঁদের প্রতি আমার ভক্তি ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে, নুরু মিঞা; ওঁরা আমাদের ইজ্জত রক্ষা করছেন।' জিজ্ঞাসু চোখে সহকারী চেয়ে রইলেন। আমি বল্লাম—'স্কুলগুলি আছে বলেই তো এখানে আমি আছি, তুমি আছ, অফিসের বাকি সবাই আছে। এদের গাফলতীর জন্য মনজুরী কেটে দিলে দেশের বার আনা স্কুল মাদ্রাছাই যে উঠে যেত; সাথে সাথে আমাদের আসনও টলটলায়মান হয়ে উঠত। কাজেই নিজেদের স্বার্থেই আমাদেরকে উপযাচক হয়ে ওঁদের মনজুরী নেওয়ার জন্য অনুরোধ-উপরোধ করতে হত। ওঁরা নিজেরা আমাদের ধরপাকড় করেন বলেইতো আমাদের তরফ হতে সে অনুরোধ-উপরোধ

করার দায় হতে আমরা বেঁচে যাই। এখন বল, ওঁরা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র কিনা।'

সহকারীর মন তবু হালকা হল না; তিনি হতাশ হয়ে আত্মসমর্পণ করলেন। ক্ষুণ্নস্বরে বল্লেন—'তা হলে, স্যার, আপনার যা মরজী তাই করুন। তবে এর পর এঁরা কেউ আর আইন মেনে চলতে চাবেন না।' আমি বল্লাম, 'কিন্তু তা হতে পারে না, নূরু মিঞা, আইন এঁদের মেনে চলতেই হবে, আর আমি ছাড়া অফিসের বাকি সবারই কাজ হবে এঁদেরে আইনের পথে পরিচালন করা। একা আমিই এদের বেলায় মাঝে মাঝে আইন ভঙ্গ করব। আইন মেনে চলা বড় জিনিষ, কিন্তু মাঝে মাঝে দরকার মত আইন ভঙ্গ করতে পারা আরো বড় জিনিষ।

আমার কামরার হাওয়া অকস্মাৎ গাম্ভীর্যের পীড়নে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল।

এমন সময় একখানা রেজিষ্টার্ড চিঠি পেলাম।

দেখলাম, করাচীর চিঠিঃ উপরে 'নিতান্ত জরুরী' বলে সীল-মোহর। তাড়াতাড়ি খুলে পড়লাম ঃ বিজলীর ঝলকের মত একটা আনন্দের সূক্ষ্ম প্রবাহ চিত্তের উপর দিয়ে নিমেষে বয়ে গেল। মুখ তুলে বল্লাম—নূরু মিঞা, এখন যাও, জরুরী চিঠি কিনা—আমি একটু ভেবে নেই।

করাচী হতে পাক গণপরিষদের ডিপুটী সেক্রেটারী খোন্দকার আলী আফজাল সাহেব লিখেছেন—ইস্তাম্বুলে আন্ত-পার্লামেন্টারী কনফারেন্সের অধিবেশন আসন্ন—পাকিস্তানের অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে সেই কনফারেন্সে হাজির হওয়ার জন্য আপনাকে দাওয়াত।

আমার জন্য এক ইস্তাম্বুলী দাওয়াতই যথেষ্ট ছিল—তা সে যে উপলক্ষেই হোক: কিন্তু এর উপর আলী আফজাল সাহেব লিখেছেন—'আর যাঁরা যাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে আছি আমি নিজে, আছেন মাননীয় তমিজুদ্দীন খাঁ সাহেব ও পাঞ্জাবের আলী আকবর খাঁ সাহেব এবং এঁরা

এই উপলক্ষে আরব মিশর সিরিয়া ইরানে একটা চক্কর দিয়ে আসতে চান; আপনি এ কাফেলায় শরীক হলে তাঁরা খুশী হন।'

পত্র টেবিলের উপর রেখে ভাবতে লাগলাম। হারানো দিনের হাজারো ছবি মনের মুকুরে ভেসে উঠতে লাগলো।

বালক বয়সের কথা ঃ পাঠশালায় যাই; বাইরের বই পড়তে পারি না, কিন্তু বাড়ীতে মাঝে মাঝে বৈঠক বসে; আশেপাশের শিক্ষিতেরা এসে মজলিস জমায়। পাশে দাঁড়িয়ে তাদের কথা শুনি। রুমের বাদশা, বিরাট তাঁর রাজ্য, অখন্ড তাঁর প্রতাপ। এইটুকু শুনেই একশ রকমের স্বপন মনের আঙ্গিনায় আনাগোনা শুরু করে দেয়। আবার আলোচনা চলে। রুমের বাদশা? ওহ! অমন আর হয়না---।

আনন্দে, গর্বে বুক ফুলে দশ হাত হত। অজ্ঞাতসারে মনে হত, পরাধীন দেশে জন্ম নিয়েছি বটে, তবু আমাদের একটা মস্ত বাদশা আছে; অসময়ে হয়তো তাঁকে পাব। তার পরের কথা। আই-এ পড়ি। ইটালী অকারণে তুরস্কের রাজ্য ত্রিপলীর উপর হামলা করে বসল। সে লড়াই শেষ হওয়ার আগেই গ্রীস, রুমানীয়া, বুলগেরীয়া, খাস তুরস্কই আক্রমণ করে বসল। সমস্ত মুছলিম জাহানে অসন্তোষের উত্তুঙ্গ তরঙ্গ বয়ে গেল। কিন্তু শক্তি মোহমত্ত খৃষ্টান প্রভুরা তা আমলের মধ্যেই আনল না। আমরা হোষ্টেলের ছেলেরা ঈদের ভোজের টাকা, এক মাস নাশ্তা বন্ধ করে তার টাকা, তুরস্কের সাহায্যে পাঠিয়ে দিলাম; ডাক্তার আনছারীর নেতৃত্বে ইস্তাম্বুলে মেডিকেল মিশন গেল। ইটালীর তৈরী টুপি আমরা মাথা হতে নামিয়ে কাড়ি দিয়ে আগুন দিলাম। তারপর এল প্রথম মহাযুদ্ধ। যুদ্ধান্তে আবার তুরস্কের উপর ইংরেজ-ফরাসীর খড়গ উদ্যত হয়ে উঠল—ইন্দো-পাকিস্তানে খেলাফত আন্দোলনের তরঙ্গ উঠল—মুস্তাফা কামাল আজাদীর ঝান্ডা উড়িয়ে দিলেন।

আমাদের অফিসের সহকারী কনট্রোলার মছউদ খাঁ এসে বল্লেন—'স্যার, কী নাকি একটা জরুরী পত্র এসেছে করাচী হতে?' আমি নীরবে

পত্রখানা তাঁর হাতে তুলে দিলাম। তিনি পড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন; বল্লেন—'এ দাওয়াত কিন্তু আপনাকে কবুল করতেই হবে, স্যার; এসব দেশে আপনাকে যেতেই হবে।'

সুন্দর, স্বাস্থ্যবান, শিক্ষিত যুবক মছউদ খাঁ ঃ দেশ ভ্রমণের নেশায় এরাই তো আর সবার আগে পাগল হয়ে ওঠে। আজ তার একজন সহযোগীর দেশ-ভ্রমণের আনন্দের কল্পনাতেও এ অধীর হয়ে উঠেছে।

বল্লাম—'আমারো তো লোভ হচ্ছে; তবে একটু----'। 'আর এর মধ্যে 'তবে' নাই, স্যার, যেতে আপনাকে হবেই—' বলতে বলতে মছউদ খাঁ চঞ্চল পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলেন।

অফিস অন্তে বাসায় ফিরলাম। আঙিনায় পা দিয়েই বুঝলাম, কথাটা আগেই বাড়ীময় ছড়িয়ে গেছে। শুনলাম, এ মছউদ খাঁর কান্ড। তিনি অফিসের বারান্দায় ঘুরে এ সংবাদ প্রচার করেছেন; কাজেই খবরটির বাড়ী এসে পেঁছিতে কোনই কষ্ট হয় নাই। মনে হল, মছউদ খাঁকে পাবলিসিটী বিভাগে দিলেও তিনি ভাল কাজ করতেন।

ছোট ছেলে আমিন দৌড়ে এসে বলল, বাবা আমি কিন্তু তালেব-ইলিম হয়ে গাট্টি নিয়ে সাথে যাব; মেয়ে খালেদা বলল, আর আমি যাব প্রাইভেট সেক্রেটারী হয়ে। বাচ্চা চাকর ছেকেন্দর—সেও এগিয়ে এসে বলল, আমি সাথে না গেলে সাবের কাপড়-চোপড় জুতা ছাতি গোছগাছ করে কে দিবে, শুনি?

১৭ই আগষ্ট ঢাকা হতে করাচী চল্লাম। করাচী হতে মৌলভী তমিজুদ্দীন খাঁ ও মৌলভী খোন্দকার আলী আফজাল—এঁদের সাথে ইস্তাম্বুল রওনা হব এই বন্দোবস্ত।

বৈরুত
২৫শে আগষ্ট, ১৯৫১

———————,

তোমাকে লিখতে বসে ফাঁপরে পড়ে গেছি। অনেকদিন আগের কথা। তখন যৌবনের প্রথম উন্মেষ। একদিন একটা মাসিকে পড়লাম ঃ

এ পারেতে চখা ওপারেতে চখী
মাঝখানে স্রোত বহে,
চখা ডাকে চখী চখী ডাকে চখা
তার পর চেয়ে রহে।

ভাল লেগেছিল। তারপর অনুভব করলাম, ওদের ও-জীবনের ছায়া মানুষের জীবনেও এসে পড়ে—একান্ত সক্রিয় ভাবেই।

বহুদিন পর আজ সেই কবিতার কথা মনে পড়ল। অতীতের দিকে বেদনার্ত চিত্তে ফিরে চাইলাম। দেখলাম, সেই নদী আছে, নদীর এপার-ওপার সেই চর আছে, চরে চরে সেই চখা চখীও আছে, কিন্তু সে ডাকাডাকি আর নাই; যেটুকু আছে, তাতে সে নিবিড়তার অভাব। ব্যবধানের ছোট্ট স্রোতস্বিনী হয়তো বিশাল বারিধিতে বিস্তার লাভ করেছে, কিন্তু এ বারিধির বুকে আগের সে বীচি-বিক্ষেপ কোথায়?

ভূমধ্যসাগরের তীরে বসে বার বার তাই ভাবছি, আজ এতদিন পর তোমায় কি নাম ধরে ডাকি?

তোমার সাথে প্রথম যেদিন আমার পরিচয় ঘটে, তখন হতে তারপর বহুকাল পর্যন্ত আমার পত্রে তোমাকে যে-ভাষায় সম্বোধন করতাম, তার শেষ অক্ষরের অন্তে বরাবর থাকত একটি আ। ভাবলাম, আজ সেই

ভাষার কোন একটিতে সম্ভাষণ করলে হয় না? মন বলল, 'না, তা হয় না; এখন তোমার কাছে আর তিনি তা নাই।'

চমকে উঠলাম। মন পুনরপি বল্ল ঃ 'অবাক হচ্ছ? তাঁর কাছেও যে তুমি আর তা নাই।'

আর্তকণ্ঠে বল্লাম ঃ 'না—না—না; তা হয় না; তা হতে পারে না ঃ আমরা আজো দুইয়ে দুইয়ের কাছে তাই-ই আছি।'

কিন্তু মনের ধুকধুকি গেল না। সন্দেহ সমাকুল চোখে ভিতরের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করলাম। 'একি! তাই তো মন, তাই তো! তোমার কথাই বুঝি ঠিক হয়!!'

নব-সৃষ্টির যে মহান ব্রত নিয়ে আমরা একে অন্যের সাথে একদা হাত মিলিয়েছিলাম, আজ তা উদ্‌যাপনের পথে। তাই তোমার আমার অজ্ঞাতসারে নির্মমভাবে আমাকে পেছনে ফেলে সেই দিকে দুর্বার গতিতে তুমি এগিয়ে চলেছ। কিন্তু এ তোমার অপরাধ নয়। আমিও তাই করছি। এ দুনিয়ার সবাই তাই করে।

তারপর? তারপর—একদিন—

বিদায়!

জানি, তুমি একথা শুনে শিউরে উঠবে। বলবে, সংসার তবে এমন নিষ্ঠুর? আমাদের এই মরণপণ তপস্যা, এর কোন ফলই আমরা ভোগ করে যাব না? কিন্তু মন কি বলে শুনবে? বলে—এই যে সেবার সুযোগ পেয়েছে, ইহজন্মের এই-ই পরম লাভ, চরম সার্থকতা। জীবনের এই যে EX-1 এত আনন্দ কোলাহল, এই যে অভিধানে উক্ত অনুক্ত, সম্ভব অসম্ভব কল-ভাষণে এত কাল পরস্পর ডাকাডাকি, ও-সমস্তই ঐ নবাগতদের আবাহন সংগীত, ওদেরই আগাম অভিনন্দন।

পারিবারিক পরিবেশের সীমারেখা হতে বহু—বহুদূরে বসে আছি এই সাগর পারে। এর ঊর্ধ্বে অগণ্য তারকা খচিত অনন্ত আকাশ, নিম্নে একদিকে সীমাহীন সমুদ্রবক্ষে অনন্ত তরঙ্গমালা, অন্যদিকে দিগন্ত-

বিস্তৃত প্রান্তরবুকে পাহাড় পর্বতের অনন্ত বিথার। এখান হতে একবার তোমার দিকে ভাল করে দৃষ্টিপাত করলাম। নিশ্চিত বুঝতে পারলাম, তোমার চিত্তের যে-মধ্য আসনে একদা আমি একা বিরাজ করতাম, আজ সেখানে আমি আর একক নই। তোমার সৃষ্টির সহায়ক রূপে তোমার চিত্তের দিগন্তে একটু ঠাঁই পেয়ে আমি নীরবে দাঁড়িয়ে আছি।

আহ!

আবার একটা অকারণ 'আহ!' আসলে তো এতে আফছোছের কিছু নাই। বিদায় বেলায় মানুষ তো দিগন্তে দাঁড়িয়েই শেষ দেখা দেখে যায়। সেবা-তৃপ্তদের মুখের হাসির ছায়াটুকুকে চরম সম্বলরূপে বুকে ধরেই তো তাকে সীমান্ত হতে মহাযাত্রা করতে হয়।

কিন্তু----। আচ্ছা, এখন এসব থাক।

হ্যাঁ, তোমাকে—আ—বলে কেন সম্বোধন করলাম, তার সবটা খুলে বলা হল না।

তোমাকে আগে যা যা বলে সম্বোধন করতাম তার সবই চলে গেছে কি না, এখন আছে কেবল শেষের ঐ—আ টুকু, তাই।

তোমাদেরে আ বলে সম্বোধন করার আরো কিন্তু ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক, সংগত অসংগত উপসংগত অনেক কারণ আছে।

অকস্মাৎ বিস্ময়কর কিছু দেখলে বা শুনলে আমরা অলক্ষ্যে বলে উঠি —আ---। ইতিহাসের সুদূর অতীত হতে তোমরা হয়ে আছ বিশ্বের মূর্তিমান বিস্ময়।

তোমরা এ দুনিয়ার আ---।

প্রাচীন ইংরেজী সাহিত্যের একটা গল্প মনে পড়ল। এক খেয়ালী রাজা একদা রাজ্যময় ঘোষণা করে দিলেন, সব চেয়ে অদ্ভুত কথা যে বলতে পারবে, তাকে তিনি মস্ত একটা পুরস্কার দিবেন। লেখক মহলে রি—রি পড়ে গেল। দিস্তায় দিস্তায় অদ্ভুত কাহিনী লেখা শুরু হল ঃ হাতী-গেলা আজদাহা, জাহাজ-গেলা হাংগর, আকাশ-ঢাকা সিমোরগ,

প্রশান্ত মহাসাগরে হাটু-পানি-করে-দাঁড়ানো উজের সূর্যের-আগুনে-তুলে ধরে তিমি ভেজে খাওয়া—ইত্যাদি, ইত্যাদি। গাড়ীতে গাড়ীতে সে সব গ্রন্থপুঞ্জ এসে রাজ দরবারে হাজির হল। পণ্ডিতেরা সে সব নিয়ে গবেষণায় লেগে গেলেন। দেখা গেল—এক নিতান্ত নতুন লেখক; তিনি লিখে পাঠিয়েছেন মাত্র একটি ছতর ঃ 'বসবার কামরা—কয়েকজন তরুণী—চুপচাপ, নিশ্চুপ।' রাজা শুনে বলে উঠলেন 'আ----!' পুরস্কার ইনিই পেলেন।

আ—এর মহিমা আছে।

নির্মমভাবে চলেছে ট্রয়ের লড়াই। রাজা প্রায়াম, তাঁর উজীর নাজীর, পাত্রমিত্র এমন একজনও নাই যাঁর কোন না কোন আপন জন এ লড়াইয়ে গ্রীকদের হাতে প্রাণ না দিয়েছে। তাঁরা একত্র বসে বিষণ্ণ মনে লড়াই দেখছেন আর বলাবলি করছেন—'একটা তুচ্ছ নারী হেলেন—তারই জন্য ধন, জন, রাজ্য, সব নিপাতে চল্ল!' এমন সময় সেখানে এসে হাজির হলেন স্বয়ং হেলেন। সবাই চোখ তুলে চাইলেন, অজ্ঞাতে বলে উঠলেন 'আ---!' সে আ--- তাঁদের সমস্ত দুঃখ বেদনাকে মুহূর্তে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল। হেলেন চলে গেলে বলাবলি শুরু হল ঃ 'হ্যাঁ, এমন নারীর জন্য ধন, জন, রাজ্য বিসর্জন দেওয়া যেতে পারে।'

শিরীনকে আচমকা দেখে ফরহাদ বিস্ময়ে বলে উঠলেন 'আ---।' কি ছিল সেই একটি আ---এর মধ্যে, তারই জন্য ফরহাদ আমরণ পাহাড় কেটে গেলেন!

কিন্তু শোন, অবান্তর বকে বকে আসল কথাই ভুলে গেছি। আর উপরের ঐ নীল বাগানে ফোটা অগণ্য আলোর ফুল, নিশীথের বুকের এই গম্ভীর অন্ধকার, সাগরের ঐ নৃত্যপরায়ণ তরঙ্গ, আর পাহাড়ের গায়ের ঐ বিজলীর ঝিলিমিলি—এসব দেখে যদি ক্ষণেকের জন্য আসল কথা ভুলেই যাই, তবে দোষই বা দেই কাকে?

হ্যাঁ এই-ই ভাল হয়েছে ঃ রাতের নিরিবিলির সুযোগে ঐ যে চিন্তার

বাচাল কীটগুলি জড়ো হয়ে মগজের মধ্যে কিলিবিলি শুরু করেছিল, ওরা আজ প্রভাতের সঙ্গেই উধাও হয়ে গেছে।

এখন করাচী হতে বৈরুত পর্যন্ত পথঘাট সম্বন্ধে কিছু কিছু তোমায় লিখছি।

২৪শে আগষ্ট ভোর ৮টায় প্যান-আমেরিকান হাওয়াই জাহাজে আমরা তিন জন রওয়ানা হলাম। জাহাজে বাঙ্গালী আমরা এই তিন জনই, বাকী প্রায় সবাই আমেরিকান আর চীনা। তবে এ চীনারা এত চীনা হয়েও সবাই অচিনা।

একটা চীনা মেয়ের কোলে ছেলে কেঁদে উঠল, কান পেতে দিলাম —দেখি কোন্ ভাষায় কাঁদে। ওরে বাবা, এ যে বাঙ্গালী ঘরের ছেলের কান্নার মত! একটুও তফাৎ নেই। এরই মধ্যে এক আমেরিকান মেম সাহেবের কোলের বাচ্চা কেঁদে উঠল—ঐ একই ভাষায় কান্না। ভাবলাম —মানুষের মনের যে গভীর তল সেখানে হাসি আর কান্না পাশাপাশি বাস করে। সেখানে বুঝি সব মানুষই সমান। তবু বাইরের তুচ্ছ জিনিষ নিয়ে মানুষ হানাহানি করে; মাঝে মাঝে তার হৃদয়ের তলদেশে যখন আলোড়ন জেগে ওঠে তখন সে সব ভুলে গিয়ে দুশমনের হাসি-কান্নার শরীক হয়ে পড়ে। এই যে সেদিনও দাঙ্গার সময় হিন্দুকে রক্ষা করতে গিয়ে মুছলমান জান দিল, আর মুছলমানকে রক্ষা করতে গিয়ে হিন্দু জান দিল, এ তারই প্রমাণ।

Ex-2

জাহাজ হতে নীচে দেখলাম কেবল পাহাড়, মরুভূমি আর দরিয়া। বাংলার বাইরে আর কোথাও বাংলা দেখলাম না। বেলা ২টায় এসে বাছরায় পৌঁছলাম। এক ঘন্টার জন্য নামলাম। হাওয়া যে এত গরম হতে পারে, এর আগে জানা ছিল না। রুমাল দিয়ে চোখ ঢেকে তবে বসবার ঘরে গেলাম। স্থানীয় লোকেরা বল্ল, হাঁ, হাওয়া একটু গরমই হয়েছিল, তবে আজ কম। তমিজুদ্দীন খাঁ সাহেব রুমাল দিয়ে মুখ ঢেকে চলতে চলতে বলেন এই জন্যই তো আরবেরা অত বড় রুমাল দিয়ে

মাথা, কান, মুখ ঢেকে রাখে।

বাছরা গোলাবের জন্য বিখ্যাত। হাওয়াই ষ্টেশনে গোলাবের কোন চিহ্ন দেখলাম না। তবে বাছরার খেজুর বন লক্ষণীয়। মাইলের পর মাইল খেজুরের সারি চলেছে। এখানকার খেজুর বিখ্যাত। বাইরে রফতানী হয়। এখানকার পাকিস্তানী প্রতিনিধি মিঞা আবদুল্লা আমাদেরকে কিছু খেজুর জুটিয়ে দিলেন।

ঐ দিনই করাচীর ঘড়ির ৬॥ টায় বৈরুতে পেঁছিলাম। বৈরুতের ঘড়িতে তখন ৩॥ টা বাজল। দামেশ্কের পাকিস্তানী প্রতিনিধি এসে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। ষ্টেশন হতে সেন্ট জর্জ হোটেলে এসে উঠলাম। শহর দেখবার তেমন সুযোগ হল না। কিন্তু যেটুকু দেখলাম বেশ লাগল।

লেবানন ছোট রাজ্য, লোক সংখ্যা ২০ লাখের কাছাকাছি (টাঙ্গাইল মহকুমার লোকসংখ্যা ১২ লাখ)। বৈরুত লেবাননের রাজধানী। বৈরুতকে পর্বত-সমুদ্রের শহর বলা চলে। বহু বাড়ীঘর একদম সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে ঠেকেছে। আবার বহু বাড়ীঘর পর্বতের গায় ও মাথায় ছড়িয়ে আছে। অত্যন্ত ঘন দালান কোঠা। হাওয়াই জাহাজ হতে মনে হল, মাছি ছাড়া একটা বিরাট চাক ছড়িয়ে পড়ে আছে। হোটেলটি সমুদ্রের একদম উপরে। দেখলাম তখনো কম-ছে-কম শ খানেক লোক সমুদ্রে ঝাঁপাঝাঁপি করছে। কেউ কেউ সাঁতার কাটছে, কেউ কেউ নৌকা বাইছ দিচ্ছে, কেউ কেউ পানি-পলো খেলছে। নৌকার উপর কেউ কেউ শুয়ে রোদ-গোছল করছে। এদের অনেকের বয়স ৪০ হতে ৫০—যে বয়সে আমাদের দেশের লোকে জোরে হাঁটতে মর্যাদার হানি হয় মনে করে। এরা খৃষ্টান—অনেক বিদেশীও আছে। দুরন্ত প্রাণশক্তির দুরন্ত বিকাশ! এরা মেহনত করে, শরীর গড়তে জানে, তার পর সে শরীরকে অসুরের মত কাজে খাটিয়ে নিতে জানে। দেখলাম, ৩টি পাদ্রী এলেন—গায় লম্বা আলখেল্লা। পানির পাড়ে এসে আলখেল্লা খুলে রাখলেন; নীচে সাঁতারের

পোশাক। তারপর পানিতে লাফিয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ দাপাদাপির পর উঠে আবার আলখেল্লা পরে গম্ভীর ভাবে চলে গেলেন। ছেঁড়া কাপড়, রোগা শরীর, হাসিহীন মুখ—এ না হলে ধার্মিক হওয়া যায় না, একথা এরা বিশ্বাস করে না।

লেবানন পার্লামেন্টের ডেপুটী প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলাপ হল। খৃষ্টান, কিন্তু মাথায় তুর্কি টুপি। তাঁর সাথে আলাপের মর্ম—লেবাননের বাসিন্দাদের মধ্যে আধা মুছলমান, আধা খৃষ্টান, লেবানন পার্লামেন্টের ভাষা আরবী। লেবানন স্বাধীন হয়েছে ১৯৪৫ সালে। তার আগে ফরাসীরা উস্কানী দিয়ে দিয়ে খৃষ্টান-মুছলমানে দাঙ্গা বাধিয়ে দিত। তারা চলে যাওয়ার পর অমন দাঙ্গা আর একটিও হয় নাই। এখন মুছলমান-খৃষ্টান পরম হৃদ্যতার সঙ্গে বাস করছে। বৈরুতে দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়—একটি আমেরিকানদের, একটি ফরাসীদের। বিশ্ববিদ্যালয় গরমের জন্য বন্ধ আছে। শতকরা ৭০ জন লোক লেখাপড়া জানে। প্রাথমিক শিক্ষা সত্বরই বাধ্যকরী হবে। পোশাক পরিচ্ছদে লোক অনেকটা পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হয়েছে; কিন্তু অন্তরে তারা তাদের প্রাচ্য বৈশিষ্ট্য হারায় নাই। বৈরুতের হাওয়া নিতান্ত স্নিগ্ধ। এই পাহাড়-দরিয়ার লোভে প্রতি বছর হাজার পঞ্চাশেক লোক য়ুরোপ-আমেরিকা হতে এসে বৈরুতে দুই এক মাস থেকে যায়। ব্যবসা-বাণিজ্য স্থানীয় লোকের হাতে—এখানে য়ুরোপীয় সদাগরেরা এসে দাঁত বসাতে পারে নাই। আজ রাত্রে লেবাননের প্রেসিডেন্ট একটা ভোজ দিচ্ছেন। আলী আফজাল সাহেব বলছেন, তৈয়ার হয়ে পড়ুন।

রাত সাড়ে দশটায় খানা শেষ হল। দরিয়ার উপর হোটেল। হোটেলের বারান্দার নীচে ছোট, বড়, মাঝারি, নানারকম ঢেউ এসে আছাড় খেয়ে পড়ছে। উপরে পরিষ্কার আকাশ, সেখানে হাজার হাজার তারা ঝলমল করছে, পাশে বৈরুতের পর্বত, পর্বতের গায়, মাথায় হাজার হাজার বাড়ীতে বিজলী বাতি আকাশের তারার সাথে পাল্লা দিয়ে দুলছে।

এই পরিবেশের মধ্যে বসে আমরা খাওয়া শেষ করলাম। পর্বতের গায়ের আলোগুলি আমাদের হাতছানি দিচ্ছিলো। খাওয়ার পর পর্বতের দিকে মোটরে চল্লাম। আঁকাবাঁকা সুন্দর পাকা পথ, পথের দুই ধারে সিডার গাছ। বৈরুতের পাইন মাইলের পর মাইল চলেছে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে আমরা সাড়ে তিন হাজার ফুট উপরে চলে গেলাম। পথে কমপক্ষে শ দুই-আড়াই মোটরের সঙ্গে দেখা হল, ওরা নেমে আসছিল। পথের দুই ধারে মাঝে মাঝে বাড়ী, চায়ের দোকান, খাবার হোটেল। একদম উপরে গিয়ে পেলাম একটি ফোয়ারা—পাথরের এক বিরাট ফাটল হতে উঠে পিচকারীর পানির মত সাদা চূর্ণ হয়ে প্রায় বিশ হাত দূরে লাফিয়ে পড়ছে। পর্বতে যাত্রাকালে গরমে মনে হচ্ছিল শিরওয়ানীটা খুলে রেখে এলে ভাল ছিল; পর্বতের উপরে গিয়ে মনে হল, একটা গরম কোট না এনে কি বোকামিই না করেছি! রাত ১টায় হোটেলে ফিরলাম।

২৫শে আগষ্ট, ভোর। সমস্ত পর্বত আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে আছে। ঘুম নাই কেবল সমুদ্রের চোখে---একই তালে সে তার তরঙ্গশিশু নিয়ে খেলা করছে। এত সকালেও কয়েকটি ছেলে গিয়ে সে তরঙ্গ-শিশুদের সাথে খেলায় মেতেছে।

আমরা কাপড় পরে তৈয়ার হচ্ছি। ঘন্টা খানেকের মধ্যে দরিয়ার কিনারের পথ ধরে মোটরে আলেপ্পোর দিকে চলবো।

আলেপ্পো
২৬শে আগষ্ট, ১৯৫১

আমিন,

করাচী-বৈরুত ভ্রমণ কাহিনীর কথা তোমার মাকে লিখেছি, নিশ্চয় পড়েছ। আজ তোমাকে লিখব বৈরুত-আলেপ্পো ভ্রমণ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ।

ছোট বেলায় শেখ ছাদীর লেখায় হলব শহরের কথা পড়েছিলাম।

আলেপ্পো নামেরই আরবী সংস্করণ হচ্ছে এই হলব। আলেফ লায়লার কেচ্ছা কাহিনীতেও এই হলবের কথা বহুস্থানে মিলে। কেমন করে জানি না, আমার মনের কোণে হলব শহর এক মায়াময় রূপ নিয়ে বহুকাল থেকে চুপচাপ বসে আছে। হলব কি আরব জগতের কামাখ্যা-কামরূপ ? ওখানে গেলে মানুষ ফিরে না ? মায়ার ফাঁদে পড়ে যায় ?

সেই হলব শহরে চল্লাম ভেবে মন উল্লসিত হয়ে উঠল। আরো উল্লসিত হয়ে উঠলাম এই ভেবে যে ভূমধ্যসাগরের কিনারে কিনারে আমরা বহুদূর চলতে পারব।

আটলান্টিকের উত্তুঙ্গ তরঙ্গভঙ্গ, প্রশান্ত মহাসাগরের বিশাল বিথার—এসব ভেবে মন বিস্ময়ে ভরে ওঠে। কিন্তু ভূমধ্যসাগরের কথা ভাবতেই মনে জেগে ওঠে অতীত যুগের হাজারো স্মৃতির অপরূপ চিত্রমালা।

Ex-3 মানব ইতিহাসের প্রথম ঊষার সেই ধূসর যুগ হতে শুরু করে শতাব্দীর পর শতাব্দী জ্বলেছে এই সাগরের তীরে তীরে বিচিত্র সভ্যতার অনির্বাণ দীপশিখা; আর দুনিয়ার দিকে দিকে বিকীর্ণ হয়েছে তার অজস্র আলোক রশ্মি মিসর আর কার্থেজ, গ্রীস আর রোম—এই সব জনপদের ভুবন বিখ্যাত সভ্যতার জন্ম ও বিকাশ ঘটেছিল এই বারিধিরই পারে পারে। এই দরিয়া পাড়ি দিয়ে সীজার, এন্টনী মিসর বিজয়ের অভিযান করেন।

গ্রীস রোমের অতীত কীর্তিকাহিনীর কথা ভেবে কবি হেমচন্দ্র কোন্ কালে কবিতা লিখেছিলেন ঃ আজ তারই দু'চার স্তবক স্মৃতির সায়রে ভেসে উঠল ঃ

মারাথন থার্মপলী হয়েছে শ্মশানস্থলী
গিরিস আঁধারে আজ পোহাইছে রাতি,
এই কি কালের গতি, এই কি নিয়তি?

RAMNOGOR ELEVEN BULLET CLUB
Estd. 1967
DATE ... ...
P.O. SHARIAKANDI,
DIST. BOGRA.

* * *

দুর্দোণ্ড প্রতাপ আজি কোথায় সে রোম
কাঁপিত যাহার তেজে মহীসিন্ধু ব্যোম?

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী ছিল মুছলমানদের নৌ-প্রভুত্বের যুগ, আর সে নৌ-প্রভুত্বের লীলাভূমি ছিল এই ভূমধ্যসাগর। উটের জাহাজে চড়ে এত কাল যারা পাড়ি দিয়েছে কেবল শুষ্ক মরু, সেই জাতি ইছলামের অভ্যুদয়ের অল্পকাল মধ্যে কি করে সাগরের দুস্তর বুকে নিজ প্রভুত্ব স্থাপন করে বসল, এ ইতিহাসের এক নতুন বিস্ময়। ৬৪৯ খৃষ্টাব্দে মুয়াবিয়া ইবনে আবি ছুফিয়ান এক নির্ভীক নৌবাহিনীসহ সাগর তরঙ্গে ভাসেন ও সাইপ্রাস দ্বীপ দখল করে নেন। তাঁরই শাসন কালে আরব নৌবাহিনী রোড্স অধিকার করে। খলীফা ওলীদের আমলে ক্রীট, সিসিলী, মেজরকা ও মিনরকা দ্বীপে আরব প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। তারপর শুরু হয় ইস্তাম্বুল অবরোধের অভিযান ঃ বারবার খলীফাদের রণতরী এই ভূমধ্যসাগরের তরঙ্গের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে প্রাচ্যরোমক সাম্রাজ্যের গর্বিত রাজধানীর দুয়ারে গিয়ে হানা দিয়েছে। দীর্ঘ দুই শতাব্দীকাল পর্যন্ত মুছলিম শাসনের ছায়াতলে সিসিলীর ধন-জন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-বাণিজ্য অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করে। ৮৪৬ সালে এই সিসিলী হতে এক আরব নৌবাহিনী গিয়ে টাইবার নদীতে প্রবেশ করে, তারপর রোমের দুয়ারে প্রচণ্ড আঘাত হানে; সম্রাট দ্বিতীয় লুই তাড়াতাড়ি সৈন্য নিয়ে এসে তবে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করেন। এ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ নৌ-বীর ছিলেন গোলাম জারাফা। ইনি বাইজেণ্টাইন সম্রাটের নৌবাহিনীকে বার বার পর্যুদস্ত করে ছাড়েন। তারিক এই সাগরেরই একাংশ পার হয়ে তাঁর দুর্বার বাহিনীসহ স্পেন বিজয়ের পথে জিব্রাল্টারে অবতরণ করেন। নেপোলিয়ান বোনাপার্টীর জন্ম হয়েছিল এই সাগরেরই একটি দ্বীপের অঙ্গনে। একদিন তুরস্কের বলদর্পিত নৌবাহিনী

এই সাগরেরই বুকে সগর্বে টহল দিয়ে ফিরেছে। মিসরের মুহম্মদ আলী পাশা এই সমুদ্রেরই তরঙ্গ-দোলায় তাঁর রণতরী নিয়ে গ্রীসের উপকূলে নিদারুণ আঘাত হেনেছিলেন। ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন তাঁর আমলের উল্লেখ করে বলেছেন—'ভূমধ্যসাগরে খৃষ্টানেরা একটা তক্তা ভাসাতেও আর পারছে না!' ইতিহাসের এমন অতুল্য ঐশ্বর্যে গরীয়ান ভূমধ্যসাগরের তীর বেয়ে আমরা আজ বেলা সাড়ে দশটায় মোটর-যোগে বৈরুত হতে আলেপ্পো পানে যাত্রা করলাম। বিদেশে টাকাপয়সা বদল এক মস্ত ঝামেলার কাজ। পাকিস্তানের টাকা বৈরুতে চলে না, বৈরুতের টাকা আঙ্কারায় চলে না—ইত্যাদি। এই সব সামাল দিতেই ঘণ্টা দুই চলে গেল।

ভাবলাম, রোদ উঠে পড়ল, পথে না জানি কত ভুগতে হয়। কিন্তু আসলে গরম তো লাগলই না বরং যে পথে চল্লাম, যেতে যেতে মনে হল, এমন পথ পেলে আমরণ চলার আনন্দে মেতে থাকা চলে।

আমাদের মোটরের পথ ভূমধ্যসাগরের একদম কিনার দিয়ে। দরিয়ার সীমা কখনো গাড়ীর পথ হতে শ-দেড়-শ হাত, আবার কখনো মাত্র দশ পনর হাত দূরে। দুরন্ত তরঙ্গ-শিশুরা পাড়ের সাথে যে অবিরাম পানি ছিটাছিটিতে মেতে আছে, তার দু'চারটী ফোঁটা বুঝি আমাদের গায় এসেই পড়ে। ম্যাপের সমুদ্রের সীমা আছে, চোখের সমুদ্রের সীমা নাই, কেবল নীল আর নীল; ধু-ধু দূরে গিয়ে আকাশের নীল আর দরিয়ার নীল এক হয়ে গেছে। অনন্তের বুকে প্রকৃতি সাময়িক ভাবে এই অন্তের সীমারেখা এঁকে না দিলে চোখ ফাঁপর হয়ে মরত।

Ex-4.

পথে চলতে চলতে আবার মনে হল, এই সেই ভূমধ্যসাগর, মানব সভ্যতার প্রথম প্রভাত হতে যে যুগে যুগে তার বুকে বহন করে এসেছে কত বিজয়ী বীরের বিক্রান্ত বাহিনী, কত সিন্ধবাদের অচিন পথে যাত্রা-করা বিচিত্র বাণিজ্যবহর। পথের এক পাশে সাগরের এই অনন্ত

বিথার, অন্যপাশে কেবল পাহাড় আর পর্বত, পর্বত আর পাহাড়; মাঝে মাঝে মনে হয়, এরো বুঝি অন্ত নেই। সেই পাহাড় পর্বতের কোল বেয়ে সাগর বুকের বিচিত্র তরঙ্গলীলা দেখে দেখে চলেছে রেলগাড়ী—আমাদের পথ হতে কখনো ৫০ হাত, কখনো শ-দেড়শ হাত দূর দিয়ে।

মোটর পথের দুই পাশে কখনও পাইন গাছের সারি, কখনও নলখাগড়ার বনরেখা, বেশীর ভাগ জায়গাতেই মুক্ত দৃষ্টির অবাধ রাজ্য। দরিয়ার পাড় ঘেসে সুন্দর আবাদ—কলা, আনজীর, আঙ্গুর। কলাগাছগুলি ছোট ছোট কিন্তু অত্যন্ত প্রাণবন্ত, ছড়া গিয়ে মাটিতে ঠ্যাকে ঠ্যাকে। পথে পথে এখানে সেখানে ফুলের মত সুন্দর ছেলেমেয়েরা পাইনের পাতার কুঁড়ে বেঁধে বসে আছে। গাড়ী দেখলেই ঝুড়ি ঝুড়ি ফল নিয়ে এসে সামনে ধরে আর বনের পাখীর মত সঙ্গীতময় কল-কোলাহলে বলে ওঠে—নাও, মুছাফির, নাও, তোমাদের জন্যই এ-সওগাত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। মনে হয়, এদের কাউকে ফিরিয়ে না দিয়ে ওদের সব কিনে নেই আর ওদের কাছ থেকে এই সওদা কিনতেই বার বার এ পথে ফিরে আসি।

একজনের কাছ থেকে কিছু আনজীর কিনলাম। অদ্ভূত সস্তা আর মিষ্টি। আলী আফজাল সাহেব স্নেহময় পিতা—আনজীর হাতে নিয়ে বল্লেন, ওহ, ছেলেমেয়েরা এসব পেলে খুশীর হল্লায় হাট বসিয়ে দিত। তমিজুদ্দিন খাঁ সাহেবের বাড়ীতে ছোট ছেলেমেয়ে নেই, তবু তিনি কার কথা যেন মনে করে ক্ষণিকের জন্য বিমনা হয়ে পড়লেন। এই দূরদেশের পথের পাশে আমাদের জন্য যারা এন্তেজারীতে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের অন্ততঃ একজনের কাছ থেকেও যে কিছু কিনতে পারলাম, এই আনন্দে আমি সমস্ত ভুলে গিয়ে কখন যে অজ্ঞাতসারে আনজীরের ঝুড়ি কাবার করে ফেল্লাম, তা বুঝতেই পারলাম না।

আর খানিকদূর গিয়ে পথের পাশের একটা ছোট দোকানের কাছে

থামলাম—চা পাওয়া যায় কিনা, এই খোঁজে। গাড়ী থামলেই আমরা নেমে পড়তাম। আশেপাশের লোকেরা তখনই আমাদেরে ঘিরে ধরত পরম কৌতূহলে।

দোকানের লোকেরা আমাদের সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞেস করতে লাগল। যখন তারা শুনল যে আমরা সবাই পাকিস্তানী, তখন তাদের চোখমুখ খুশীর আলোয় ঝলমল করে উঠল ঃ অনেকে এক সঙ্গে চেঁচিয়ে বল্ল, আহ্লান ও ছাহ্লান। আমরা গাড়ীতে এসে উঠলাম। তারা এক ঠোঙ্গা আনজীর আর এক ঠোঙ্গা ছেব এনে আমাদের গাড়ীতে দিয়ে গেল—পাকিস্তানী ভাইদেরকে তাদের উপহার। আমার চোখ টলমল করে উঠল; গাড়ীর জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইলাম। দুনিয়ার এত জায়গায় আমাদের ভাই ছড়িয়ে আছে!

সমস্ত পথে কেবল বাতাস আর বাতাস। সে দুরন্ত বাতাসে সাগর দোলে, আকাশ কাঁপে, পাহাড়ের গায় ঝরণা ছোটে, পথচারিনীর ওরণা ওড়ে, পাইনের মাথায় মাথায় মউজ নেচে বেড়ায়। বাতাস এদেশের এক মস্ত সম্পদ। সাগর পাড়ে হাজার হাজার হাওয়ার কল ঃ বোঁ-বোঁ চাকা ঘুরছে। চাকার সাথে লোহার নল বসানো। নল দিয়ে দরিয়ার পানি উপরে উঠছে, সেই পানি শুকিয়ে তারা লবণ তৈরী করছে। কোথাও নল বসানো আছে কূয়ার সাথে। কূয়ার পানি উঠে প্রথমে একটা হাউজে জমছে, তারপর নালা কেটে কেটে সেই পানি ক্ষেতে নেওয়া হচ্ছে।

সাগরপাড়ের পথ ছেড়ে আমরা গাঁয়ের পথে চল্লাম। সুন্দর আঁকা-বাঁকা পথ, কখনো পাহাড়ের কোল, কখনও পাহাড়ের বুক ভেদ করা সুড়ঙ্গ, কখনো বা উপত্যকা। ক্ষেতখোলার অবস্থা ভাল। কোন কোন ক্ষেতে শস্য আছে, কোথাও বা কলের লাঙ্গলে চাষ হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেতে বৌ-ঝিরা—কি গাছের যেন ফুল তুলছে। তাদের রং-বেরং কাপড়ের ঝলকে ক্ষেতের বুকে এক নূতন সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। মাঝে মাঝে রাখালেরা গরু-ভেড়া চরাচ্ছে। এদের কেউ কেউ হেটে চলে, কেউ

কেউ আবার ঘোড়ায় চড়ে গরু-ভেড়া খেদায়। গরুগুলো দেখা যায় কতকটা মোষের মত, কিন্তু গায়পায় তেমন মোটা তাজা নয়, ভেড়া-বকরীগুলো বেশী হৃষ্টপুষ্ট, জিবে পানি আনার মত। এক জায়গায় দেখলাম, একটা রাখালের পাছে পঞ্চাশ-ষাটটি ভেড়া। সে আগে আগে যায়, ভেড়ারা তার পাছে পাছে চলে। আমাদের গাড়ীর আওয়াজ শুনে রাখালটি একটু দাঁড়ালো; ভেড়াগুলি অমনি একযোগে দাঁড়িয়ে গেল।

দুই তিনটি ভেড়া তার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে তার দিকে মুখ তুলে চাইল, বোধ হয় তাদের ভাষায় বল্ল—প্রভু, কি আদেশ? হঠাৎ দাঁড়ালে কেন? শোনা যায়, ভেড়া সমাজের প্রভুভক্তি এত গভীর যে, লোকটা যদি হঠাৎ পানিতে ঝাপিয়ে পড়ে তবে সমস্ত ভেড়াই তৎক্ষণাৎ পানিতে ঝাপিয়ে পড়বে। তার দরুণ কেউ মরলে বাকিগুলি সভা করে তার প্রতিবাদ করবে না, খবরের কাগজে লিখে আন্দোলন জাগাবে না, ব্যবস্থা পরিষদে মুলতুবি প্রস্তাবও আনবে না।

বৈরুত হতে প্রায় ৬০ মাইল দূরে ত্রিপলী শহর। ত্রিপলীতে পেঁাছে কিছু খেয়ে নিলাম। হোটেলের পাশে পাইনের উপবন। সেই বাগানে টেবিল চেয়ারের ছোট ছোট চক্র। তারই একটায় কয়েকজন বসে দুম্বার কাবাব আর তনদুরী রুটি খেয়ে নিলাম।

সামনে আমাদের আরো প্রায় সোয়া তিনশ মাইল। সন্ধ্যার আগেই পেঁাছতে হবে। এখন হতে মোটর চল্ল ঘণ্টায় ষাট হতে সত্তর মাইল বেগে। দুপুরে এসে পেঁাছলাম হাম্‌স শহরে। খালেদের মছজিদে জোহরের নামাজ পড়লাম। বিরাট মছজিদ; অত্যন্ত দামী গালিচায় সমস্ত মেঝে ঢাকা, অত্যন্ত বড় ও দামী আলোর ঝাড়, একটি নয়, বহু। ৬৩৫ হিজরীতে তৈরী, ১৩৩০ হিজরীতে সুলতান আবদুল হামিদ মেরামত করেছেন। মছজিদের ভিতরে একপাশে সুন্দর মোকবেরা ঃ সেই খানে ঘুমিয়ে আছেন মহাবীর খালেদ বিন ওলীদ। সামনে দাঁড়িয়ে মোনাজাত করলাম। সমস্ত মোনাজাত ছাপিয়ে বার বার মনে পড়তে

লাগল নজরুল ইসলামের সেই আকুল আহ্বান—

খোদার হাবিব কহিয়া গেছেন—ঈসা আসিবেন ফের
চাইনা তাহারে, তুমি এস বীর হাতে নিয়ে শমশের।

হজরত খালেদের পাশে শুয়ে আছেন তাঁর পুত্র আবদুর রহমান। বাপের সাথে এখানে এসেছিলেন, তাঁকে রেখে ফিরে যান নাই। এ মোকবেরার লাইনে মছজিদের অপর পাশে আর একটি মোকবেরা। এখানে ঘুমিয়ে আছেন হজরত ওমরের পুত্র ওবায়দুল্লাহ্।

অতীতের হাজার স্মৃতি বুক তোলপাড় করে তুল্ল। কয়েকটি ছাত্র আলাপ করতে এসেছিল—তরুণ, সুন্দর, কৌতূহলী, কিন্তু মন উঠলো না, চলে এলাম।

আবার মোটর চলল—এবার পুরা আশি মাইল বেগে। এলাম হামা শহরে। এখানে আছরের নামাজ পড়ে নিলাম। শহরের এক জায়গায় দেখলাম অনেকগুলি কবর—সদ্য। শুনলাম, জেরুজালেমের সাথে লড়াইয়ে যাঁরা জান দিয়েছেন, এসব সেই বীর শহীদানের শেষ শয়নস্থান।

আমরা আগেই সিরিয়া এসে পড়েছি। পথে পথে শস্য ভরা ক্ষেত। পানি সেচের ব্যবস্থা ব্যাপক নয়, কিন্তু যা আছে তা সুন্দর। এখানে ওখানে কলের লাঙগলে চাষের ব্যবস্থা। মাঝে মাঝে মাঠে পশুর পাল, কোথাও ভেড়া-বকরী, কোথাও বা উট। ছোট-বড় সাদা-কালো এত রকমের এত উট একখানে আগে আর কোথাও দেখি নাই। বহুদূর হতে মনে হয়, কতকগুলি সারস পাখী মাথা উঁচু করে হেটে বেড়াচ্ছে। আবার পাহাড়ের পাশে টিলার মত জায়গায় যখন উট চড়ে বেড়ায়, তখন তাহারা পাহাড়ের পটভূমিতে এমন বিরাট হয়ে ফুটে ওঠে যে, মনে হয়, সৃষ্টির ইতিহাসের প্রথম যুগের কতকগুলি অতিকায় প্রাণী হঠাৎ পথ ভুলে এ যুগে এসে পড়েছে।

পথে একটি শহর পেলাম; নাম তার মা-আররা। বিখ্যাত আরবী

কবি আবদুল আলা মা-আররার জন্মস্থান। গাড়ী থামিয়ে কবিকে শ্রদ্ধা অর্পণের সময় হল না, চলে এলাম।

আশ-শা-আরা নামক একটি গাঁয়ে এসে আমরা মগরেবের নামাজ পড়লাম। পাড়ার ছোট বড় অনেকটি লোক এসে আমাদের সাথে মোছাফেহা করল। বল্ল, পাকিস্তান আমাদের নিজের; আমরা পাকিস্তানের শুভ চাই।

তখন আলেপ্পো ৫০ মাইল দূরে। অবিরাম গতিতে ফের ছুটলাম। শহর হতে পাঁচ মাইল দূরে থাকতেই মোটর-সাইকেল ও মোটরগাড়ীর একটি ছোট্ট মিলিটারী দল আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে চল্ল; আলেপ্পোর গভর্ণর মাননীয় হানী আর-রইছ আগেই আমাদেরে দাওয়াত করেছিলেন, এরা তাঁরই পাঠানো মানুষ। শহরে পেঁছলে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট হোটেলের সামনে স্বয়ং গভর্ণর সাহেব আমাদেরে গ্রহণ করলেন; গার্ড অব অনারের ব্যবস্থা ছিল।

রাত্রিতে গভর্ণর সাহেব আমাদেরে একটি ভোজ দিলেন—অন্য একটি বড় হোটেলে। হোটেলের আঙিগনায় খোলা আকাশের নীচে সবাই বসলাম। ভোজের টেবিলে তিনজন তুর্কী মিলিটারী অফিসারের সঙ্গে পরিচয় ঃ এঁরা উভয় রাজ্যের সীমানা সংক্রান্ত কোন সমস্যা সমাধানের জন্য এসেছেন। এঁদের একজন কর্ণেল, একজন লেফটেনাণ্ট কর্ণেল আর একজন বেসামরিক অফিসার। এঁরা একাধিকবার বল্লেন, পাকিস্তানকে আমরা একান্ত আপন মনে করি। আমরা ধন্যবাদ দিয়ে বল্লাম, তুরস্ককে আমরা আরো আপন মনে করি। আমি কামাল পাশা, আনোয়ার পাশা ও অন্যান্য সম্বন্ধে বাংলায় বই লিখেছি শুনে তাঁরা অবাক হলেন। পাকিস্তানের প্রতিনিধি ডাক্তার সিদ্দিকী বৈরুত হতে আমাদের সাথে ছিলেন। আরবী ভাষীদের সাথে কথা বলার সময় তিনি দোভাষীর কাজ করলেন।

আমার পাশে বসেছিলেন আলেপ্পোর ক্যাপ্টেন শফীক; তিনি

আরবী, ফরাসী, ইংরেজী, তুর্কী জানেন; তুর্কী অফিসাররা তুর্কী ও ফরাসী ছাড়া আর কিছু জানেন না। তাঁদের দুইজন আমার সামনে বসেছিলেন।

তাঁদের সাথে আমার কথাবর্তায় ক্যাপ্টেন শফীক দোভাষীর কাজ চালিয়ে দিলেন।

আলেপ্পোর স্থানীয় নাম হলব। অতি প্রাচীন শহর। এর বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন লাখ। বর্তমান সিরিয়া রিপাবলিকের শতকরা ৬০ জন লেখাপড়া জানে। হলবে কোন বিশ্ববিদ্যালয় নাই, তবে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে। লোকের আর্থিক অবস্থা ভাল। বৈরুতের মত এখানে লোকের পোশাক পরিচ্ছদের উপর পাশ্চাত্যের ছাপ অতি ব্যাপক নয়, তবে গতি এদিকেই। আমাদের অভ্যর্থনায় যাঁরা এলেন, খানার টেবিলে যাঁদের সাথে সাক্ষাৎ হল, এঁদের সবারই পরণে কোট-প্যান্ট। মাথা কারো খালি, কারো মাথায় ফেজ। গায়ের রং এদের সবারই ফর্সা। স্বাস্থ্য সবারই ভাল। মেজাজ সবারই স্নিগ্ধ, ব্যবহার সবারই অনিন্দনীয়। রাত ১১॥ টায় শুতে গেলাম। পরদিন ৯টার মধ্যে আঙ্কারা যাত্রা করতে হবে।

আঙ্কারা
২৭শে আগষ্ট, ১৯৫১

খালেদা,

আগেই বলেছি, আলেপ্পো পুরাণা শহর, আর এ শহরের নাম আমার কাছে ছোট বেলা হতেই একটা অপরূপ মায়ার জালে আবৃত। সেই শহর এত অল্প সময়ের মধ্যে ছেড়ে যেতে হচ্ছে—বড় দুঃখ বোধ হল। অথচ এখানে দেখবার জিনিস অনেক আছে ঃ জেহাদী যুগের কেল্লা, উমাইয়া যুগের মছজিদ, তারো বহু—বহু আগের জামানার

হজরত জাকারীয়া আলায়হেচ্ছালামের মছজিদ ইত্যাদি। কিন্তু ইস্তাম্বুলী কনফারেন্স সমাগত—একদিনও এখানে দেরী করে যাওয়ার উপায় নাই।

কাজেই গতকাল বেলা ৯টায় বাগদাদ-ইস্তাম্বুল ট্রেনে আঙ্কারা চল্লাম। আলেপ্পোর গভর্ণর তাঁর লোকজনসহ ষ্টেশনে এসে আমাদেরে বিদায় করলেন। এঁদের ভদ্রতা ভুলবার নয়। পাকিস্তান প্রতিনিধি ডাক্তার সিদ্দিকী এখান হতে বিদায় হলেন,—দামেশ্কে তাঁর জরুরী কাজ।

চমৎকার রেলগাড়ী। গাড়ীময় দামী গালিচা বিছানো—গাড়ীর ভিতরে এক পাশে আগাগোড়া বারান্দা—সে বারান্দাতেও গালিচা। শোবার ব্যবস্থা সুন্দর—শোবার সময় হলে গাড়ীর লোক এসে গাড়ীর তরফ হ'তে তোষক, বিছানা, বালিশ, চাদর, কম্বল সব গুছিয়ে বিছিয়ে ঠিক করে দিয়ে যায়। কামরায় বসবার সোফা, তারি নীচে ওসব বাক্সবন্দী থাকে। সকালে আবার গাড়ীর লোকেরা এসে কম্বল, চাদর, তোষক, বালিশ সমস্ত বাক্সবন্দী করে সোফার ব্যবস্থা করে যায়; সোফার উপর হেলান দেওয়ার জন্য ছোট বড় তাকেয়া আছে। গাড়ীর লোক ডাকবার জন্য প্রত্যেক কামরায় টিপ কল। গাড়ীতেই খানার আলাদা কামরা—চাইলে নিজ কামরাতেও খানা দিয়ে যায়।

গাড়ীর ও-দেশী যাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ বল্লেন, এই রেলগাড়ীই প্রথম মহাযুদ্ধের আসল কারণ। জার্মান সম্রাট কাইছার তাঁর নিজস্ব ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে এই রেল লাইন ও রেলগাড়ী তৈরী করেন এবং দরকার মোতাবেক বার্লিন হতে ইস্তাম্বুল হয়ে বাগদাদ পর্যন্ত জার্মান বাহিনী নিয়ে এসে পাক-ভারত আক্রমণ ও অধিকার করবেন এই পরিকল্পনা করেন। ইংরেজরা চালাক জাত; তারা জার্মানদের এ মতলব ব্যর্থ করার জন্য উঠে পড়ে লাগে, আর এই উপলক্ষে কূটরাজনীতির দরিয়া মন্থন করে যে হলাহল ওঠে, প্রথম মহাযুদ্ধের কারণ তাই-ই। জার্মানী আর কিছুদিন সময় পেলে নাকি তার সঙ্গে পেরে ওঠা ইংরেজের পক্ষে

অসাধ্য হত।

অদ্ভুত এই বাগদাদ-ইস্তাম্বুল রেলপথ। ইঞ্জিনিয়ারিং নৈপুণ্যের এমন বিস্ময়কর পরিচয় আমি তো কোথাও আর দেখি নাই। আলেপ্পো হতে আঙ্কারা—এই পথটুকুর কথাই বলি। দূরত্ব আনুমানিক হাজার মাইল। মনে হল, এর বেশীর ভাগ পথই পাথর কেটে তৈরী। পথে ছোট ছোট বেশুমার পাহাড়; মাঝে মাঝে পর্বত;—পাহাড় কখনো বালুময়, কখনো পাথর মাটিতে মিশানো। কোনটির উপরে সবজা আছে, কোনটি নিরেট কঙ্করময়, একটা গাছপালারো চিহ্ন নাই ঃ দূর হতে মনে হয়, টাকপড়া মাথা উঁচু করে শাহ্‌নামার কোন বিরাট দেও পথে বসে আছে। রেলপথ কোথাও পাহাড়ের পায়ের কাছে পাথর কেটে তৈরী, কোথাও বালির পাহাড়ের মাঝখানে কেটে তৈরী, কোথাও বা নিরেট পাহাড় পর্বতের ভিতর দিয়ে সুড়ং কেটে পথ করা হয়েছে। মনে হল আলেপ্পো হতে আঙ্কারা পর্যন্ত শ খানেক সুড়ং এর কম হবে না। মাঝে মাঝে দুই পাহাড়ের মাঝখানের ফাঁক সেতু দিয়ে পুরা করতে হয়েছে। বেশীর ভাগ জায়গাতেই গাড়ী পাহাড়ের গা ঘেঁসে চলে; তার নীচেই হয়তো গভীর নামা, গাড়ী হতে চাইলে গা কাঁটা দেয়। বিরাট অজগরের মত ফোঁস ফোঁস করে গাড়ী পাহাড় পর্বত উপত্যকা সুড়ং এর মধ্য দিয়ে আঁকাবাঁকা পথে চলে আর চলে।

আলেপ্পো ষ্টেশনে পুরুষ নারী অনেকেই আত্মীয় স্বজনদের বিদায় করতে এসেছিলেন। নারীদের চৌদ্দ আনাই আধুনিক পাশ্চাত্য পোশাক পরা—দুই আনা পরিমাণ নারীর মাথায় রুমাল, জামার আস্তিন লম্বা, পা সবখানি ঢাকা। পুরুষেরা সবাই কোট-প্যান্ট পরা, কারো মাথায় হ্যাট, কারো মাথায় ফেজ, কারো মাথা খালি ঃ খালি মাথাওয়ালার সংখ্যাই বেশী। সিরিয়ার বেশীর ভাগ শহরেই পাশ্চাত্য আধুনিকতা এমনই ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। পূর্ব বাংলা মাঝে মাঝে অতিরিক্ত পানির জুলুমে হাহাকার করে; এসব জায়গায় পানির দুর্ভিক্ষ বার মাস লেগেই আছে।

কোথাও একটু ছোট ঝর্ণা পেলে এদেশের চাষীরা বেঁচে যায়—নানা হেকমতে তার পানি আশেপাশের ক্ষেতে নেয়। শস্যের চেহারা দেখে মনে হয় পানি পেলে এ দেশের মরুতে সোনা ফলে। যেখানেই একটি ঝোরা কিম্বা ছোট নদী, অথবা পাহাড়ের মাঝখানে একটু বিল সেখানেই পাহাড়ের গায়ে গায়ে পল্লী জমে উঠেছে। ঝোরার পারে পারে দেখা যায় মানুষ, গরু, ভেড়া, বকরী ও গাছপালা। পানির অপর নাম যে জীবন এইখানে তার স্পষ্ট পরিচয়।

ভেড়া-বকরীর দল ক্রমেই ঘন ঘন নজরে পড়ছে। দূর হ'তে হঠাৎ দেখা যায়, একটা পাহাড়ের একপাশ সাদা উই পোকায় ছেয়ে আছে। যত কাছে যাই উইগুলি ততই বড় হয়ে ওঠে—অবশেষে সেগুলি হয়ে পড়ে ভেড়ার পাল। ঠাঠা-পুড়া রোদ, তারই মধ্যে ওরা গায়ে গা মিলিয়ে নির্বিকারে শুয়ে আছে—অথচ গায় ওদের অতগুলি গরম পশমের খোদায়ী কম্বল!

বৈরুত হতে শুরু করে দেখছি গাছের বাহার। বৈরুতে সারি সারি সুন্দর গাছের অনেকগুলি বাগান দেখলাম—পথের ধারে ধারে তো আছেই। ওগুলি নাকি সিডার গাছ। সে গাছের বাগানের কাছ দিয়ে যেতে হঠাৎ কানে আসে এক অপূর্ব নূপুরের ঝঙ্কার,—যেন হাজার হাজার পরী-শিশু ঘুংঘুর পায় দিয়ে পাতার আড়ালে নেচে বেড়াচ্ছে। আমাদের সাথী বললেন, ওরা পরী নয়, পোকা।

আমাদের দেশের পোকারা কখনো চিকন গলায় গান করে, কখনো সন্ধ্যায় গাছের তলায় আলোর ঝাড় ঝুলায়; এদেশের পোকারা পাতায় বাজনা বাজায়। পোকাদের আর্ট আছে,—আমাদের অনেকের চেয়ে বেশী।

সিরিয়া হতে শুরু হল আর এক রকম লম্বা সরু গাছের সারি—বিলাতি পপলারের মত—ভারি সুন্দর—স্থানীয় নাম কোন স্থানে হোর, কোন স্থানে কাবাক। যেখানেই পানি, তারি পাড়ে পাড়ে কাবাকের সুন্দর সারি। সারি ভাঙ্গা গাছ এদেশে চোখে পড়ে না বল্লেই চলে। আমরা

পূর্ব বাংলায় গাছে গাছে হয়রান; এরা গাছ পেলে তাকে অপত্য-স্নেহে লালন করে। আর গাছের পেছনে এদের স্নেহ-যত্নের খরচ আছে বলেই এরা গাছ বুনতে বাছবিছ করে। তারপর সে গাছকে সাজিয়ে গুজিয়ে রাখে।

সিরিয়ায় এখনো এখানে-সেখানে বেদুঈন জীবনের চিহ্ন চোখে পড়ে। চারিদিকে পাহাড়, মাঝখানে খানিক সমতল জায়গা, তারি মধ্যে দূরে দূরে ছড়ানো ৫।৬টি তাঁবু। তাঁবুর বেড়াগোড়া নাই বল্লেই চলে, হাওয়া বিনা বাধায় এপার হতে ওপারে তার পাখা ঝাপটিয়ে চলে যায়। দুপুর। রোদ খা খা করে। তারি মধ্যে কেউ ভেড়া চরায়, কেউ ঝর্ণা হতে পানি আনে, কেউ তাঁবুর নীচে বসে পাহাড় দেখে। কোন বেদুঈন নারী বাবলা গাছের ডালে দোলনা বেঁধে ছেলে ঘুম পাড়ায়। কোন বেদুঈন কিশোর পাহাড়ের উপর পাথরের ছায়ায় শুয়ে আরাম করে, হয়তো ঘুমিয়েই পড়ে।

পথের পাশে মাঝে মাঝে হঠাৎ ছোট ছেলেমেয়ে দেখা যায়। মেয়েদের কাপড় জামা ফুলদার ও রং-বেরং—সুন্দর। গাড়ীর জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চাইলে এরা অনেকেই হাত তুলে ছালাম করে। মনে হয়, আমাদের চেহারার লোককে ছালাম করতে তারা দেখে আসছে।

এক ষ্টেশনে দুটি মহিলা যাচ্ছেন। চেহারা, পোষাক, চলন সবটাতেই আভিজাত্য পরিস্ফুট। জনালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেয়ে আছি—অমনি তাঁরা বারবার হাত তুলে কুর্নীশী ধরণে ছালাম করলেন। তবে দুই হাত তুলে নয়, এক হাত তুলে। পুরুষদের মধ্যেও অনেকে পথে ছালাম জানিয়েছেন। আঙ্কারার একটা হোটেলে আমি আর আলী আফজাল সাহেব চা খেতে গেলাম। অতি যত্নে চা খাওয়ানোর পর ম্যানেজার এসে বল্লেন—আপনারা আমার সম্মানিত মেহমান—পয়সা দেওয়ার নাম করলে বেজার হব—আচ্ছালামু আলায়কুম। মছজিদে নামাজ পড়তে গেলেও অজানা মুছল্লীদের কাছ থেকে আমরা অমনি খাতির পেয়েছি।

এসব খাতিরে আমার মন ব্যথিয়ে উঠত। ভাবতাম, এ খাতির আজ যাঁরা আমাদের করছেন তাঁদের বুকে বেদনা আছে। এঁরা এই ছালামের ভিতর দিয়ে যেন বলছেন, 'টুপী, দাড়ি, শেরওয়ানী—সে জামানার সবই তো ফুরিয়ে গেছে—তার সাথে আরো গেছে অ-নে-ক। এ-তিনটা বিদেশী লোক আজো সেই হারানো জামানার পরিচয় বহন করে চলেছে, এদেরে অভিবাদন।'

পথে কেবল পাহাড় আর পর্বত, পর্বত আর পাহাড়। দেশে বাসিন্দা কম, কিন্তু যারা আছে তারা প্রকৃতির সাথে কি অবিরাম লড়াই করেই না টিকে আছে! এদের বাড়ী সমতলে নয়, পাহাড়ের গায়ে। পাথর কেটে এরা করেছে বাড়ীর আঙ্গিনা তৈরী, পাথর কেটে এরা করেছে ঘরদুয়ার, পাথর কেটে এরা করেছে বাড়ী যাওয়ার পথঘাট। কুয়া খুঁড়তে এদের পাথর কাটতে হয়, চাষ করতে এদের পাথর সরাতে হয়, রুজী রোজগার করতে এদের পাহাড় ভেঙ্গে রেলের পথ করে দিতে হয়। কখনো রোদ, কখনো ঝড়, কখনো বর্ষা পর্যায়ক্রমে তাদের সাথে এদের লড়াই লেগেই আছে। প্রকৃতি এদের প্রতি স্নেহাতুর নয়। গমের ক্ষেতে কোদাল মারতে মারতে কখনো পাথরে লেগে আগুনের ফুলকী জ্বলে উঠে, দূর হতে নহর কেটে ক্ষেতে পানি আনতে হয়, যা কিছু শস্য হয় তা ক্ষেতে কুঁড়ে বেঁধে রাত জেগে পাহারা দিতে হয়। এই দুর্দম জীবনযাপন করে এরা হয়ে ওঠে দুঃসাহসী, দুর্জয়, অধ্যবসায়ী। পাহাড়ের টিকির উপর যে সব গাছ জন্মে তা ঘন হয় না। পাতলা যে গাছ কয়টী থাকে তারাও সহজে মাটি পায় না। মাটির খোঁজে, রসের খোঁজে চারদিকে তারা শিকড় পাঠিয়ে দেয়। পাথরের কোনও একটু ফাটল পেলে তারি মধ্যে শিকড়েরা ঢুকে পড়ে; ওতে মাটি পানি যা কিছু পায় তাই দিয়ে গাছকে বাঁচিয়ে রাখে। এদিকে যত রাজ্যের ঝড়ঝঞ্ঝা সবই ঐ টিলার গাছের উপরই এসে ঝাপিয়ে পড়ে। এমনি অবিরাম সংগ্রামের ভিতর দিয়ে ওদের বেঁচে থাকতে হয়। নামায় সমতলের ভিজা নরম সারময় মাটির গাছের মত ওরা ঘনও

হয় না, তাড়াতাড়ি মোটাও হয় না। কিন্তু কাঠুরিয়া জানে, কোন্ গাছ কাটতে গিয়ে তার কুড়াল জব দিয়ে বসে, আর কোন্ গাছ কোদাল দিয়ে কেটে সাবাড় করা যায়। এদের দামের বেশকম কত, সদাগরেরা তার খবরও রাখে।

এই পাহাড়-পর্বতের পথে যেতে যেতে মনে হল, বাংলার নরম মাটি, তার ভিজা আবহাওয়া, তার অনায়াসলভ্য পানি, তার অল্পায়াসলভ্য খাদ্যশস্য—এসব সম্পদ মিলে কি অবশেষে তার সন্তানের জীবন-যুদ্ধের বিজয়পথে বিঘ্ন উৎপাদন করল? কিন্তু অনুশীলন করে করে যে সমতলের মানুষও দুর্জয় কর্মী ও অসম সাহসী যোদ্ধা হতে পারে, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মেনী তার প্রমাণ। স্কটল্যাণ্ড পাহাড়ময় দেশ, তার সন্তানেরা চিরদিনই দুঃসাহসী যোদ্ধা; কিন্তু পরিনামে ইংল্যাণ্ডের সমতলবাসী অধ্যবসায়ীদের কাছে স্কট বীরদের মাথা নত করতে হয়েছে। মোগল আমলের বাংলার সমতলের সন্তানেরা পাহাড়-পর্বতের দেশের লোকের সাথে কি বীর্যময় সংগ্রাম করেছিল, তাও ইতিহাসের কথা।

বেলা ২টায় আমরা সিরিয়া ছেড়ে তুরস্কের সীমায় প্রবেশ করলাম। কাষ্টম্‌সের লোকেরা এসে দুই ঘন্টা ধরে ট্রেণে খোঁজাখুঁজি করল—এ পথে নাকি বহু চোরাকারবারী চলাফিরা করে। আমরা খোঁজাখুঁজি হতে রেহাই পেলাম। এই দেরীর সুযোগে ষ্টেশনের সংলগ্ন গ্রামের মুফতী এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন। নাম মুহম্মদ জকী। কোট-প্যান্ট-হ্যাট পরা, কিন্তু কি অফুরন্ত তাঁর উৎসাহ! ফারছী, আরবী, তুর্কী, ফরাসী জানেন। আমাদের সাথে ফারছীতে কথা বল্লেন। তাঁর সাথে আলাপ করে যা শুনলাম, তার মর্ম এইঃ 'আমাদের গাঁয়ে মছজিদ আছে। মছজিদে ওকতীয়া নামাজে ৬-৭ জন হাজির হয়; জুমার দিন ৬০-৭০ জন জমে। নামাজীর সংখ্যা ক্রমে বাড়ছে। আল্লা তাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়াবেনই। পাকিস্তানের খবর আমরা জানি—পাকিস্তানের শুভ আমরা কামনা করি—আহ্‌লান ও ছাহ্‌লান।'

২৭শে আগষ্ট গাড়ীতেই রাত শেষ হল। ৪॥ টায় উঠলাম। সরু চাঁদ—ছৈ ছাড়া ছোট রুপালী ডিঙ্গীর মত। কিন্তু বাংলার চাঁদ আরামের রাজা—ধীরে দাঁড় বেয়ে তরঙ্গহীন দরিয়ায় নিরাপদে পাড়ি জমায়।

এখানকার চাঁদের মেহনত অনেক। এদেশের আছমানের গাঙে পাহাড় পর্বতের হাজারো মউজ মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে আছে ঃ চাঁদের কিশতীকে সেই দুর্জয় দরিয়া পাড়ি দিতে হয়—কখনো দুই মউজের ফাঁকে কিশতী হারিয়ে যায়; মনে হয় একদম ডুবে গেছে, কিন্তু পরক্ষণেই ভেসে ওঠে; মউজের মাথা হতে মাথায় লাফিয়ে চলে। আস্তে আস্তে পূর্বাকাশ লাল হয়ে ওঠে, দূরে মোরগ ডাকে, কখনো বা আজানের আওয়াজ কানে ভেসে আসে। ক্রমে সব একদম ছাফ হয়ে যায়। কিন্তু সূর্য কোথায়? সে তার আলোর পিচকারী তো আকাশের গায় আগেই ছুড়ে মেরেছে, কিন্তু তার রথ এই দুরন্ত পাহাড়-পর্বতের বন্ধুর পথ বেয়ে বুঝি সহজে উঠতে পাচ্ছে না?

মাঠে লোক নেমে পড়েছে। গাঁয়ের লোকেরা বুঝি খুব গরীব—তাদের অনেকেরই পাতলুনে হাজারো তালি। কেউ ক্ষেত হতে গমের আটি আনতে গাড়ী নিয়ে চলেছে, কেউ ফিরে আসছে। মেয়েদের হাতে ঝাটা—উঠান-বাইর ঝাড় দিচ্ছে—ওদিয়ে তারা আরো কিছু করে কিনা, স্বামীদেরে জিজ্ঞাসা করার ফুরছৎ পাই নাই। কোন কোন গৃহস্থিনী গমের মলন মলছে ঃ প্রশস্ত মৈ এর মত যন্ত্র ছড়ানো—গমের উপর দিয়ে গরু টেনে চলে, বেগম ছাহেবা কুরছি পেতে তারই উপর আরামছে বসে বসে গরু হাকান।

আনাতোলিয়ার মাঠের উপর দিয়ে চলেছি। বিরাট সমতল মাঠ। গমের প্রচুর আবাদ—ইয়াছিল হিসার ষ্টেশনে হাজার হাজার গমের বস্তা রফতানীর জন্য মৌজুদ। বড় বড় জোতদারেরা ভাগচাষীদের দিয়ে এসব আবাদ করায়।

দেশে ছোট বড় গাধা প্রচুর। ছেলে গাধায় চড়ে, মেয়ে গাধায় চড়ে,

ছেলেমেয়েদের আব্বা গাধায় চড়েন, তাদের আম্মাও গাধায় ছওয়ার হন। একটা গাধার উপর তিনজন বসে নিরাপদে চলেছেন—সামনে বিরাজ করছেন খোকা, মাঝে তার আব্বা, পেছনে তার আম্মা। এর উপর গাধার এপাশে ওপাশে ঝুলানো কিছু মালপত্রও আছে। ঘোড়ার চল খুব কম। কারণটা বোধ হয় এই যে, ঘোড়া অমন যা তা খেয়েও তুষ্ট নয়, অমন বোঝা বইতেও রাজী নয়। গাধা ফরিয়াদ করে, 'ঘোড়া দাদা, তোমরা চিরদিন ফাঁকি দিয়ে আরাম করেই গেলে, খেটে মরলাম আমরা।' ঘোড়া দরদমাখা সুরে বলে 'দোস্ত্, খেটেইতো তোমার গৌরব, ওতে ছওয়াব অনেক—তাছাড়া ছবর এখতিয়ার করা তো ওলী-দরবেশের আখলাক; ওর মেওয়া এপারে না ফলুক, ওপারে নির্ঘাত ফলবেই।'

আমাদের দেশেও কি ঐ একই অবস্থা? গাধারা খেটে মরে আর ঘোড়ারা আরাম করে চলে?

খালেদা,

রাত ৮॥ টায় আমরা আঙ্কারা ষ্টেশনে এসে পেঁৗছলাম। যে মহিয়ষী মহিলার কীর্তিকথা স্মরণ করে তোমার নাম রেখেছিলাম, এ সেই খালেদা আদিব খানমের দেশ—তাঁর সাধনার পুণ্য ভূমি। জান, তাঁর একটি ছেলের নাম তিনি রেখেছিলেন হাছান হিকমত টুগো? টুগো ছিলেন জাপানের সেই কীর্তিমান সেনাপতি যিনি পোর্ট আর্থারের লড়াইয়ে রাশীয়ার বিক্রান্ত বাহিনীকে সম্পূর্ণ রূপে পর্যুদস্ত করেছিলেন। জাপানের এ বিজয়ে সমগ্র প্রাচ্যে আনন্দের হুল্লোড় পড়ে গিয়েছিল। সেই মহোৎসবের মুহূর্তে খালেদা আদিব খানম তাঁর ছেলের নামের শেষে যোগ করে দিলেন প্রাচ্যের মুখোজ্জলকারী বীরের নাম। আমরা উভয়ে একই বীর-পূজার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ।

আমরা যখন ষ্টেশনে এসে পেঁৗছলাম, তখন ঝিরি ঝিরি বৃষ্টিপাত

শুরু হয়েছে ঃ আকাশে মেঘ; মেঘে মেঘে ডমরু নিনাদ! আঙ্কারায় বৃষ্টি কমই হয়—বিশেষ করে এই সময়টায়। কাজেই বাসিন্দারা মেঘের গর্জনে বিষম খুশী ঃ বৃষ্টির ফোটা মাথায় পড়ায় আরো। পাকিস্তান দূতাবাসের অনেকে ষ্টেশনে হাজির ছিলেন। আঙ্কারায় কেউ কেউ এঁদের বলেছেন—'পাকিস্তান বিষ্টির দেশ, তাই এঁরা বিষ্টি মাথায় করে নিয়ে এসেছেন।' আমাদের দেশের রসিক জামাইরা কখনো কখনো বিষ্টি মাথায় নিয়ে শ্বশুর বাড়ী যান—শালীদেরে আছাড় পড়াতে। আমরা তেমনভাবে আঙ্কারায় গেলাম কিনা, তা সেখানকার কাউকে জিজ্ঞাসা করার ফুরছৎ পাই নাই। আর ফুরছত মিল্লেও ওদের সাথে হঠাৎ এমন একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পাতবার সাহস আমার সাথীদের হত কিনা বলা কঠিন। কারণ হাজার হলেও তুর্ক জাতের মানুষ তো—লড়াইয়ে ওরা যেমন গোঁয়ার, পারিবারিক জীবনে অমন হলে ওদের সাথে আত্মীয়তা করতে গিয়ে নিরীহ বাঙ্গালীর বিপদ আছে।

রাত্রিতে আমরা রইলাম 'আঙ্কারা প্যালেস' নামক হোটেলে। বিরাট সুন্দর হোটেল—নিতান্ত সুবন্দোবস্ত—মালিক ইহুদী। এরা পুঁজি খাটাতে পারে, টাকা সুদে আসলে ওসুল করে নিতে জানে। কামরার কলে একটু টিপি দিলে অমনি সাহেব মেম কোন একজন দৌড়ে আসে, হাসিমুখে ছালাম জানায়, তারপর নিতান্ত বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, 'হুকুম করুন, কি খেদমত করতে পারি।' এ ছাড়া আমাদের ডেলিগেশনের প্রত্যেকের 'সুখ সুবিধার' উপর নজর রাখার জন্য স্বয়ং আঙ্কারা সরকারও লোক মোতায়েন করেছিলেন। দেখতাম হোটেলের ফটকের কাছে দুটি লোক চেয়ার পেতে বসে থাকত; আমরা কেউ বাইরে গেলে তাদের একজন সাথে যেত আর একজন ফটকে বসে থাকত। তুর্ক-রাজ্যের শহর গুলির প্রত্যেক বাসিন্দার নাকি সরকারী রেজিষ্টারে নাম আছে। রাজ্যের মধ্যেও এক শহর হতে অন্য শহরে যেতে সরকারে এতেলা

দিয়ে যেতে হয়। আমাদের দেশে যত জনসভা হয় এবং এসব জনসভায় যতখানি স্বাধীনতার সাথে সরকারের কাজের সমালোচনা হয়, তা নাকি তুরস্কে নাই। তুরস্কের জনগণের প্রতি সে দেশের নেতাদের বক্তব্য এই ঃ আমাদের চার পাশে দুষমন; শতাব্দীর পর শতাব্দী হতে এরা আমাদের অস্তিত্ব মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে আসছে—আমাদের ক্ষতিও এরা করেছে প্রচুর। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে বাস করে আমরা কোন তুর্কী নাগরিককে তুর্ক শক্তির কোনও ক্ষতিমূলক কাজের প্রশ্রয় দিতে পারি না—নিজের ঝগড়া যদিই বা থাকে তা আপোষে মীমাংসা করে নাও, বাইরের ঝগড়ার জব দিতে সর্বক্ষণ সর্বপ্রকারে প্রস্তুত থাক।' আমাদের দূতাবাসের ওঁরা বল্লেন, তুর্কী নাগরিকেরা তাদের নেতাদের এ আবেদনে সাগ্রহ সাড়া দিয়েছে।

রাত্রিতে হোটেলে শুয়ে আছি। সুন্দর স্থান, সুন্দর পরিবেশ, সুন্দর বিছানা; কিন্তু ঘুম দূরে দূরে ঘুরে ফিরছে, কাছে ভিড়বার নামও করছে না।

স্মৃতির পর স্মৃতি ফিল্মের ছবির মত মনের পটে ভেসে উঠতে লাগল।

তখনো কলেজে নীচের দিকে পড়ি। নব্যতুর্কদের আদর্শবাদ ও সাধনার কথা তখন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। সত্যেন দত্ত এঁদের একটা জাতীয় সঙ্গীতের অনুবাদ "প্রবাসীতে" প্রকাশ করলেন। সে অনুবাদ পড়ে আমরা সেদিন নতুন প্রেরণা লাভ করেছিলাম। আজো তার কোন কোন চরণ স্মৃতির পাতায় গাঁথা আছে।

ভালবাসি মোরা অস্ত্রের খেলা
ভালবাসি মোরা যোদ্ধৃসাজ,
তুর্ক পুরের তোরণে তোরণে
সিংহ সজাগ করে বিরাজ।

RAMNOGOR ELEVEN BULLET CLUB
Estd. 1967
DATE ... ...
P.O. SHARIAKANDI,
DIST. BOGRA.

* *

শহীদ হইব মৃত্যু সহিয়া
সমর ক্ষেত্রে সঁপিব প্রাণ,
তুর্ক আমরা কীর্তির তরে
অকাতরে করি জীবন দান।

এই আঙ্কারারই সন্নিকটস্থ এক প্রান্তরে সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে হয়েছিল তুর্ক সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন।

সে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর কথা। মধ্য এশিয়ার তুর্করা তখনো দলে দলে ভাগ্যের অন্বেষণে দেশ-বিদেশে ফিরে বেড়ায়। এমনই একটি তুর্ক যোদ্ধৃদলের নেতা তুগরল খাঁ ভাগ্যান্বেষণে খোরাছান হতে চলতে চলতে অবশেষে আঙ্কারায় এসে উপস্থিত। হঠাৎ দেখেন, সামনের এক ময়দানে তুমুল সংগ্রাম। তুরগল খাঁ তাঁর যোদ্ধাদেরকে লাইন করে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। তখন তাঁর ধমনীতে ধমনীতে যুদ্ধের নেশায় উন্মত্ত শোণিত তীব্র বেগে ছুটতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণ মধ্যেই দেখা গেল, এক পক্ষ পরাজিত হয় হয় অবস্থা। দুর্বলের পক্ষ সমর্থনের জন্য বীর ব্যক্তির যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তারই প্রেরণা বলে তুরগল খাঁ তাঁর যোদ্ধৃদল সহ বিজয় উন্মুখ পক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মুহূর্তের মধ্যে যুদ্ধের গতি ফিরে গেল। প্রবল পক্ষ পরাজিত হয়ে ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেল।

দুর্বল পক্ষের অধিনায়ক ছিলেন আইকোনিয়ামের ছেলজুকীয় সুলতান কায়কোবাদ—দেশের আসল মালিক। আর প্রবল পক্ষে ছিল একদল ভাগ্যান্বেষী মোগল যোদ্ধা।

সুলতান কায়কোবাদ তাঁর কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ এই অকস্মাৎ-আবির্ভূত সাহায্যকারী দলের নেতাকে আঙ্কারার প্রান্তদেশে একটি ছোট্ট জায়গীর দান করলেন।

এমনই ভাবে ভবিষ্যৎ তুর্ক সাম্রাজ্যের বুনিয়াদের পত্তন হল।

তুর্করা এগিয়ে চলেছে। আজ তারা আর জায়গীরদার নয়; রাজ্যাধিপতিও নয়, আজ তারা সমৃদ্ধ সাম্রাজ্যের অধিপতি।

তুর্কদের বিজয় অভিযানের সাফল্য দেখে য়ুরোপে শামাল শামাল রব পড়ে গেছে। খৃষ্টীয় ১৩৯৪ সালের কথা। সমগ্র খৃষ্টান য়ুরোপের বাছা বাছা যোদ্ধারা বিপুল সংখ্যায় নাইকোপলিসের ময়দানে এসে হাজির হল। তারা সদম্ভে ঘোষণা করল, আজ যদি আকাশ ভেঙেগ পড়ে, তবে তাকেও আমাদের বর্শার আগায় ঠেকিয়ে রাখব। সুলতান বাইয়াজীদ সসৈন্যে এগিয়ে গেলেন। তাঁর বিক্রান্ত বাহিনীর আক্রমণ খৃষ্টান জগতের মিলিত বাহিনীও সইতে পারল না; পরাজয় মেনে সন্ধি ভিক্ষা করল। আর কখনো এরা সুলতানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আসবে না, এই শর্তে সন্ধি হয়ে গেল। বিদায়ের আগে সুলতান বন্দী খৃষ্টান নাইট যোদ্ধাদেরকে তাঁর সামনে ডাকলেন, বল্লেন—'তোমরা বয়সে তরুণ, জীবনে যশ অর্জনের আকাঙ্খা তোমাদের পক্ষে স্বাভাবিক; এ পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলার সংকল্পও তোমাদের পক্ষে অশোভনীয় নয়। অথচ তোমরা সন্ধিপত্রে লিখে দিয়েছে যে আর কখনো তোমরা আমার সাথে লড়তে আসবে না। এই কঠিন শর্ত হতে আমি তোমাদেরে মুক্তি দিচ্ছি। তোমরা বাড়ী ফিরে যাও। দরকার হয়, নতুন সংগ্রামের জন্য তৈয়ার হতে থাক; তারপর যখন যে ময়দানে আমার সাথে লড়তে চাও, আমাকে একটু খবর দিয়ো—আমি সানন্দে সেখানেই এসে তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করব।'

ছবির পর ছবি চলতে থাকে। বিজয়ী মুহম্মদ, বিক্রান্ত ছলীম, মহান ছোলায়মান—প্রত্যেকেই এক একজন দিকপাল—সে আমলের দুনিয়ার ইতিহাসে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীর পুরুষ।

তারপর শুরু হয় অবনতির ভাটা। সুলতানেরা লড়াইর ময়দান ছেড়ে মগ্ন হয়ে পড়েন গৃহের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে; দরবার ছেড়ে অবলম্বন করেন হারেমের গ্লানিময় বিলাস জীবন।

পরাজয়—পরাজয়—পরাজয়—চারিদিকে কেবল পরাজয়। য়ুরোপত্রাস তুর্ক সুলতান হয়ে পড়েন য়ুরোপের অকর্মণ্য শয্যাশায়ী রোগী!

অবশেষে প্রথম মহাযুদ্ধের অন্তে তুর্কদের দুশমনেরা কেবল যে তাদের সাম্রাজ্যকে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেল্ল এমন নয়, তাদের রাজধানী ইস্তাম্বুলও জুড়ে বসল।

সুদূর অতীত!—মধ্য এশিয়ার বুকে দুরন্ত নেকড়ের ক্রুদ্ধ হুঙ্কার!! সেই হুঙ্কারের প্রতিধ্বনি করে সেকালের তুর্করা দিকে দিকে তাদের বিজয় বৈজয়ন্তী বহন করেছিল।

আজ এতদিন পরে সেই হুঙ্কারের কথা-অনুধ্বনি ইতিহাসের তীর বেয়ে বেয়ে তুর্কদের কানে এসে পেঁছিল।

তারা মরণ পণ করে হুঙ্কার ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেল ঃ হয় আজাদীর জীবন, না হয় শহীদের মৃত্যু।

সমবেত হল তারা এসে মুস্তফা কামাল পাশার পতাকা তলে—এই আঙ্কারারই একটি ভাঙ্গা মডেল স্কুল ঘরে বসে মুস্তাফা কামাল তাঁর নবীন তুর্ক রাষ্ট্র গঠনের মুসাবিদা করতে লাগলেন। সেই ঘরে বসে খালেদা আদিব খানম বৈদেশিক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে লিখিত পত্র টাইপ করতেন ঃ নিকটবর্তী একটি ব্যাঙ্ক হতে ধার-করা আধ-ভাঙ্গা টাইপ-রাইটার মেশিন—নীচু টেবিলের উপর উপুড় হয়ে ছয় ঘণ্টার পরিশ্রমে টাইপ করতেন মাত্র দুইখানি পত্র—কোমরে বেদনা ধরত, মেরুদণ্ড বাঁকা হয়ে যেত; রাত্রিতে শুয়ে শুয়ে বাঁকা মেরুদণ্ডকে সোজা করতে হত, মাজায় মালিশ করতে হত বেদনার দাওয়াই।

তাঁদের সে মরণজয়ী সাধনা সফল হয়েছিল ঃ তুর্করা ফের পেয়েছিল আজাদ জীবনের পরম সম্পদ।

তুর্কদের সে স্বাধীনতা সংগ্রামে ইন্দো-পাকিস্তানের সমগ্র মুছলিম সমাজ হৃদয় উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিল তাদের সক্রিয় সহানুভূতি-ধারা।

আমাদের আজাদী-পাগল সৈনিক কবি সেদিন কামাল পাশা,

আনোয়ার পাশা নামে যে অপূর্ব কবিতা লিখেছিলেন, তা বাংলা সাহিত্যে অতুল্য হয়ে আছে, অক্ষয় হয়ে থাকবে।

মনে পড়ে কামাল পাশার বিজয়ী সৈন্যেরা ছাউনীতে ফিরে তাদের পিঠ হতে শহীদ যোদ্ধাদেরে আস্তে নামিয়ে রাখছে, আর তাদের এই নির্ভীক জীবন দানের মহিমা কীর্তন করে বলছে ঃ

এই ত চাই, এই ত চাই,
থাকলে স্বাধীন সবাই আছি,
নেই ত নাই, নেই ত নাই।

চোখের পাতা ভার হয়ে আসছে। পলাতক ঘুম এতক্ষণে ফিরে এসেছে—তার পাখায় ক্লান্তির জড়িমা। ঘুম—ঘুউম—ঘু—

পরদিন দিনের বেলা। সময় অল্প, দেখবার জায়গা অনেক—সুতরাং কেবল দৌড়—দৌড়—দৌড়। তাড়াহুড়া করে যতটা পারি আঙ্কারা দেখে নিলাম।

আঙ্কারা নতুন শহর—আতাতুর্কের নিজ পরিকল্পনা মোতাবেক জার্মান ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা তৈরী—রাস্তাঘাট, দালান-কোঠা, বাগ-বাগিচা সর্বদিক দিয়েই আধুনিক। তুর্করা আতাতুর্কের জামানার আগে হতেই পাশ্চাত্যের দিকে ঝুকে পড়েছিল, আতাতুর্ক তার উপর আইন করে তুর্ক জাতিকে পাশ্চাত্য আদর্শে ঢালাই করে ষোল আনা আধুনিক করে তোলার সর্বপ্রকার চেষ্টা করে গেছেন। সে চেষ্টার ফল তুর্ক জাতির পক্ষে পরিণামে শুভ হবে না অশুভ হবে, সে আলাদা কথা। কিন্তু দেখে আশ্চর্য হতে হয় যে তুর্ক জাতির বর্তমান জীবনের স্তরে স্তরে এই ব্যক্তির প্রভাব কি স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে। আঙ্কারার রাস্তাঘাটে কারো মাথায় ফেজ, কারো গায় শেরোয়ানী, কারো মুখে দাড়ি দেখলাম না। এদের গায়ের রং সাধারণতঃ ফরসা। কাজেই রাস্তায় লোক চলতে দেখলে হঠাৎ মনে হয়, বুঝি কোন বিলাতি শহরের পথে এসে পড়েছি। মেয়েদের মধ্যে যারা রাস্তায় বের হয়, তাদের সবারই পোষাক পাশ্চাত্য ধরণের।

কচিৎ দুই চারটি বোরকা-পরা মেয়ে দেখা যায়।

মছজিদে গেলাম—একে একে তিন ওয়াক্ত তিন মছজিদে। মছজিদকে এরা বলে জামে। হাজী বৈরামের মছজিদটিই সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে সুন্দর। মছজিদে মুছল্লীর ভিড় নাই, তবে মুছল্লী আছে। মছজিদে গিয়ে হ্যাট রেখে কিস্তি টুপি মাথায় দিয়ে এরা নামাজ পড়ে। কেউ কেউ খালি মাথায়ও নামাজে দাঁড়ায়। মুছল্লীরা সকলে সেকালের বুড়া নয়; জোয়ান তো আছেই, ছোট ছেলেরাও আছে। তুরস্কের রাস্তাঘাটে সৈন্য বিভাগের লোক আমাদের দেশের চেয়ে বেশী দেখা যায়, মছজিদেও সৈন্য সেনাপতি চোখে পড়ে। মছজিদগুলির বাইর তেমন সুন্দর মনে হয় না, কিন্তু ভিতর বেশ সুন্দর এবং সুন্দর ভাবে রাখা হয়। প্রত্যেক মছজিদের মেঝেতেই সুন্দর দামী গালীচা বিছানো। ইমামের খোতবা দেওয়ার স্থানটি বেশ উঁচু ও সুন্দর। তুরস্কের মছজিদে মহিলারাও নামাজ পড়তে যান। তাঁদের গায় বোরকা, অন্ততঃ তখনকার মত, কিন্তু মুখ সম্পূর্ণ খোলা। প্রৌঢ়া বয়সীর নীচে আমি মছজিদে কোন মেয়েছেলে দেখি নাই। তবে জুমা ও তারাবীর সময় নাকি সব বয়সের মেয়ে মুছল্লীতে মছজিদে তাঁদের সংরক্ষিত স্থান ভরে যায়। প্রত্যেক মছজিদের ভিতর একটি দোতলা আছে। এটা কেবল মেয়েদের জন্য। এক-তলাতেও পেছনের দিকে খানিকটা জায়গা একটু উঁচু ও রেলিং দিয়ে ঘেরা থাকে; ও স্থানও মেয়েদের জন্য। আতাতুর্কের প্রভাবে মুছল্লীর সংখ্যা নিঃসন্দেহে কমে গিয়েছে; তবে এখন মুছল্লী ক্রমে বাড়ছে, এমন কথা একাধিক সূত্রে শুনলাম। ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ডাক্তার নিস্তারীনের সংগে কথা হল। তিনি বল্লেন—'হোজারা (ইমাম শ্রেণীর মৌলভী মওলানা) তাঁদের ধর্মীয় প্রভাবকে অনেক সময় সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে রাষ্ট্রে নানা বিঘ্নের সৃষ্টি করতেন; অথচ আসলে এঁদের বেশীর ভাগই না ছিলেন বিদ্বান, না ছিলেন ধার্মিক। কাজেই এই বাড়াবাড়ির অনাচার দূর করতে গিয়ে আতাতুর্কও বাড়াবাড়ি করতে

বাধ্য হয়েছিলেন; তবে এখন জিনিস যার যার ঠিক স্থান গ্রহণ করছে।' তাঁর কণ্ঠে কৈফতের ভাব। তুরস্কের মছজিদের ইমামেরা এখন সরকার হতে বেতন পান—খাদেমরাও পান। আমরা যে মছজিদেই গিয়েছি, সেখানেই মুছল্লীরা পরম সমাদরে আমাদেরে গ্রহণ করেছেন। পাকিস্তানের আবির্ভাবে তাঁদের আনন্দের অন্ত নাই—তাঁরা পাকিস্তানের নিকট হতে অনেক আশা করেন।

আতাতুর্কের মাজারে আমাদের তরফ হতে মোঃ তমিজুদ্দিন খাঁ সাহেব ফুলের তোড়া দিলেন। ছোট সুন্দর মাজারের ঘর—মার্বেল পাথরে সাদাসিধাভাবে মাজার তৈরী। সেইখানে জাতির জনক ঘুমিয়ে আছেন। দেশ বিদেশ হতে যত মাথা-তোলা লোক আঙ্কারায় আসে, তারা এইখানে এসে মালা দিয়ে যায়। সেদিন ইস্তাম্বুলে আন্তঃপার্লামেণ্টের সভায় দাঁড়িয়ে একজন বিশিষ্ট ইংরেজ বল্লেন, গ্যালিপলীর লড়াইয়ে আমি ছিলাম ঃ আমরা মুস্তাফা কামালের কাছে হেরে চলে গেলাম। কিন্তু আমরাও বীর জাতি, বীরের কদর আমরা জানি; তাই বিদায়কালে কামালকে আমরা বীরের শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে গেলাম।

গরমের জন্য আঙ্কারার স্কুল কলেজ সব বন্ধ। পুরাণ একটি কেল্লা দেখতে গেলাম,—এটি এক সময় ছিল রোমকদের; তারপর তুর্করা দখল করে নেয়—তারপর ভুবন বিজয়ী বীর তৈমুর লঙ্গ এই কেল্লায় বসে সুলতান মুরাদকে বন্দী করে নিয়ে ফিরে যান। এখন কেল্লার অবস্থা শোচনীয়। কেল্লার কাছে আঙ্কারার নূতন মিউজিয়াম দেখতে গেলাম। যাদুঘরের কর্তৃপক্ষেরা অসীম আনন্দ উৎসাহে আমাদেরকে সব দেখালেন। তুরস্কের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন আমলের অতীত ঐশ্বর্যের নিদর্শন আমাদেরে দেখাতে তাঁদের বুক গর্বে ফুলে উঠছিল।

বৈকালে ব্যারেজ দেখতে গেলাম। আঙ্কারা হতে ১৫ মাইল দূরে আতাতুর্কের নিজের শখ অনুসারে জার্মান ইঞ্জিনিয়ারদের হাতে তৈরী —অনেক উঁচু মজবুত ও চওড়া দেওয়াল দিয়ে এক দিকে গভীর পানি

আটকানো—ধীরে ধীরে ফাটল দিয়ে পানি অপর পাশে নামছে,—কর্তৃপক্ষের মরজী মোতাবেক। অপর পাশে ছবির মত সুন্দর বাগান, উপবন, ছোট্ট হ্রদ, হ্রদের বুকে পাখী, পারে পাকা বাড়ী—সেখানে গান বাজনা, চা-পান, চড়ুই ভাতী, নৌকা বাইছ—ছুটির দিনে সমস্ত জায়গাটা দর্শকে ভরে যায়। প্রথমে ব্যারেজের উপর হতে দেখলাম, অনেকগুলি ফুলদার বড় বড় গালিচা নীচে বিছানো আছে—ভাবলাম, তুর্কী জাতির অপূর্ব গালিচা-প্রীতি; তাদের ঘরের মেঝেতে গালিচা, সিঁড়িতে গালিচা, মজলিসে গালিচা, মছজিদে গালিচা; এখন দেখছি, তাদের উপবনেও গালিচা। নেমে গিয়ে দেখি, সেগুলি আদৌ কোন গালিচা নয়, রং-বেরং-এর নানা রকম পাতাবাহারের চিকন গাছ এমন ভাবে সাজানো যে তা দিয়ে মাটীতে বিছানো সুন্দর গালিচা তৈয়ার হয়ে আছে।

তুরস্কে শিক্ষার প্রসার খুব দ্রুত চলছে এমন বোধ হয় বলা চলে না; তবে তা সন্তোষজনক মনে হয়। প্রাথমিক শিক্ষা, নারী শিক্ষা, বিজ্ঞান-শিল্প শিক্ষা, এদিকে তুরস্ক যথেষ্ট এগিয়েছে মনে হল। তুরস্কের শিক্ষা রিপোর্টে দেখা যায়—তুর্ক গণতন্ত্র স্থাপনের আগে তুরস্কে শিক্ষার জন্য টাকাও কম ব্যয় হত, আর শিক্ষাদান প্রণালীও ছিল সেকেলে এবং অনেকাংশে বর্তমান জগতের প্রয়োজন মিটাতে অপারগ। এক্ষণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে আধুনিক করা হয়েছে, আর শিক্ষার খাতে সরকার আগের চেয়ে অনেক বেশী টাকার বরাদ্দ করছেন।

তুরস্কের পল্লী শহর যা দেখলাম সর্বত্র ফুল ও গাছের প্রতি এদের অসম্ভব যত্নমায়া। আঙ্কারার রাস্তাঘাট খুব চওড়া। রাস্তার মাঝখান দিয়ে সুন্দর সমান গাছের সারি—সেই সারির মধ্য মাঝে মাঝে ফুলের বাগান। মনে হয় গাছের সারির এপাশ ওপাশ দিয়ে এক রাস্তা ভাগ হয়ে ফুলের পানে চেয়ে চেয়ে, শাখার পাখায় হাওয়া খেয়ে খেয়ে প্রশান্ত ছায়ায় স্নিগ্ধ হয়ে অজানার পানে চলেছে আর চলছে। এক ভদ্রলোক বল্লেন, আতাতুর্ক এসব গাছকে আমরণ বাচ্চার মত ভালবাসতেন এবং

-মায়ের মত স্নেহ দিয়ে এসবকে তিনি লালন করেছেন। এর প্রত্যেকটী গাছ তাঁর চেনা ছিল।

ইস্তাম্বুল
৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫১

শুজা,

তুমি জানিয়েছ, আঙ্কারার যে ঐতিহাসিক ময়দানে তৈমুর বাইয়াজীদে সাক্ষাৎ হয় তা যেন দেখে আসি। আমার আগের পত্রে দেখবে, আঙ্কারার বহু জায়গা, বহু বস্তু আমি দেখেছি, শুধু ঐ জায়গাটা দেখি নাই, দেখবার ইচ্ছাও করি নাই। সে ময়দান তুর্কদের পরাজয়ের ময়দান, কাজেই তা দেখাতে তুর্কদেরো কোন আগ্রহ হয় নাই।

কিন্তু তুর্কদের আগ্রহ না হোক, আমার আগ্রহ হল না কেন জিজ্ঞাসা করতে পার। আমার উত্তর ঃ

তৈমুর বাইয়াজীদ সংঘর্ষের আগের কথা। তুর্কের অভ্যুদয় দেখে হিংসায় য়ুরোপ জর্জর। অবশেষে তুর্কের বিরুদ্ধে তারা ঘোষণা করল জেহাদ। য়ুরোপের বাছা বাছা যোদ্ধারা দুনিয়ার বুক হতে তুর্কের নাম মুছে ফেলার সংকল্প নিয়ে যুদ্ধংদেহি বলে নাইকোপলীসের ময়দানে হাজির হল। সুলতান বাইয়াজীদ উত্তর দিতে সসৈন্য উপস্থিত হলেন। তুমুল সংগ্রাম ঃ সংগ্রামে য়ুরোপের সমবেত সৈন্য পরাজয় মেনে পালিয়ে গেল। সুলতান হেঁকে বসলেন, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আর যাই দাও, তার সাথে চাই ইস্তাম্বুল। বাইজেণ্টাইন সম্রাট আবার জেহাদের জন্য য়ুরোপের দেশে দেশে সৈন্য চেয়ে লোক পাঠালেন। সুলতান ইস্তাম্বুল অবরোধ করে বসলেন। দীর্ঘ অবরোধের পর ইস্তাম্বুলের পতন যখন আসন্ন হয়ে এসেছে, সেই সময় তৈমুর বাইয়াজীদের বিরুদ্ধে অভিযান নিয়ে আঙ্কারায় উপস্থিত হলেন। বাইয়াজীদকে ইস্তাম্বুল ছেড়ে আঙ্কারায় ফিরে আসতে হল। শুরু হল ভীষণ যুদ্ধ; বাইয়াজীদের

রণক্লান্ত সৈন্যরা তৈমুরের সামনে টিকতে পারল না। তৈমুর বাইয়াজীদকে বন্দী করে নিয়ে চলে গেলেন। তার পেছনে পড়ে রইল ভয়াবহ ধ্বংসের চিহ্ন, আর পড়ে রইল একটা বিপুল স্বপনের মর্মান্তিক কঙ্কাল।

তৈমুরের পক্ষে কি দরকার ছিল এ যুদ্ধের? দুশমনেরা যেখানে চোখের সামনে সংঘবদ্ধ হয়ে ইছলামের ধ্বংসের জন্য বদ্ধপরিকর, সেখানে তৈমুর বাইয়াজীদের সঙ্গে যোগ না দিয়ে যে তাঁর ধ্বংসের আয়োজনে লেগে গেলেন, এর কোন সঙ্গত কৈফত আছে? তৈমুরের এই একটি ভুলের জন্য য়ুরোপে ইছলামের প্রভাব প্রতিপত্তির পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেল। এর একপঞ্চাশ বছর পর দ্বিতীয় মুহম্মদ ইস্তাম্বুল জয় করলেন বটে; কিন্তু ঐ ইস্তাম্বুল ও তার আশপাশের কয়েকটি ছোট্ট দেশেই তাদের প্রতিষ্ঠা সীমাবদ্ধ রয়ে গেল। কারণ এই একপঝাশ বছর ধরে কঠোর সাধনা করে য়ুরোপ তখন ক্ষাত্র-শক্তিতে অজেয় হয়ে উঠেছে।

আজ য়ুরোপে তুর্ক প্রভুত্ব বিলুপ্ত হয়েছে; তা হোক। এক জাতি কেবল বাহুবলের দাবীতে অন্য জাতির ঘাড়ে চেপে থাকবে, এ কোন দিক দিয়েই সঙ্গত নয়। কিন্তু মুছলমান, কেবল এই অপরাধে যে আজ গ্রীস, রুমানীয়া, সার্বিয়া, বুলগেরিয়া হতে মুছলমান বাসিন্দারা মার খেয়ে বিতাড়িত হয়ে দুয়ারে দুয়ারে আশ্রয় ভিক্ষা মেগে বেড়াচ্ছে, এর জন্য মূলতঃ দায়ী তৈমুর লঙ্।

Ex 6 ((তৈমুরের আঙ্কারার এ বিজয় আসলে তাঁর জীবনের পরম পরাজয়, চরম কলঙ্ক।

একবার নয়, বার বার মুছলমান এমনি করে তার পায়ে নিজে কুঠার মেরেছে; প্রমাণ করেছে সেই বাণীর সত্যতা যে, যে পর্যন্ত কোন জাতি স্বেচ্ছায় তার অবস্থা-বিপর্যয় না ঘটায় সে পর্যন্ত আল্লাহ্ তার অবস্থা-বিপর্যয় ঘটায় না।))

পঞ্চদশ শতাব্দীর আরম্ভে সুলতান বাইয়াজীদ যে স্বপন দেখেছিলেন তার সাত শ বছর আগে দুটি আরব সৈন্যাধ্যক্ষও পিরেনীজ

শিখরে দাঁড়িয়ে তেমনি য়ুরোপ বিজয়ের সোনালী স্বপন তাঁদের চোখের সামনে সুস্পষ্ট দেখেছিলেন। তখন খৃষ্টান য়ুরোপ ঐক্যহীন, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, দুর্ব্বল, আরবের ভয়ে জড়সড়; আর মুছলিম যোদ্ধারা বিজয়-দৃপ্ত, নব নব কীর্তি অর্জনের জন্য উদগ্রীব। কাজেই মুছা আর তারিক সংকল্প করলেন, তাঁরা য়ুরোপের পশ্চিম থেকে যাত্রা করে খৃষ্টান রাজ্য সমূহের উপর দিয়ে ইস্তাম্বুল হয়ে ইছলামের তৎকালীন রাজধানী দামেশ্কে গিয়ে হাজির হবেন। কিন্তু খলীফার রাজধানীর সর্বনাশা ষড়যন্ত্র ও আত্মকলহের ফলে সে স্বপ্নকে ভূমধ্যসাগরে বিসর্জন দিয়ে ভগ্ন হৃদয়ে বঞ্চিত বীরদ্বয়কে ফিরে আসতে হল।

এর অল্পাধিক বিশ বছর পরের কথা। ৭৩২ খৃষ্টাব্দ। আরব যোদ্ধারা মুছলিম স্পেন হতে ফ্রান্সে গিয়ে প্রবেশ করেছে। তাদের অগ্রগমনে য়ুরোপে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। টুরসের ময়দানে খৃষ্টান মুছলিম সৈন্যরা সম্মুখীন হল; রণ-দামামা বেজে উঠল। উভয় পক্ষই মরণ পণ করে লড়াই শুরু করল। অবশেষে খৃষ্টান সৈন্যের কাতার টলটলায়মান হয়ে উঠল। আসন্ন লুণ্ঠনের লোভে মুছলিম সৈন্যরা কাতার ভঙ্গ করে শৃঙ্খলাহীন হয়ে পড়ল। এ দৃশ্য খৃষ্টান সেনাপতির নজর এড়াল না; তিনি তক্ষণি তাঁর ছত্রভঙ্গপর সৈন্যদলকে একত্র করে ভীষণ বেগে আক্রমণ চালালেন। এ আক্রমণ মুছলিম সৈন্যরা সইতে পারল না; পরাজয় বরণ করে ছাউনীতে ফিরে এল।

জালুলার যুদ্ধজয়ের ফলে মদীনায় এসে পৌঁছেছিল বহু লুণ্ঠিত
Ex- ৭. মাল। সবাই যখন বিজয়ের উৎসবে মত্ত, হজরত ওমর তখন সেই লুণ্ঠিত মালের স্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে অশ্রু বর্ষণ করছিলেন। কেউ অবাক হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন, 'এই লুণ্ঠিত মালের মধ্যে আমি মুছলমানের ভবিষ্যৎ ধ্বংস দেখতে পাচ্ছি।' হজরত ওমর ঠিক বলেছিলেন। টুরসের লড়াইয়ে মুসলমানদের জয় হলে কি হত, জান? বড় বড় ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করছেন যে এ যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যের

বিজয় লাভ ঘটলে য়ুরোপে প্রতিষ্ঠিত হত ইছলামের শক্তি ও সভ্যতার প্রভাব; অক্সফোর্ড ক্যামব্রিজে পড়ান হত আরবের কাব্য আর ইছলামের ইতিহাস; ল্যাটিন সাহিত্য আর গ্রীস রোমের ইতিহাস হত বিশেষজ্ঞদের পাঠ্য বিষয়।

২৮শে আগষ্ট রাত্রিতে আমরা রেলপথে ইস্তাম্বুল যাত্রা করলাম। পাকিস্তান দূতাবাসের বন্ধুরা এসে গাড়ীতে তুলে দিলেন। আঙ্কারার শহীদানের উদ্দেশে ছালাম জানিয়ে বিছমিল্লা বলে গাড়ীতে উঠলাম।

আবার সেই সুন্দর ট্রেন। ট্রেনে সুন্দর বেড়ানের ব্যবস্থা, খাবার ব্যবস্থা, শোবার ব্যবস্থা। রাস্তায় রাস্তায় আবার পাহাড়, আবার পর্বত, আবার সুড়ং, আবার পথের পাশে গহীন তল; আবার ঝির ঝির ছোট্ট নদী, নদীর পারে পারে গাছের সারি; ছোট ছোট গাঁ, পাথরের বাড়ী; ভেড়া, উট, গাধা, ফুলের বাগান, ফলের উপবন, শস্যের আবাদ। দেখে দেখে ঘুমিয়ে পড়লাম।

২৯শে আগষ্ট ইস্তাম্বুলের ষ্টেশন হায়দর পাশায় পৌঁছলাম। তুরস্কের পাকিস্তানী দূত মিঞা বশীর আহমদ তাঁর সাথীদের সহ উপস্থিত ছিলেন। লোকটি ভদ্রতার পরম সুন্দর আদর্শ। এঁর পিতা ছিলেন চীফ কোর্টের জজ, শ্বশুর ছিলেন প্রখ্যাতনামা স্যার মুহম্মদ শফী, নিজে কেমব্রিজের গ্রেজুয়েট, তার উপর ব্যারিস্টার, উর্দু সাহিত্যের সুপরিচিত লেখক। এমন লোকের সব সময় মাথা ঠান্ডা থাকে না; কিন্তু ভদ্রতায় এঁকে হারিয়ে যেতে পারেন, এমন লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন। তাঁর বেগমটিও তেমনি সৌজন্যের আধার। ইংরেজী, উর্দু, তুর্কী, ফারছী—কয়েক ভাষাতেই সুন্দর কথা বলে যান। বেগম সাহেবার বাড়ীতে যে পরম পরিতোষের সাথে এক দিন নাশ্তা, আর একদিন পোলাও-কোরমা খেয়েছি, সে কথা কাউকে বলব না; দুষ্ট লোকে মনে করতে পারে, এ প্রশংসা বুঝি তারই বিনিময়।

ইস্তাম্বুলে আমরা তারাবীয়া হোটেলে উঠলাম। বসফরাসের একদম

Shamsul.

উপর—মস্তবড় সুন্দর হোটেল—তারো চেয়ে অদ্ভুত সুন্দর বসফরাসের অনুপম দৃশ্য। ওপারে এশিয়া, এপারে য়ুরোপ—মাঝখানে মাইলখানেক, কোথাও কোথাও তারো চেয়ে কম—পাশে এই বসফরাস। ছোট ছোট ঢেউ—ঢেউয়ের উপর সূর্য কিরণের চিকিমিকি—তারই উপর ছোট ছোট মোটর-বোট—দিন রাত ফট ফট দৌড়াদৌড়ি করছে—নৌকাবাইছ দিতে এবেলা-ওবেলা শত শত নারীপুরুষ নেমে গেছে—নিজেরাই দুইহাতে দাঁড় টানছে—হয়রান হলে নৌকার উপর শুয়ে কিরণ স্নান করছে; ছোট ছোট জাহাজ মাঝে মাঝে গর্জন করে ছুটেছে—বড় বড় গাঙ্গচিল পোষা পাখীর মত আশেপাশে নির্ভয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে, সকালে বিকালে পাড়ের পাইনেরা পানির আয়নায় মুখ দেখে নিচ্ছে।

বসফরাসের এপারে-ওপারে দুই পারেই ইস্তাম্বুল। দেশ-বিদেশে যাঁরা ঘুরে বেড়িয়েছেন, তাঁদের বেশীর ভাগেরই মত এই যে, ইস্তাম্বুলের মত সুন্দর শহর দুনিয়ায় আর কোথাও নাই। ইস্তাম্বুলীরা তাঁদের রাজধানীকে সাত পাহাড়ের শহর বলে গর্ব বোধ করেন। সাতটি ছোট ছোট পাহাড়ের উপর নাকি এই শহর প্রথম অবস্থিত ছিল। এখন একে পাহাড়-উপত্যকা—সাগর-প্রণালীর শহর বলা যেতে পারে। টিলার মাথার উপর, টিলার গায়, টিলার পায়ের কাছে, উপত্যকার বুকে, বসফরাসের তীরে তীরে অসংখ্য সুন্দর বাড়ী—অসংখ্য সুন্দর পাথরের রাস্তা—অসংখ্য সুন্দর পাইন ছরব গাছের সারি—অসংখ্য সুন্দর ছোট ছোট বাগিচা, ছোট ছোট উপবন।

ইস্তাম্বুলের উপকণ্ঠে মর্ম সাগরে কয়েকটি ছোট দ্বীপ—তাদের সাধারণ নাম কুমার দ্বীপ। এ নাম কেন হল, জিজ্ঞাসা করায় একজন বল্লেন ঃ অনেক—অনেক দিন আগে এক ছিল রাজপুত্র—পিতার একমাত্র সন্তান। কিন্তু সম্রাট স্বপনে দেখলেন যে, কুমার সাপের কামড়ে মারা যাবে। তখন সম্রাট কুমারকে এই নির্জন দ্বীপে কড়া পাহারায় রাখলেন। দিন যায়, কুমার আস্তে আস্তে বড় হয়; পাহারার শাসন আরও বেড়ে

যায়। কিন্তু এত কড়া পাহারা এড়িয়েও একদা এক সাপ সাগর পাড়ি দিয়ে গিয়ে কুমারকে কামড়িয়ে দিল। কুমারের মৃত্যু হল।

এই সব দ্বীপের মধ্যে যেটি বড়, তাই দেখতে যেতে তুর্ক সরকারের তরফ হতে দাওয়াত হল। গেলাম। দ্বীপটি অপূর্ব সুন্দর। দ্বীপের বারো আনাই পাহাড়, এই পাহাড়ের পায়, গায়, মাথায় বাড়ী আর বাড়ী; —আর সে অমন সুন্দর বাড়ী! দ্বীপের পাড়ে পাড়ে রেলিং দিয়ে ঘেরা জায়গায় রেস্তোরাঁ ঃ সন্ধ্যায় হাজার হাজার লোক মুক্ত আকাশের নীচে, স্নিগ্ধ হাওয়ার দোলায়, সাগর সংগীতের তালে তালে সেখানে চা খায়, গল্প করে, গান জুড়ে দেয়, হয়তো বা খেলায় মাতে। মস্ত বড় বড় দোকান—সৌখীন জিনিষে ভরপুর—অতি সুন্দর পাথর কাটা রাস্তা। পৃথিবীর নানান দেশের প্রতিনিধিরা দ্বীপ দেখতে যাবে শুনে দ্বীপের বাসিন্দারা আমাদের যাতায়াতের পথের পাশে ভেঙ্গে পড়ল। স্বাস্থ্যে, পোষাকে, চেহারায় লোকগুলি দেখবার মত। দ্বীপের রেস্তেরায় আমাদের খানার দাওয়াত ছিল। খাওয়ার ব্যবস্থাও নিখুঁত। ফিরবার পথে এক বন্ধুকে বললাম—এমন দ্বীপ, অমন বসফরাস, আর এই ইস্তাম্বুল, এসব যাদের আছে, তাদের পক্ষে দেশের জন্য মরণ পণ করে লড়তে যাওয়া কঠিন হবার কথা নয়।

বাইজেন্টাইন যুগের প্রথম আমলে এ দ্বীপে খৃষ্টান পাদ্রী ও পাদ্রীনীরা আশ্রম বেঁধে থাকতেন ও এই শান্ত পরিবেশে ধর্ম চর্চা করতেন। বাইজেন্টাইনদের অবনতির যুগে এই সব ধর্মমন্দিরকে তৎকালীন সম্রাটেরা তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের কারাগাররূপে ব্যবহার করতে শুরু করেন, অনেক সিংহাসনচ্যুত সম্রাটকে অন্ধ করে মাথার চুল কেটে এইখানে পাঠিয়ে দেওয়া হত। তাদের নিষ্ঠুর কারাগারের ধ্বংসাবশেষ এখনো নজরে পড়ে।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সম্রাট জাষ্টীনীয়ান এখানে একটি প্রাসাদ ও গীর্জা নির্মাণ করেন। নবম শতাব্দীতে ষষ্ঠ কন্সট্যান্টাইন তাঁর মাতা

সম্রাজ্ঞী ইউরীনকে সিংহাসন হতে নামিয়ে এই দ্বীপে নির্বাসনে দেন। রাশিয়া হতে পালিয়ে আসার পর বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা ট্রটস্কীকে এখানে কিছুদিন অন্তরীণে আবদ্ধ রাখা হয়।

দ্বীপের রেস্তোরাঁ হতে জাহাজ ঘাটে আসছি, তখন আবার দুই পাশে তামশগীর দাঁড়িয়ে গেল। চলতে চলতে একটা দোকানের পাশে থেমেছি, দেখি, ছোট্ট একটি ফুটফুটে ছেলে তার বাপের কোল হতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি কাছে গিয়ে হাত বাড়ালাম। সে অমনি বাপের কোল ছেড়ে আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। সে তখন আমার গালে সস্নেহে একটি ছোট্ট চুমা বসিয়ে দিল, তার পর আমার দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, "এ কি? বাবা, এ কি?" আশেপাশের সবাই এ দৃশ্যে হেসে খুন। কিন্তু কৌতূহলী শিশু তাতে সম্পূর্ণ বে-পরোয়া—সে ক্রমান্বয়ে জিজ্ঞাসা করেই চল্ল। বাপ বল্লেন—ওকে বলে দাড়ি। শিশু বল্ল, "আচ্ছা, তোমার দাড়ি নাই কেন?" বাপ বল্লেন—"আমার দাড়ি আমি কেটে ফেলি কিনা, তাই।" শিশু আবার জিজ্ঞাসা করল—"আচ্ছা, মা তো আর দাড়ি কাটে না, তাঁর দাড়ি নাই কেন?" সবাই আবার হেসে উঠল। এবারও বালক তেমনি বে-পরোয়া। বল্লঃ হ্যাঁ, বাবা, দাড়ি থাকা কি ভাল? বাপ বলেন, "নিশ্চয় ভাল।" শিশুটির চোখমুখ খুশীতে ঝলমল করে উঠল। বাবা হাত বাড়িয়ে বল্লেন, এখন তবে এস, বাবা। শিশু আমার গালে আর একটি চুমা দিয়ে বাপের কোলে চলে গেল।

জাহাজে আসতে আসতে ভিতরের দিকে চাইলাম। দেখলাম, শ্যামল দুর্বাদলের উপর হেমন্তের শিশিরবিন্দু যেমন প্রভাত সূর্যের কিরণ পরশে অপরূপ স্বপনে শিউরে উঠে, তারই মত ক্ষণিকের মায়ার একটি বিচিত্র বিন্দু আমার স্মৃতির বোটায় অক্ষয় হয়ে ফুটে আছে।

৩০শে আগষ্ট হতে শুরু করে ৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইলদীজ প্রাসাদে আন্তঃপার্লামেন্টারী কনফারেন্সের অধিবেশন হল। সভায়

RAMNOGOR ELEVEN BULLET CLUB
Estd 1967
DATE ... ...
P.O. SHAR[illegible]KANDI
DIST. BOGRA

পৃথিবীর ৩৩টি দেশের ৪৭০ জন প্রতিনিধি হাজির ছিলেন। সভাপতিত্ব করলেন তুর্ক প্রতিনিধি দলের নেতা। সভার আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে প্রধান ছিল যুদ্ধনিবারণ, মোহাজের আর দুনিয়ার খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা। নির্বাচন, উপ-নির্বাচন, কমিটি সভা ইত্যাদি তো ছিলোই। আমাদের ডেলিগেশনের সবাই বক্তৃতা করলেন—ইংরেজীতে। বাকী মেম্বরদের মধ্যে যাঁরা ইংরেজী না জানেন, তাঁরা প্রধানতঃ ফরাসী ভাষায় বক্তৃতা করলেন। দক্ষ দোভাষী মোতায়েন ছিলেন, তাঁরা সংগে সংগে ইংরাজী বক্তৃতা ফরাসীতে আর ফরাসী বক্তৃতা ইংরাজীতে অনুবাদ করে বললেন।

১লা সেপ্টেম্বরের সভায় যুদ্ধনিবারণ সম্বন্ধে আমার বক্তৃতার পালা ছিল। অন্যান্য কথার মধ্যে বললাম ঃ যুদ্ধে হার হোক, জিত হোক, তার ফল কোন পক্ষের জন্যই কোন অবস্থাতেই সুখের নয়। যে জাতি যুদ্ধে নিতান্ত গৌরবময় বিজয়ও লাভ করে বসে, তবু যুদ্ধ উপলক্ষে সে জাতি নিজে যা করেছে এবং অন্যকে করতে বাধ্য করেছে, তার জন্য তাকে অনাগত ভবিষ্যতের কাছে লজ্জায় মাথা নত করে দাঁড়ান ছাড়া আর কোন পথই থাকবে না। অতএব আমাদের আজ কর্তব্য, সর্বপ্রকার উপায়ে অনতিবিলম্বে যুদ্ধবিরোধী মনোভাবের অলঙ্ঘনীয় দেয়াল গড়ে তোলা। মানুষের সমাজ হতে যুদ্ধকে যেদিন নির্বাসন দেওয়া সম্ভব হবে, মানবীয় সাধনার চরম সাফল্যের শুভক্ষণ বলে সেদিন মানুষের কীর্তির ইতিহাসে তা সোনার হরফে লেখা পড়বে। ** আমি বলি সকল দেশের সকল সরকার এক্ষনি বাধ্যকরী আইন করে দিন যে, প্রত্যেক গীর্জার পাদ্রী, প্রত্যেক মছজিদের ইমাম, প্রত্যেক মন্দিরের পুরোহিতকে সপ্তাহে একবার যুদ্ধবিরোধী বক্তৃতা করতে হবে, প্রত্যেক সম্পাদককে সপ্তাহে অন্ততঃ একবার তাঁর কাগজে শান্তিবাণী প্রচার করতে হবে, প্রত্যেক বেতার ষ্টেশন হতে প্রতি রবিবার যুদ্ধের কুফল সম্বন্ধে আলোচনা হবে, প্রত্যেক স্কুল কলেজ ও

Ex 8

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে যুদ্ধবর্জনমূলক পুস্তকের ব্যবস্থা করতে হবে। * * আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব,—বিভিন্ন জাতির বিরোধী মতবাদ পরস্পরে যাতে দরদ দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেন তার ব্যবস্থা করুন। আজ যে মতবাদের দরিয়া বিভিন্ন জাতিকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, তার তীরে দাঁড়িয়ে পরস্পরকে কেবল অভিশাপ দিলে সে দরিয়ার পাশ বেড়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনই ফল হবে না।

৪ঠা সেপ্টেম্বরের অধিবেশনে দুনিয়ার খাদ্যবিতরণ সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। আমি সেদিনের বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলি ঃ আমরা তথাকথিত উন্নত জাতিরা বড় গলায় যখন বড়াই করেছি যে, আমাদের সভ্যতা সমগ্র মানব সমাজের সম্মুখে সৌভাগ্যের আবেহায়াতের উৎস খুলে দিয়েছে, ঠিক সেই সময় হাজার হাজার নয়, লাখে লাখে নয়, কোটি কোটি জীব—আমরা দাম্ভিকতার সঙ্গে 'অসভ্য' 'বর্বর' বলে যাদেরে মানুষের গন্ডীর বাইরে ফেলে রেখেছি, অথচ যাদেরে মহান স্রষ্টা—আমাদেরই মত হাত-পা বিশিষ্ট করে, হয়তো আমাদেরো চেয়ে তাদের বেশী ভালবাসেন বলে এত বিপুল সংখ্যায় সৃষ্টি করেছেন, সেই তারা অজ্ঞতার পঙ্কে অসহায়ভাবে গড়াগড়ি দিয়েছে, কুসংস্কারের অন্ধকারে পথ হাতড়িয়ে মরেছে, ক্ষুধার আগুনে জ্বলে জ্বলে কঙ্কালসার হয়েছে, হয়তো বা অকালে মৃত্যুর কোলেই ঢলে পড়েছে। অথচ সেজন্য আমাদের চিত্ততলে অনুশোচনার কোন ছায়াপাত হয় নাই; বরং ছড়ায়-ছবিতে, কথায়-কাহিনীতে তাদের উলংগ চিত্র এঁকে এঁকে আমরা নির্লজ্জ অহঙ্কারে আস্ফালন করে বলেছি দেখ--দেখ, ওদের তুলনায় আমরা কত ভাল আছি। সভ্যতার ইতিহাসে এর চেয়ে কলঙ্কময় অধ্যায় আর হয় না। সেনেটার ব্যাকষ্টারের সাথে আমরা কণ্ঠ মিলিয়ে বলি—বিধাতা সমস্ত দুনিয়াকে এক করেই সৃষ্টি করেছিলেন এবং এটাও নিশ্চয় তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, জাতি-বর্ণ-শ্রেণী নির্বিশেষে সকল দেশের সকল মানুষ দুনিয়ার সে সম্পদ মিলে মিশে খাবে। আমাদের শিক্ষা, আমাদের সভ্যতা, আমাদের ধর্ম

আমাদের মনুষ্যত্ব, সমস্ত মিলে অকুণ্ঠ কণ্ঠে দাবী করছে যে, এই ভুখা ভাইদের মুখে ভাত দেওয়ার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা আমাদের করতেই হবে।

সভায় অনেক ভাল ভাল বক্তৃতা হল। একটি তুর্কী তরুণী ইংরেজীতে বক্তৃতা করলেন ঃ ভাষা, ভাব, বলার ভঙ্গি, সভাস্থ সকলে প্রত্যেকটিরই প্রশংসা করলেন।

সভার আলোচনায় একটা জিনিস স্পষ্ট বোঝা গেল—যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাব ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করছে; দুনিয়ার খাদ্য সম্পদ দুনিয়ার সবাই ভাগ বাটোরা করে খাক—এ মতাবলম্বীর সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতের জন্য এ অতি শুভ লক্ষণ। আন্তঃপার্লামেন্টারী ইউনিয়ন আলোচনার পরিষদ মাত্র, এর কথা কাজে পরিণত করার জন্য এর পেছনে কোন প্রবল সৈন্যবাহিনী নাই; কিন্তু সৈন্যদল তো আসলে আইডিয়ারই সৃষ্টি। সেই আইডিয়া যদি এখানে শক্ত দানা বেঁধে ওঠে, তবে তার সামনে কেবল পশুবলে বলীয়ান সৈন্যদল কতক্ষণ টিকবে? মিঃ টম যে কান্ডারিয়া দেশের সোনা ফলা জিলায় জন্মেছে, সে তার বাহাদুরী না, একটা আকস্মিক ঘটনা মাত্র; আর মিঃ ফিতরত যে আঙ্কারিয়া মরুভূমির বালুর বুকে জন্মলাভ করেছে, সে তার অপরাধ নয়, কারণ সে বিধাতাকে বলে কয়ে তার জন্ম স্থান বেছে চেয়ে আনে নাই।((এই একটা সাড়ে ষোল আনা রকমের আকস্মিক ব্যাপারের জন্য মিঃ টম আমরণ প্রাচুর্যের বুকে গাড়াগড়ি দিবে, আর মিঃ ফিতরত আমরণ ক্ষুধার অনির্বাণ আগুনে পুড়বে, সর্বোপরি, আশরাফুল মখলুকাত মানুষ এই আকস্মিকতার খোশ খেয়ালকে অসহায়ের মত চিরদিন তার ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করতে দিবে এ হয়না—হতে পারে না।))

Ex-9

আন্তঃপার্লামেন্টারী কনফারেন্সের মাঝে মাঝে সামান্য ফাঁক ছিল। সেই ফাঁকের সুযোগে তুর্ক প্রতিনিধিদল, তুর্ক প্রধান মন্ত্রী, তুর্ক রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট, ইস্তাম্বুলের গভর্ণর, এঁরা আমাদের দাওয়াত করলেন এবং সেই দাওয়াত উপলক্ষে অনেকগুলি জায়গা দেখারও ব্যবস্থা

করলেন। কুমার দ্বীপে নিয়ে সেখানে নৈশ ভোজের সদ্ব্যবহার করা এই দাওয়াতসমূহের অন্যতম ছিল।

২রা সেপ্টেম্বর তারিখে আমরা তোপকাপী প্রাসাদ দেখতে গেলাম। তুর্কী সুলতানদের এই-ই আদিম প্রাসাদ। বিরাট বাড়ী। এখন মিউজিয়াম। একজন তুর্কী অফিসার আমাদেরে ইংরেজীতে বুঝিয়ে দিলেন। যাঁরা ইংরেজী জানেন না, তাঁদের জন্য ফরাসী জানা দোভাষীর ব্যবস্থা ছিল।

ইস্তাম্বুল বিজয়ী বীর সুলতান দ্বিতীয় মুহম্মদ ১৪৭৮ সালে এখানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এরই নাম পরে হয় তোপকাপী প্রাসাদ—অর্থাৎ কিনা তোপ-দুয়ারী মহল। এই সময় হতে শুরু করে ১৮৫৩ সালে দোলমা বাগচা প্রাসাদ নির্মাণ কাল পর্যন্ত পোনে চার শ বছর কাল এই প্রাসাদে বসে ছলিম, ছোলায়মান প্রভৃতি পরাক্রান্ত তুর্ক সুলতানেরা য়ুরোপ-এশিয়া-আফ্রিকার ভাগ্য নির্ণয় করতেন। এ প্রাসাদের প্রত্যেক দেয়াল, প্রত্যেক গুম্বজ, প্রত্যেক স্তম্ভ এক কালে দেখছে কত গৌরব মহিমময় ঘটনা, কত সাম্রাজ্য জয়ী অভিযানের পরিকল্পনা এখানে অঙ্কুরিত হয়েছে, কত নিষ্ঠুর হত্যার রক্ত স্রোতই না এর প্রাঙ্গণকে কলঙ্কিত করেছে!

প্রাসাদে কক্ষের অন্ত নাই। প্রত্যেক কক্ষই কোন না কোন প্রদর্শন-যোগ্য বস্তুতে ভরপুর।

আয়াছুফীয়ার দিক হতে দক্ষিণ দুয়ার দিয়ে প্রাসাদে ঢুকতে হয়। এ দুয়ারের নাম বাবে হুমায়ুন—শাহী দরজা। এ দরজা পার হয়ে প্রথম আঙ্গিনায় পড়তে হয়। এ আঙ্গিনা পার হয়ে গেলে ফের আর একটি দুয়ার—দুয়ারের উপর উঁচু উঁচু কোঠা—সুলতানদের বিরাগভাজন আমীর-ওমারাকে এখানে বন্দী করে রাখা হত। দামাদ ইব্রাহীম পাশা দেশে ছাপাখানা স্থাপন করেছিলেন আর পাশ্চাত্য ভাব ও চিন্তাধারা

আমদানীর চেষ্টা করছিলেন, এই অপরাধে জান্নিছারী সৈন্যরা তাঁকে এইখানে হত্যা করে।

এ দুয়ার পার হয়েই চোখে পড়ে বড় বড় অনেকগুলি কামান। ইস্তাম্বুল দখল করতে বিজয়ী মুহম্মদ যে কামান ব্যবহার করেন, তা এদেরই মধ্যে। মহান ছোলায়মান ভিয়েনা অবরোধকালে যে কামান ব্যবহার করেন, তাও এখানে। তারপর গেলাম ছোট ছোট অস্ত্রের ঘরে। কত রকমের তীর-ধনুক, ঢাল-তলোয়ার, কুঠার ও জেরা, তার যেন আর অন্ত নাই। একটা লোহার ধনুক ভাঙ্গা অবস্থায় রক্ষিত আছে। আমাদের দোভাষী পরম গর্বের সঙ্গে সেটা দেখিয়ে বল্লেন, 'পারস্যের বাদশা শা ইছমাইলের নাম তো শুনেছেন? পারস্যে অতবড় বাদশা আর হয় নাই। কিন্তু বড় হলে কি হয়? হঠাৎ তাঁর মাথা অহঙ্কারে ফুলে উঠল। তিনি টক্কর দিতে চাইলেন আমাদের সুলতান ছলিমের সাথে। গর্বিত বাদশা ঐ লোহার ধনুকটি আমাদের সুলতানের কাছে পাঠিয়ে বল্লেন, 'আপনার রাজ্যময় সবাইকে দিয়ে চেষ্টা করিয়ে দেখুন, কেউ এ ধনুকে ছিলা লাগাতে পারে কি না।' পারস্যের দূত কুর্নীশ করে পত্র ও ধনুক সুলতানের সামনে পেশ করে উত্তরের প্রতীক্ষায় জোড় হাতে দাঁড়িয়ে রইল। সুলতানের কাছে তাঁর ৭০ বছর বয়সী উজীর বসা ছিলেন। সুলতান বল্লেন, 'উজীর, তা হলে আচ্ছা রকমের একটি তুর্কী জোয়ান ডেকে দিন। সে চেষ্টা করে দেখুক।' উজীর বল্লেন, 'জাহাঁপনার হুকুম হয় তো এই বুড়া নফর একটু চেষ্টা করে দেখতে পারে।' এই বলে তিনি এমন জোরে ধনুকে টান দিলেন যে, ধনুক চিঁড়িং চিঁড়িং ডাক ছেড়ে মাঝখানে ভেঙ্গে গেল। দূত তো অবাক। সুলতান শা'কে লিখে পাঠালেন, 'ও ধনুক তো আমার বুড়া উজীরের হাতেই টিকল না: আমার দেশের জোয়ানদের জন্য আরো মজবুত একটা ধনুক পাঠিয়ে দিন।'

অস্ত্রের ঘর হতে বাসনকোসনের ঘরে গেলাম। দোভাষীর দিলে তখন জোয়ার লেগেছে; বল্লেন—'দুনিয়ার বড় বড় সব দেশের যাদুঘরই

আমি দেখেছি, এত হরেক রকমের এত সুন্দর এত বেশী বাসনকোসন আমি আর কোথাও দেখি নাই।' খলীফারা যে সব বাসন নিজে ব্যবহার করতেন, এ কেবল তারই সংগ্রহ—দুনিয়ার যেখানে যা ভাল পাওয়া গেছে, তাই তাঁরা সংগ্রহ করেছিলেন। আমাদের কাছেও বাসনকোসনের সংখ্যা, বৈচিত্র ও কারুনৈপুণ্য অদ্ভুত বলেই মনে হল।

তারপর গেলাম সোনারুপা, হীরা-জহরতের ঘরে। কেবল রুপায়, কেবল সোনায়, কেবল হীরা-জহরতে তৈরী বহু মূল্যবান বহু জিনিস দেখলাম—সুলতানদের তৈরী সিংহাসন, তাঁদের মুকুট, বেগমদের গয়না কাপড় ইত্যাদি। দোভাষী একটী অতি মূল্যবান সিংহাসন দেখিয়ে বল্লেন— "ঐটি পারস্যের সেই শা ইছমাইলের সিংহাসন।" আমি বল্লাম, "তাঁর সিংহাসন এখানে এল কি করে?" সহসা তুর্কের সুপ্ত অহঙ্কার মাথা তুল্ল; দোভাষী উচ্ছ্বসিত কন্ঠে বলে উঠলেন—তাকে যে আমরা যুদ্ধে হারিয়েছিলাম, সে যে আমাদের হাতে একদম গোলাম বনে গিয়েছিল।

এই প্রাসাদেরই অন্য এক ঘরে আছে রছুলুল্লা ছাল্লাল্লাহু আলাইহেচ্ছালামের একটি জামা, একটি দাঁত, এক গাছি দাড়ি ও একটি পত্র। অনুমতি ছাড়া এইগুলি কাউকে দেখান হয় না। আমরা বিশেষ অনুমতি নিয়েই দেখতে পেলাম ঃ কিন্তু সুবিধা হল না। জামা, দাঁত ও দাড়ি সোনার বাক্সে সোনার কাপড়ের বিশ পল্লায় ঢাকা, কেবল তাই দেখলাম, খুলে দেখানর নিয়ম নাই। কারণ নাড়া চাড়ায় ভেঙ্গে যেতে পারে। চিঠিও সোনার বাক্সে রক্ষিত। কিন্তু খুলতে গিয়ে দেখা গেল, তালা নষ্ট হয়ে আছে, কাজেই খোলা গেল না।

এক জায়গায় দোভাষী দেখালেন সোনার তৈয়ারী একটি হাত—কনুই হতে আঙ্গুল পর্যন্ত। হাতের পাতার কাছে সোনার পাতের একটু ফাঁক, সেই ফাঁক দিয়ে শুকনা হাড়ের মত কিছু দেখা যায়। দোভাষী বল্লেন—এটা "জন দি ব্যাপটিষ্টের হাত," খৃষ্টানদের মতে ইনি হজরত ইছার ওস্তাদস্থানীয় ছিলেন। লোকে তাঁকে হত্যা করে। তাঁর হাতটি

জেরুজালেমে খৃষ্টানদের কাছে সুরক্ষিত ছিল। বিজয়ী তুর্ক সুলতান তা এনে এখানে রেখেছেন।

তার পর গেলাম হস্তাক্ষর বিভাগে। আরবী ফারছী বহু-বহু কেতাব লতায়, ফুলে, পল্লবে সাজানো—কোথাও বা হরফের চেহারাতেই বিচিত্র আর্ট ফুটে উঠেছে। প্রাণীর ছবি আঁকায় ইছলামের অনুমোদন না থাকায় লেখকের আর্টিষ্ট মন তার সমস্ত দরদ ঢেলে দিয়েছে হরফের সৌন্দর্য-বিধানে, লতাপাতায়, ফুলের পরিবেশে কোরান-হাদিছ, কাব্য-কবিতাকে অনুপম সৌন্দর্যে ফুটিয়ে তোলায়। সুলতানেরা নিজেরাও এই হস্তাক্ষর শিল্পের অনুশীলন করতেন। তাঁদের লেখা বইও আছে। এইসব দেখাতে দেখাতে আমাদের দোভাষী সহসা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন, দেখুন দেখুন হাফিজ ওছমানের লেখা দেখুন, আর এই হল মুস্তফা ইজ্জতের লেখা। আহা! এমন আর কখনও হয় নাই আর কখনো হবে না। আমি আস্তে বল্লাম, “কিন্তু দোস্ত, রোমান হরফে যে দেশ ভেসে গেল, এর পর এই আরবী লেখার কদর করবে কে?” লোকটির মনে আঘাত বাজল। একটু ঢোক গিলে বল্লেন, “কথাটা আংশিক সত্য। এ লেখার সমজদারের সংখ্যা কমবে। ইতিমধ্যেই খানিকটা কমে গেছে; কিন্তু এই যে রত্ন, এর সমজদার, এর ভক্ত থাকবেই—সংখ্যা তাদের যত কমই হোক।”

সেকালের সুলতানদের দেখা-সাক্ষাৎ ঘরে গেলাম। বাইরে এক মস্ত কামরা। বিদেশী দূত বা অন্য কোন রাজপ্রতিনিধি এলে আগে এত্তেলা হত। সুলতান তাদের কথা শুনতে রাজী আছেন, এমন হুকুম পেলে তবে তাঁরা এসে ঐ বাইরের ঘরে বসতেন। তারপর একে একে তাঁদের অন্য ঘরে নেওয়া হত। এইখানে তাঁরা সুলতানের উজীরনাজিরের সাথে কথা বলতেন। সুলতান বসতেন সংলগ্ন উঁচু একটি ঘরে—জানালার পাশে। তিনি সেখানে বসে আলোচনা শুনতেন, আলোচনায় যোগ দিতেন না; বিশেষ অনুগ্রহ না হলে দূতকে দেখাও দিতেন না। আলোচনার

অন্তে দূত বাইরে চলে যেতেন। খলীফা যদি দূতের আবেদন গ্রহণ করতেন, তবে তাঁর হুকুম বা সম্মতি ফরমানরূপে লেখা হত এবং রূপার সুদৃশ্য আধারে ভরে দূতকে দেওয়া হত। বলা বাহুল্য দূত বহু মূল্যবান নজর পাঠিয়ে তারই সাথে সুলতানকে ছালাম জানাতেন।

নিম্নলিখিত জিনিসগুলি একে একে দেখলাম।

বাবুর্চীখানা বিভাগ—বিরাট বিরাট ডেকচী, বিরাট বিরাট হাতা, বিরাট বিরাট চুলা, পাকশাকের অন্যান্য বিরাট যন্ত্রপাতি, বাবুর্চীখানায় বাবুর্চীখানার সর্দারের একটি মূর্ত্তি এখনো দাঁড়িয়ে আছে। কদে, পোষাকে-পরিচ্ছদে, গোঁফের ধমকে তাকে বাবুর্চীখানার সর্দার না বলে কুবলাই খাঁর কুটুম্ব কিম্বা জান্নিছারী সৈন্যদের অধিনায়ক ভাবলে একটুও ভুল হবে না। আর অমন হবেই না বা কেন? সত্যিই তো খলীফার বাবুর্চীখানার সর্দারের দায়িত্ব কিছু সহজ ছিল না। সেই ঘরোয়া হানাহানির যুগে খলীফা ও তাঁর ঘরের শাহজাদা-শাহজাদীদের জীবন-মরণের অনেকখানি তার উপর নির্ভর করত।

সিংহাসন কক্ষ বিজয়ী মুহম্মদের সময়ে তৈরী—তারপর অনেক পরিবর্তিত—এক্ষণে তুর্ক স্থাপত্য শিল্পের সুন্দরতম নমুনা—এইখানে তুর্ক সুলতানেরা দরখাস্ত গ্রহণ করতেন। এই কক্ষের বাইরে ১৮০৮ সালে তৃতীয় ছলিমকে হত্যা করে তাঁর পতাকাবাহী বীর মুস্তাফা পাশাকে বলা হয়, এই নাও তার লাশ, যাকে তুমি আবার সিংহাসনে বসাতে চেয়েছিলে।

সুলতান তৃতীয় আহমদের লাইব্রেরী—সুন্দর ছোট দালান, ১৭১৯ সালে তৈরী—বহু অমূল্য গ্রীক ও আরবী পাণ্ডুলিপির সমাবেশ—বিজয় অভিযান কালে সংগৃহীত—এখন অনেক য়ুরোপীয় গবেষকরা এখানে এসে অধ্যয়ন করে থাকেন।

ছবিঘর ঃ ফরাসী, স্পেনীয় ও ইটালীয় চিত্রণ-আদর্শে অঙ্কিত বহু

তৈলচিত্র ও সাধারণ চিত্রের সমাবেশ। তুর্কী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান ওছমানের ছবি এখানে আছে।

অভ্যর্থনা কক্ষ ঃ সুলতান তৃতীয় আহমদ নির্মাণ করেন—বহু বড় বড় ঘটনার সূত্রপাত এই ঘরে হয়—১৭১০ সালে এই কক্ষে সমর সভা বসিয়ে তাতে পিটার দি গ্রেটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা স্থির হয়।

হারেম—মহিলা মহল। বিজয়ী মুহম্মদের তৈরী—পরে বহুগুণে পরিবর্দ্ধিত—১৫শ হতে ১৯শ শতাব্দী পর্যন্ত তুর্ক স্থাপত্য বিজ্ঞানের বিস্তারের বিভিন্ন স্তরের বিকাশ এই মহলে রূপলাভ করেছে। এককালে দুনিয়ার সেরা সুন্দরীদের কলহাস্যে যে অংগন মুখরিত থাকত, রূপ ঝলমল শাহজাদীদের চটুল পদক্ষেপের বিচিত্র ছন্দে যে আঙ্গিনা অনুক্ষণ লীলায়িত হয়ে উঠত, আজ সে মহল সম্পূর্ণ নীরব—সমাধির চেয়েও বুঝি বেশী!

সামরিক লাইব্রেরী ঃ এতে যে সব বই ও পাণ্ডুলিপি আছে, তা তিনভাগে বিভক্ত—(ক) হাতীয়ার বিষয়ক গ্রন্থ, (খ) কেল্লা সংক্রান্ত দলীল দস্তাবেজ, (গ) রাজপ্রাসাদ, ফোয়ারা এবং পানি সরবরাহ সংক্রান্ত দলীল দস্তাবেজ।

গদীকক্ষ ঃ এই দালান আগে প্রাসাদের আস্তাবল ছিল। এখন রক্ষিত আছে সুলতান তৃতীয় আহমদ হতে সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ পর্যন্ত সময়ে তুরস্কের যত রকম ঘোড়ার গদী, রেকাব ও গাড়ী ব্যবহৃত হয়েছে, তার নমুনা।

সুলতান তৃতীয় আহমদ অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করতেন। তাঁর আমলে এ প্রাসাদের বাগানগুলি সবচেয়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। তিনি নিজে ফুলের চাষে সর্বপ্রকার সাহায্য করেন। তিনি ফুলের জন্য আলাদা একটি দফতর সৃষ্টি করেন এবং ঐ দফতরের চার্জে একজন ফুলের উজীর মোতায়েন করেন। সুলতান একাধারে কবি ও চিত্রকর ছিলেন। নাদীম ছিলেন তাঁরই সভাকবি। নাদীমের কতকগুলি কবিতা আজো

তুর্ক সাহিত্যে অতুল্য হয়ে আছে। সুলতানের একটি সুন্দর বজরা ছিল —সোনার বৈঠা, রূপার হাল, হাতীর দাঁতের পাটাতন। অনেক সময় সুলতান সেই বিচিত্র বজরায় বসফরাস ভ্রমণে বের হতেন। বসফরাসের তরঙ্গের তালে তালে বজরা নেচে চলত—নাদীম সুলতানের সামনে বসে নব রচিত কোন কবিতা আবৃত্তি করতেন—সুলতান তাঁর সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসে তন্ময় হয়ে শুনতেন আর তছবী জপ করতেন। সন্ধ্যায় আলোয় আলোয় রাজপ্রাসাদ পরীপুরীর মত ঝলমল করে উঠত। বজরা প্রাসাদ পানে ফিরে চলত—সুলতান এক মায়াপুরী হতে অন্য মায়াপুরীতে প্রবেশ করতেন। আজ সে প্রাসাদ পরিত্যক্ত, নির্জন, নিরানন্দ! ওমর খাইয়ামের কথা মনে পড়ে—

জমশেদের সে সুরায় পেছল
খাস দালানের খিলান মাঝ—
আজকে তথায় বাসা বেঁধেছে
চামচিকা আর সিংহরাজ।
রাজার সেরা রাজশিকারী
বাহরাম যেথা ঘুমিয়ে রয়—
আজকে তথায় চাট মেরে যায়
টিকটিকি আর বন্য হয়!

তোপকাপী প্রাসাদ হতে গেলাম আয়াছুফীয়া দেখতে। আজ হতে ১৫শ বছর আগে সম্রাট জাষ্টিনিয়ান সেন্টাছুফীয়া নামে এই বিরাট সুন্দর গির্জা নির্মাণ করেন। তাঁর হুকুম ছিল, “আমার এ বিরাট সাম্রাজ্যের যেখানে যে সুন্দর মন্দির কিম্বা গির্জা আছে, দরকার মত তা ভেঙ্গে এনে এই নতুন গির্জা তৈয়ার কর।” সম্রাটের আদেশ পালিত হয়েছিল। শোনা যায়, গির্জা নির্মাণ শেষ হলে সম্রাট যখন দেখতে আসেন, তখন তিনি গির্জার দুয়ারে দাঁড়িয়ে ভিতরের সৌন্দর্য ও বিরাটত্বে এমন মুগ্ধ হয়ে পড়েন যে, তিনি অপার আনন্দে আত্ম-সংবরণ

করতে না পেরে দৌড়ে গিয়ে পুরোহিতের আসনে দাঁড়ান ও দুইহাত উপরে তুলে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে ওঠেন—"পেরেছি, প্রভু আমি পেরেছি, আমি সম্রাট ছোলায়মানের ধর্মমন্দিরকে হার মানাতে পেরেছি!" হজরত ছোলায়মানের ধর্মমন্দির কেমন ছিল, তার কোন বিবরণ পড়ি নাই, তবে সে আমলের গির্জা হিসাবে যে সেন্টাছুফীয়া অতুলনীয় হয়ে আছে, একথা অনেকে স্বীকার করেন। এত বড় গির্জার ভিতরে মর্মরপাথরে এত সূক্ষ্ম কাজ, সমগ্র গির্জার দুয়ারে, ছাদে, স্তম্ভে বাইবেলের ঘটনা নিয়ে নানা চিত্র—১৫শ বছর পর আজো তেমনি আছে। ১৪৫৩ সালে তুর্ক সুলতান দ্বিতীয় মুহম্মদ ইস্তাম্বুল দখল করেন এবং বাইবেলীয় চিত্রগুলির উপর সাদা চূণ লেপে ও ভিতরে ইমামের জন্য স্থান করে একে আয়াছুফীয়া নামে মছজিদে পরিণত করেন। মোস্তাফা কামাল পাশা ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পর আইনজারী করে বলেন—"সেন্টাছুফীয়ার স্মৃতি সমস্ত খৃষ্টান জগতের বুকে কাঁটার মত বিঁধে আছে, আর সেইজন্য সমগ্র তুর্কজাতির প্রতি তাঁরা বিদ্বেষপরায়ণ। আমি এ কাঁটা থাকতে দিব না। এখন হতে আয়াছুফীয়াতে মুছলমানেরা আর নামাজ পড়বে না, খৃষ্টানরাও একে গির্জা হিসাবে ব্যবহার করবে না—সমগ্র জগতের যে কেউ এসে একে যাদুঘর হিসাবে দেখে যেতে পারে।"

তা-ই হয়েছে। আমেরিকার অধ্যাপক হুইটমোরের যত্নে চূণের পোঁছ ঘসে তুলে ফেলায় বাইবেলীয় চিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। হুইটমোর এমনও বলেছেন যে, ছবিগুলির উপর চূণের পোঁছ ছিল বলেই ওগুলি অত ভালভাবে রক্ষিত হয়েছে। আল্লাহ্-রছুলের নামের বড় বড় প্লেট স্তম্ভের গায় যেখানে যা জুড়ে দেওয়া হয়েছিল, তা তেমনি আছে। ইমামের জায়গার কাছাকাছি খানিকটা জায়গায় নামাজের মছল্লা এখনো বিছানো আছে—পুরু মূল্যবান গালিচা। সাধারণ দর্শকেরা অনায়াসে তার উপর দিয়ে জুতা পায়ে হেটে যায়; আমাদের দোভাষী সেইখানে

গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন—জুতা পায়ে মছল্লার উপর গেলেন না—আমরা তো আগেই থমকে দাঁড়িয়েছিলাম।

দর্শকেরা আয়াছুফীয়ার মছজিদে জুতা নিয়ে ঢুকছে দেখে বুকে বড় বাজল। আমাদের সঙ্গে মওলানা আবুবকর আরবী ছিলেন; তিনি বল্লেন—এ তোমার নিছক ভাবালুতা নয় তো? জেরুজালেমের গির্জার অধিপতি হজরত ওমরকে ঠেকা পদে গির্জায় এক ওয়াক্ত নামাজ পড়তে অনুরোধ করলেন; হজরত ওমর সে অনুরোধ রাখলেন না; স্পষ্টই বললেন—আজ আমি এখানে নামাজ পড়লে একে নজীর ধরে পরবর্তী কালের মুছলমানরা গির্জাকে মছজিদে পরিণত করতে পারে। আমরা পরম গৌরবের সঙ্গে হজরত ওমরের এ মহানুভবতার কথা সঙ্গতভাবেই অমুছলমানদের কাছে বলে বেড়াই। তারপর সেন্টাছুফীয়াকে আয়াছুফীয়া করার পক্ষে আরতো কোন যুক্তি থাকে না। বিজয়ী মুহম্মদ গির্জাকে মছজিদে পরিণত করে সুবুদ্ধিরও পরিচয় দেন নাই, সু-আদর্শও স্থাপন করেন নাই—এ কথা স্বীকার করতেই হয়। আততুর্ক একে মিউজিয়ামে পরিণত করে এক হিসাবে প্রকারান্তরে হজরত ওমরের আদর্শেরই মর্যাদা রক্ষা করেছেন। অবশ্য মিউজিয়াম করার পরও কোন-এক-কালের ধর্মস্থান হিসাবে এর ভিতরে যাওয়া কালে জুতা ছেড়ে যাওয়ার নিয়ম করাই সমীণচীন ছিল; জুতা নিয়ে ভিতরে যাওয়ার অনুমতিতে অন্যদিকে আতাতুর্কের তরফে বাড়াবাড়ি হয়েছে।

আয়াছুফীয়ার পর ইস্তাম্বুলে যত মছজিদ দেখলাম, মনে হল তার অধিকাংশই আয়াছুফীয়ার স্থাপত্য আদর্শে বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছে। কায়রোতে মোহাম্মদ আলী পাশা যে বিরাট মছজিদ তৈরী করেছেন তারও উপর আয়াছুফীয়ার ছায়া সুস্পষ্ট।

এরপর দেখতে গেলাম সুলতান আহমদের মছজিদ ও সুলতান ছোলায়মানের মছজিদ। প্রত্যেকটিই বিরাট; প্রত্যেকটির দিকেই মৌন বিস্ময়ে চেয়ে থাকতে হয়। অবাক হতে হয় এদের কল্পনার বিরাটত্বের

কথা ভেবে, আর মনে হয়, কি গভীর দরদ দিয়েই না এঁরা এর পেছনে অকাতরে অর্থব্যয় করেছেন! আজকাল ওক্তীয়া নামাজের সময় এসব মসজিদের সিকিও ভরে না, কিন্তু এক সময় তো ছিল যখন মুছল্লীতে এসব গমগম থাকত! জুমার দিন এখনো এ মছজিদগুলি মুছল্লীতে ভরে ওঠে; কিন্তু সে শান-শওকত কোথায়? কোথা সে বিপুল সমারোহ, যার ভিতর দিয়ে সুলতান, সেনাপতি, শাজাদারা নামাজের জন্য এসে হাজির হতেন?

তুর্ক নরনারীরা তাদের এ মছজিদগুলির জন্য যথেষ্ট গৌরব বোধ করে। আমাকে অন্ততঃ চারজনে জিজ্ঞাসা করেছে—ইস্তাম্বুলে তো এলে, কিন্তু ইস্তাম্বুলের মছজিদগুলি দেখেছ তো? আমাদের দোভাষী ছোলায়মান মছজিদে এসে উচ্ছাসিত হয়ে উঠলেন। দেশের এমন ভক্ত সন্তান আমার চোখে বেশী পড়ে নাই। বল্লেন, দেখুন দেখুন—কী সরল সহজ স্বাভাবিক সৌন্দর্যে মণ্ডিত এ বিপুল মছজিদ! সুলতান আহমদের মছজিদ দেখেছেন তো? খুব বিরাট, না? তার গুম্বজও আয়াছুফীয়ার গুম্বজের চেয়ে উঁচু ও বড়, নামও তার নীল মছজিদ—প্রভাত সূর্যের কিরণ তার ২৬০টি নীল জানালার ভিতর দিয়ে গিয়ে সমস্ত মছজিদটাকে নীল মখমলে ঢেকে দেয় কিনা! সে হল অদ্ভুত সূক্ষ্ম কারুকার্যের মছজিদ—আর এ হল অনাড়ম্বর সৌন্দর্যের মছজিদ—এ তুর্ক ঐশ্বর্য-মহিমার এক বিস্ময়কর অভিব্যক্তি। এ মছজিদ তৈরীর ইতিহাস জানেন কি? জানেন না? আচ্ছা তবে শুনুনঃ আমাদের মহান সুলতান ছোলায়মান যখন ভিয়েনা-অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে দেশে ফিরলেন, তখন তিনি ঘোষণা করলেন—"আমার জীবন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে; ওপারে যাওয়ার আগে আমি একটি বিরাট, সুন্দর মছজিদ করতে চাই—খুব জলদি—কে আছ ওস্তাদ, দরখাস্ত কর।" সাতদিন যায়, কেউ দরখাস্ত করে না—করতে সাহস পায় না। মহান ছোলায়মানের মছজিদ! ওরে বাপরে! অবশেষে ওস্তাদ ছীনান এসে বল্লেন—

জাহাঁপনার মছজিদ আমি করে দিব। সুলতান বল্লেন—উত্তম, শুরু কর। টাকা আমি দিব, যত চাও ততই দিব; কিন্তু আমার মছজিদকে করতে হবে বিরাট, মজবুত, সুন্দর। কাজ শুরু হল। সে ১৫৪৯ সাল। এক বছর গেল কেবল মছজিদের ভিত গাঁথতে। ভিত শেষ হওয়ার পর হঠাৎ ছীনান পালিয়ে গেল। সকলেই বুঝল, ছীনান—এমন কি ওস্তাদ ছীনানও খলীফার কাজের বিরাটত্ব দেখে হার মেনে পালিয়ে গেল। সুলতান বল্লেন—এস, যে পার বাকী কাজ শেষ কর। কিন্তু ছীনানের ভিতের উপর মছজিদ গাঁথতে আসবে এত বড় কল্‌জার জোর কার? সুলতান ক্ষেপে গেলেন, হুকুম দিলেন—যেখানে পাও ছীনানকে ধরে আন—আমি তাকে চাই—জীবিত আনতে যদি না পার, তবে তার কাল্লা নিয়ে আসবে—তাকেই আমি জিজ্ঞাসা করব, কেন এমন করে আমার কাজ ফেলে গেল? খোঁজ—খোঁজ—খোঁজ —রাজ্যময় সাড়া পড়ে গেল; কিন্তু ছীনানকে পাওয়া গেল না। সুলতান ক্ষুণ্ণ মনে দিন কাটাতে লাগলেন। পাঁচ বছর পর হঠাৎ ছীনান এসে হাজির। সুলতানকে ছালাম জানিয়ে বল্ল—'আমার ভিত পোখত হয়েছে জাহাঁপনা। এখন আমি বাকি কাজ শুরু করব। কাছে থাকলেই জাহাঁপনা জলদী করতে বলবেন বলে এতদিন পালিয়ে ছিলাম। এখন এই পাকা ভিতের উপর যে মছজিদ গড়ে তুলব, আল্লার মরজী, কোন ভূমিকম্প তার কাছ দিয়েও ঘেঁষবে না।' তা-ই হয়েছে। তুরস্কে এত ভূমিকম্প গেল, কিন্তু এ মছজিদের একটুও কোথাও কিছু করতে পারে নাই। এই মছজিদের অন্য বৈশিষ্ট্য কি জানেন? ইমাম যে কথা বলেন, এ বিরাট মছজিদের কোণে কোণে তা মুছল্লীরা শুনতে পায়,—কোন গমগমী নাই। ঐ যে আটটি অপূর্ব সুন্দর ফুল-তোলা জানালা দেখছেন, ওগুলি করেছেন ওস্তাদ তারিফ। তারিফ মদের দোকানে থাকত, আর সর্বক্ষণ মদ খেত। কিন্তু লোকটা ছিল আদতে গুণী। বলত, একমাত্র সুলতান ছাড়া তারিফকে চিনবার মত তো আর কাউকে দেখি না। কথা সুলতানের কানে গেল।

তিনি ডাকলেন। সে মদের বোতল ছেড়ে সেই যে তুলি হাতে নিল, জীবনে আর কখনো মদের বোতলের দিকে হাত বাড়াল না। দরবেশের মত ধ্যানমগ্ন হয়ে সে জানালার কাজে লেগে রইল। যেদিন তার জানালা আঁকা শেষ হল, সেই দিনই তার দুয়ারে এসে হাজির হল আজরাইল—বল্ল, এই জানালার কাজ শেষ হয় না বলেই তো এত দিন দেরী করে এলাম। ঐ যে মছজিদের গায় সুন্দর তোগরায় কোরাণ মজীদ লেখা—ও হল ওস্তাদ রফীকের লেখা। আহা! লেখতে লেখতে বেচারা অন্ধ হয়ে গেল; তাই শেষ অংশটুকু লিখেছে তার এক শাগ্‌রিদ—তারই নির্দেশ মোতাবেক। আর এ মছজিদের দ্বারোদঘাটন দিনে কি কাণ্ড হল শুনবেন? সোনার তালায় দরজা বন্ধ। উজীর কুর্নীশ করে বল্লেন—জাহাঁপনা, দুয়ার খুলতে মরজী হয়। সেদিন ইস্তাম্বুল শহর ভেঙ্গে পড়েছে মছজিদের সামনে—এই উৎসবে যোগ দিতে। সকলে নিশ্বাস রোধ করে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুলতানের কথা শুনতে। মাথার একটি চুল খসে পড়লেও কানে বাজবে এমন গভীর নিস্তব্ধতা। সেই বিপুল জনতার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে ছোলায়মান তাঁর হাতের চাবি ছীনানের হাতে দিয়ে বল্লেন,—দোস্ত, এ দুয়ার খোলার অধিকার তোমার। আমি এ যাবত খুলে দিয়েছি শুধু রাজকোষের তালা, তুমি ঢেলে দিয়েছ তোমার অতন্দ্র রজনীর ধেয়ানের ধারা। সমগ্র জনতা উন্মত্ত কলরোলে জয়ধ্বনি করে উঠল—'জিন্দা রহো আমাদের অতুল্য ওস্তাদ, জিন্দা রহো আমাদের মহান সুলতান।'

দোভাষীর গলায় কাঁপুনি—তাঁর চোখে ঝলমল আলো, তাঁর বুকে গর্বের স্ফীতি।

দিন শেষ হয়ে এল। দোভাষী আফছোছের সুরে বল্লেন, একদিনে কি দেখাব? একটা মাস হলে আমাদের কিছু দেখাতে পারতাম। দেখাতে পারতাম আমাদের প্রত্নতত্ব মিউজিয়াম, চিত্রশিল্প মিউজিয়াম, ভাস্কর্য্য-শিল্পের মিউজিয়াম, ইস্তাম্বুল মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়াম, নৌ-বাহিনীর

মিউজিয়াম, মিলিটারী মিউজিয়াম, স্থাপত্যশিল্পের মিউজিয়াম, আতাতুর্ক মিউজিয়াম, নব্য সাহিত্য মিউজিয়াম। কিন্তু মিউজিয়ামই তো আমাদের সব নয়; আমরা জ্যান্ত জাতি—আমাদের বর্তমানের দু-একটি পাতাও খুলে ধরতে পারতাম। কিন্তু বন্ধুগণ, বেলা যে গেল!

তোপকাপী প্রাসাদের পর ইস্তাম্বুলে যে কয়টি সুলতানী প্রাসাদ তৈরী হয়েছে, তার মধ্যে দেখলাম বেলার-বে প্রাসাদ, দোলমা বাগচা প্রাসাদ আর ইলদীজ প্রাসাদ। এসব প্রাসাদ এখন তুর্ক রিপাবলিকের সম্পত্তি—অনেকটা মিউজিয়ামের মত। কোন কোনটির দশ বিশটা কামরায় হয়তো অফিস চলে। এককালে যারা এসব প্রাসাদে অপরিমেয় ঐশ্বর্য, অপরিমেয় বিলাস, অপরিমেয় পরাক্রম প্রভুত্বে ডুবে থাকতেন আজ তাঁদের বংশধরেরা তুরস্ক হতে নির্বাসিত—দুনিয়ার কোন্ অজ্ঞাত কোণে তারা কি করে দিন গুজরান করছে, তুরস্কের কেউ তার খবর রাখা দরকার মনে করে না। ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলাম—শেষ সুলতানের বংশধরেরা এখন কোথায় কি করে খায়, জান? পরম উদাসীন ভাবে উত্তর দিল—না, তা জানি না। তবে দুনিয়ার এত মানুষ যেমন খেটে খাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে, তারাও নিশ্চয় তেমনি কোন সুযোগ পেয়ে কোথায়ও খেটে খাচ্ছে।

এমনি হয়। তুরস্কের সুলতানেরা যতদিন তলোয়ার হাতে লড়াইর ময়দানে ঝাপিয়ে পড়েছেন, দরবারে বসে হক বিচার করেছেন, ততদিন দুনিয়ার দিকে দিকে তাঁদের বিজয় বৈজয়ন্তী উড়েছে, আর তুরস্কের জনগণ তাঁদের আঙগুলের ইশারায় উঠেছে, বসেছে, মরেছে। তারপর কুক্ষণে সুলতানদের কাছে বিচারের দরবার আর লড়াইর ময়দানের চেয়ে প্রমোদ মজলিস ও হারেম-অঙগন হয়ে পড়ল অধিকতর প্রিয়। দেশের পর দেশ সাম্রাজ্য হতে খসে পড়তে লাগল, কিন্তু সুলতানদের চোখ খুল্লনা। দেশের লোক হয়রান হয়ে পড়ল; বল্ল—জাহাঁপনা, আর তো চলে না, এবার রাজ্যের দিকে একটু মন দিন। অনুমতি দিন, আমরা

সহযোগিতা করি। সুলতানেরা ভুল বুঝলেন আর শুরু করলেন এদের পীড়ন। সহনসীমার শেষ রেখা যখন অতিক্রম করে গেল তখন তারা রুখে দাঁড়াল, বল্ল—জাহাঁপনার দল অক্ষমতার চূড়ান্ত প্রমাণ দিয়েছ—দেশ নিয়েও অনেকদিন ছিনিমিনি খেলেছ—আর না, এইবার সরে দাঁড়াও—দেশের ভার আমরা দেশবাসীরা নিচ্ছি। এর ফলে তুরস্কে প্রতিষ্ঠিত হল রিপাবলিক।

কিন্তু প্রাসাদ ছেড়ে আমরা প্রাসাদবাসীদের কথাই বেশী ভাবছি। এবার প্রাসাদে ফিরে আসি। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয়—এক একটি প্রাসাদের আঙিনা বিরাট, ইমরাত বিরাট, আছবাবপত্র অসংখ্য, অপূর্ব, অমূল্য। বিভিন্ন দেশের ডেলিগেট যাঁরা দেখলেন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা কিছু বল্লেন, তাঁরা এই-ই বল্লেন—এমন আর কোথাও দেখি নাই।

প্রথমে আমরা বেলার-বে প্রাসাদ দেখতে গেলাম। বসফরাসের পারে এশিয়া খন্ডে এই শ্বেতমহল অবস্থিত। সুলতান আবদুল আজীজ ১৮৬৫ সালে এই প্রাসাদ নির্মাণ করেন। ১৮৬৯ ফরাসীদের রাণী ইউজিনী ইস্তাম্বুলে বেড়াতে এসে এই মহলে অবস্থান করেন। সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ সিংহাসনচ্যুত হওয়ার পর এইখানে তাঁর অন্তিম দিনগুলি শান্তিতে অতিবাহিত করেন।

ইলদীজ প্রাসাদে আমাদের আন্তঃপার্লামেন্টারী কনফারেন্সের অধিবেশন হচ্ছিল। কাজেই সাত দিন ভরেই তার কিছু কিছু দেখার, এখানে সেখানে বসার সুযোগ হয়েছিল। একটি ছোট পাহাড়ের উপর এই প্রাসাদ অবস্থিত। প্রথমে ১৮৫০ সালে এখানে একটি ছোট্ট ইমারত নির্মিত হয়। পরে সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ একে বাগবাগিচা শোভিত এক বিরাট সুন্দর প্রাসাদে পরিণত করেন। প্রধান প্রাসাদের চারিদিকে এক মস্ত উঁচু পাথরের দেয়াল। ফুল, ফল, পাতা ও পাইন গাছের দিকে যতবার তাকিয়েছি, চোখ ফিরাতে ইচ্ছা হয় নাই। প্রজারা কবে বা বিদ্রোহী হয়ে তাঁকে গদীচ্যুত করে এই আশঙ্কায় সন্দিগ্ধ

সুলতান বহু বৎসর পর্যন্ত এখানে একান্ত কড়া পাহারার মধ্যে বাস করেন। দোলমা বাগচা প্রাসাদই সবচেয়ে বড় ও সুন্দর। তুর্ক রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট একদিন আমাদেরকে সেখানে এক ভোজে দাওয়াত করলেন। আমাদের ছাড়া আরো শ'পাঁচেক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা দাওয়াতে হাজির ছিলেন।

বসফরাসের য়ুরোপীয় তীরে এই প্রাসাদ। সুলতান প্রথম আহমদ এখানে একটি ছোট্ট ইমারত করেন। ১৮৫৩ সালে সুলতান আবদুল মজিদ বর্তমান প্রাসাদ তৈয়ার করেন। প্রাসাদে প্রায় ৩০০ কামরা, ভিতরে আছবাবপত্র ছোট্ট বড় মিলে সংখ্যায় ৩০ হাজার। হল কামরায় একটি বিরাট কাচের ঝার—তার ওজন ৯৮ মন। দেশ-বিদেশে যাঁরা ঘুরেছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন মন্তব্য করলেন—এতবড় ঝার তো আর কোথাও দেখি নাই। প্রাসাদের আছবাবপত্র তৈরী করার জন্য সুলতান ফ্রান্স ও ইটালী হতে সর্বশ্রেষ্ঠ কারিগর মোতায়েন করেন; দেশের যারা আলা দরজার কারিগর, তারাও কাজ করে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রীতির এমন অপূর্ব সংমিশ্রণ আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ, অন্ততঃ তুরস্কে তো নাই।

আশ্চর্যের কথা এই যে, প্রত্যেক কামরার দেওয়াল ও ছাদের কাজ আলাদা, তার আছবাবপত্রের ষ্টাইল এবং গোছানীও আলাদা—তার গালিচা, তার কুরছী, তার আয়না, তার আলনা, তার ফুলদানী, তার আলমারী, তার পরদা—সবই স্বতন্ত্র। বারো আনা কি চৌদ্দ আনা আছবাবপত্রেই সোনালী কাজ। আয়না, ছবি, ঝার আর ফুলের টবের আকার, শিল্প নৈপুণ্য ও বৈচিত্র দেখে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। একটি প্রাসাদের জন্য এত অধিক অর্থব্যয় দুনিয়ার আর কোথাও নাকি হয় নাই। সেদিন যাঁরা দাওয়াতে এসেছিলেন তাঁরা খেলেন যত, দেখলেন তার চেয়ে অনেক বেশী। আসলে এ ছিল তাঁদের চোখের ভোজ। এক এক কামরায় ঢুকি আর দেখি, হয়তো দুটি দাওয়াতী মহিলা শাহী চেয়ারে বসে আছেন---।

আমাদের দেখে অজ্ঞাতসারে দাঁড়িয়ে পড়েন; তাঁদের মনের কোণে যেন জেগে উঠে, "সুলতান, বেগমরা যে আসনে বসতেন সেইখানে-----!" কোন কামরায় উঁকি দিতেই দেখি, একটি তরুণী এদিক ওদিক দেখে একটি ভাল কুরছিতে বসতে যাচ্ছেন—অমনি ফিরে আসি। তরুণীর সাথে বর্ষীয়সী যাঁরা আছেন, তাঁরা দাঁড়িয়ে থাকেন, বসেন না, তাঁদের সংস্কারে বাঁধে। হয়তো তাঁরা তাঁদের তরুণ বয়সে সুলতানদের হাশমত দরদবায়ী কিছু দেখেছেন; হয়ত দেখেছেন যে, সুলতান ইস্তাম্বুলের পথে বের হলেও তাঁর পাশে চলেছে দুই হাজার নাঙা তলোয়ারধারী ঘোড়ছওয়ার আর তাঁর পেছনেও চলছে অমনি আর দুই হাজার ঘোড়ছওয়ার। হাজার হলেও সেই সুলতানের বসবার কুরছী তো!

দর্শকদের মধ্যে কেউ একা, কেউ কেউ বা সস্ত্রীক সুলতানী চেয়ারে বসে ফটো নিলেন। বুঝলাম, আবু হোসেন কেবল হারুনর রশীদের আমলে ছিল না, এখনো আছে। ঘুরে দেখতে দেখতে কেবল আমার পা দুটিই যে কাতর আবেদন জানাতে লাগল, এমন নয়, সীমাহীন প্রাচুর্যের পীড়নে আমার মনও হাঁপিয়ে উঠল। ইরাকের একজন ডেলিগেটকে জিজ্ঞাসা করলাম "কেমন দেখছেন?" ভদ্রলোক ক্ষেপে উঠলেন; বল্লেন—"আমাদের দেশের সমস্ত ধনরত্ন লুটে এনে তাই দিয়ে এরা এই নয়া বেহেস্ত তৈরী করেছিল।" একজন ইংরেজ ডেলিগেটকে জিজ্ঞাসা করলাম; বল্লেন, "প্রজার টাকায় নির্বিচারে এই বিলাসের আয়োজন করেছেন বলেই তো এঁরা প্রজার জন্য কিছু করতে পারেন নাই।" সিরিয়ার একজন ডেলিগেটকে জিজ্ঞাসা করলাম; বল্লেন,—"এই যে প্রাসাদের পর প্রাসাদ আর মছজিদের পর মছজিদ, এদের পেছনে যে ঐশ্বর্য এঁরা ঢেলেছেন, তার সিকি কেন দুই আনা পরিমাণ অর্থও কি তাঁরা কোন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ব্যয় করেছেন?" নরওয়ের একজন সভ্যকে ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করলাম, বল্লেন,—"আলেফ লায়লাতে যাদের নাম নাই, এ প্রাসাদে তাও দেখলাম।"

১৯৩৮ সালের ১০ই অক্টোবর দোলমা বাগচায় আতাতুর্ক তাঁর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। বিদেশী রাজা বাদশাদের মধ্যে এ প্রাসাদে বিভিন্ন সময়ে বাস করেছেন—রাজা আমানুল্লা খাঁ, রেজা শা পাহলুভী, ইরাকরাজ ফয়ছল, জর্দনরাজ আবদুল্লা, জুগুশ্লোভীয়ারাজ আলেকজান্দার, রুমানিয়ারাজ ক্যারেল, ইংল্যান্ডরাজ অষ্টম এডওয়ার্ড।

ইস্তাম্বুল ধনী শহর। লোক সংখ্যা ১১ লাখ। বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার প্রণালী য়ুরোপীয় ছাঁচে ঢালা। শহরে খানাপিনার ব্যাপারেও সেই প্রভাব সক্রিয়। তুর্করা অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ, আমাদের পাকিস্তান দূতাবাসের সকলেই এই সাক্ষ্য দিচ্ছিলেন। বলছিলেন—সমস্ত জাতটা যেন ড্রিল করা। ছোট্ট চাকর—তাকে ঘরের পাহারায় রেখে বাইরে গেলাম, তিন ঘন্টা পরে এসেও দেখি, সে ঠিক স্বস্থানে বা-কায়দা দাঁড়িয়ে আছে। বসে নাই, খেলতে যায় নাই, এমন কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখও বোজে নাই। তুরস্কে মিলিটারী ট্রেনিং কিছুদিনের জন্য সমস্ত যুবকের জন্যই বাধ্যকরী। এই ট্রেনিংকে তারা জুলুম মনে করে না, মস্ত ইজ্জত মনে করে। কিছুদিন আগে আঙ্কারা পার্লামেন্টে বিতর্ক উপলক্ষে এক মেম্বর অন্য মেম্বর সম্পর্কে মন্তব্য করেন—উনি এপর্যন্ত মিলিটারী ট্রেনিং উপলক্ষে একটি হফতাও ক্যাম্পে কাটান নাই—আর উনিই আসেন আমার সাথে যুঝতে! চাকর-চাকরাণীর বেতন বেশী। সাধারণতঃ মাসিক ৭০ টাকার কমে একজন চাকরাণী পাওয়া মুশকিল। কিন্তু কি অদ্ভুত পরিশ্রমী এরা—এদেরে বেশী মায়না দিলাম বলে মনে কোন আফছোছ হয় না। এদের একজন চাকরাণী বাঙ্গালী তিন জন চাকরাণীর সমান কাজ করে—বিনা তাকাদায়। তার উপর তাদের সততা চমৎকার। মেঝের উপর দিনের পর দিন টাকা-পয়সা পড়ে আছে, তার একটি পয়সাও কখনো হারায় না। দূতাবাসের বন্ধুরা আরো বল্লেন—তুর্কদের দেশ-প্রীতি আমাদের অনুকরণীয়। এ সাক্ষ্যটি আমি অন্যসূত্র হতেও এর আগে

পেয়েছি। পোলেন্ডের দুইজন এয়ার-স্কাউট ট্রেনার গত বছর পূর্ব বাংলা হতে এয়ার-স্কাউট নিয়ে করাচী আসেন। তাঁদের সাথে বিভিন্ন দেশের স্কাউটদের সম্বন্ধে আলাপ করি। তাঁরা উভয়েই বল্লেন, দুনিয়ার সব সভ্যদেশের বিমান ছাত্রদের সাথেই আমাদের পরিচয়ের সুযোগ হয়েছে। আমাদের অভিজ্ঞতায় পূর্ব বাংলার শিক্ষার্থীদের মত মাথা-ওয়ালা আর তুর্কীশিক্ষার্থীদের মত দেশ-প্রাণ তরুণ আর কোথাও দেখি নাই।

আন্তঃপার্লামেন্টারী কনফারেন্সের অধিবেশনে সাহায্য করার জন্য বহু তুর্ক নারী ভলান্টিয়ার ছিলেন—স্কুলের ছাত্রী হতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা পর্যন্ত। এঁদের সৌজন্যময় ব্যবহার, এঁদের কর্তব্যপরায়ণতা, এঁদের কর্মপটুতা সম্বন্ধে সকল দেশের সভ্যরাই মুক্ত কন্ঠে প্রশংসা করলেন।

ইস্তাম্বুল ছেড়ে পার্শ্ববর্তী গাঁয় যাওয়ার সুযোগ আমাদের হয় নাই। শুনলাম, গাঁয়ের লোকের অবস্থা মোটামুটি ভাল। শহরের বাসিন্দাদের সাথেও আমাদের ঘনিষ্ট পরিচয়ের সুযোগ হয়েছে নিতান্ত কম। একটি পরিবারের সঙ্গে হঠাৎ আলাপ হল। পরিবারটির উপাধি হতিনলী। বাপ ডিপ্লোমেটিক চাকরীতে অনেককাল বিলাতে ছিলেন, এখন ইস্তাম্বুলে অবসর ভোগ করছেন। মা বেঁচে আছেন ঃ সে জামানার, কাজেই ময়মজলিসে বিশেষ আসেন না। পরিবারে ৪টি সন্তান ঃ তিনটি মেয়ে—জুলতেকীন, নিস্তারীন, বিহতরীন; একটি ছেলে—মতীন। জুলতেকীন স্কুলে কাজ করেন, নিস্তারীন ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে ল্যাটিন ও ভাষা-বিজ্ঞান পড়ান, বিহতরীন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়ান, আর মতিন বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতির্বিদ্যা পড়েন। বোনেরা কেউ বোরকা পরেন না; ব্যবহার নিতান্ত ভদ্র; যতবার দেখা হল চার ভাই বোন এক-সঙ্গে আছেন—কখনো পাশাপাশি বসে সভার বক্তৃতা শুনছেন, কখনো বা কাছাকাছি দাঁড়িয়ে এক এক জন তাঁর পরিচিতের সাথে অথবা আমাদের

মত অতিথিদের সাথে কথা বলছেন। কাজী নজরুল ইসলামের কয়েকটি কবিতার ইংরেজী অনুবাদ তাঁদের পড়ে শুনালাম। এঁরা বল্লেন—বড় ভাল লাগল—আমাদের দিন, আমরা তুর্কী কাগজে এ নিয়ে আলোচনা করব। নজরুল ইসলামের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁর কবিতার কিছু অনুবাদ তাঁদেরে দিলাম। ভাই বোনের মধ্যে কেবল নিস্তারীনের বিয়ে হয়েছে, বাকীদের বিয়ে এখনো বাকী। নিস্তারীন গবেষণা করে ডক্টর উপাধি লাভ করেছেন, বিহতরীন ও মতিন গবেষণা করছেন, কালে তাঁরাও ডক্টর হবেন।

পাকিস্তানের দূত বশীর আহমদ সাহেবও নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে তুর্কী কাগজে আলোচনা করবেন স্বীকার করেছেন। তাঁকে মাল মসলা দিয়েছি। কায়রো দূত আবাসের পাবলিসিটি অফিসারও আরবী কাগজে ঐরূপ আলোচনা করবেন বলেছেন।

ইস্তাম্বুল পল্লীগীতি সমিতি আমাদের দাওয়াত করলেন। পল্লীগীতির প্রতি আমার বরাবরই একটা অবুঝ ঝোক আছে। দাওয়াতে গেলাম।

রাত দশটা। আকাশময় তারা। বসফরাসের মৃদুল হাওয়া প্রবহমান। মুক্ত থিয়েটার। গ্যালারীতে ৬ হাজার দর্শকের বসার ব্যবস্থা। তারই সামনে তুর্ক পল্লীর গান আর নাচ হবে। গিয়ে দেখি, সব ভর্তি। আমাদের জন্য কিছু আসন রিজার্ভ ছিল, তাই বসতে পেলাম।

প্রথমে শুরু হল ছফেদ মেষের গান, তুরস্কের পল্লীতে মেষ এক মস্ত সম্পদ। কাজেই পল্লীগীতিতে মেষ মশাই (মেশো মশাই নন) তাঁর যথাযোগ্য আসন দখল করে বসে আছেন। প্রাচীন কালের রোমক নারীদের যে পোষাক ছবিতে দেখি, সেই আগুলফ লম্বিত সাদা সুন্দর পোশাক পরে কয়েকটি মহিলা এসে আসরে দাঁড়ালেন; তাঁদের পেছনে দাঁড়ালেন কয়েকজন পুরুষ। তারপর প্রথমে নারী, তারপর পুরুষ পর্যায়ক্রমে গাইতে লাগলেন। আমার পাশে বসা ছিলেন ইংরেজী জানা

এক তুর্কী ভদ্রলোক; তাঁকে জিজ্ঞাসা করে যা বুঝলাম, তাতে গানের মর্ম নিম্ন ধরণের বলে মনে হলঃ

আমার ছফেদ মেষের পাল
আয়, আয়, আয়, আয়,
ঐ যে দেখা যায়
হিমেল পানির লাল।
পানি পিয়ে কি কলজে ঠান্ডা হল?
পাইন ছায়ায় একটু তবে ঘুমো—
তারপর সবে ঘাসের খোঁজে চল—
কচি কিশলয় বসে আছে পথপাশে
তোমাদের তরে নিয়ে তার ঘন চুমো।

গানের শেষে চারিদিক হতে ঘন করতালি ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল।

এরপর শুরু হল কচি ঘাসের গান। আমাদের দেশে ক্ষেতে ধান পাকলে কৃষকের যে আনন্দ, কচি ঘাস দেখে তুর্কপল্লীর মেষ পালকদের সেই আনন্দ। আবার তুর্ক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম। যা বুঝলাম তার মর্মার্থ এই ধরণের—

(১)
কচি ঘাস, কচি ঘাস,
এস তুমি বার মাস।
এস এস ত্বরা ভাই,
তোমারে যে মোরা চাই।

(২)

তব পথ পানে
মেষেরা চাহিয়া থাকে
তোমারে চাহিয়া
উটেরা সঘন ডাকে।

(৩)

বকরী শিশুরা
চটুল চরণ যায়
তব আগমনী
ঐ শোন নেচে গায়।

এ গানের শেষেও বেজে উঠল তুমুল করতালি ধ্বনি।

কিন্তু সবচেয়ে বেশী করতালি ধ্বনি পেল পাহাড়ী ঈগলের গান। আনাতোলীয়ার পাহাড়ে পর্বতে নাকি বাস করে বিরাট আকারের ঈগল, আর সে ঈগল রাত্রি শেষে যখন পর্বত শিখরে দাঁড়িয়ে গলা ছেড়ে দিয়ে ডেকে ওঠে, তখন পার্শ্ববর্তী পাহাড়-পর্বতের কন্দরে কন্দরে সে ডাক ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে। একটি মহিলা তাঁর দল ছেড়ে এগিয়ে এসে সেই ঈগলের ধ্বনি করলেন ঃ উচ্চ, দীর্ঘ, সুন্দর, সবল। সুর হাওয়ার পাখায় ভর করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, কেবল উপস্থিত শ্রোতারা নয়, ইস্তাম্বুলের পাহাড়ের শিখরেরা, বসফরাসের বুকের মউজেরা, পাইন পল্লবের পাতারা, চরের আধ-জাগ্রত পাখীরা মুগ্ধ হয়ে সে ডাক শুনল।

তারপর এল পল্লীনৃত্য। বসফরাসের তরঙ্গের নাচ, কৃষ্ণ সাগরের হিমে জড়সড় নাচ, উঠানে গমের পালা দেখে বাড়ীর মুরগীর নাচ। সবগুলিই সুন্দর হল। তারপর এল আর্জেরুমের লড়াইর নাচ, ঢাল তলোয়ার বেঁধে নাচ, তলোয়ার ভাজা, অবশেষে লড়াই শুরু। আমাদের

দেশের লাঠিয়ালদের মতই পাইতারা কেটে অবশেষে পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ। সে আক্রমণে কারো কারো তলোয়ার ভেঙ্গে দুখান হয়, কারো ঢাল হাত হতে ছুটে পড়ে, কেউ দুশমনের তলোয়ার কেড়ে নেয়; দুশমন বিপাকে পড়ে কায়দা খুঁজতে থাকে, অবশেষে ঝুপ করে নিজ তলোয়ার কেড়ে আনে, আবার শুরু হয় তুমুল সংগ্রাম। কতকটা আমাদের দেশের বায়ই ঝাক লাঠি খেলার মত।

এই নাচ ও খেলা দেখার জন্য, এই গান শোনার উদ্দেশ্যে সৈন্য-সেনাপতি, উজীর-নাজীর, দেশ-বিদেশের প্রতিনিধিরা রাত ১টা পর্যন্ত বসে রইলেন। আমাদের বার বার মনে হতে লাগল শিক্ষিতদের মধ্যে এক গুরুসদয় দত্ত ও পুলিনদাস ছাড়া আমাদের দেশের লাঠি খেলা, দা খেলা, হলঙা খেলা, জারী গান, কাবী নাচ—এ সবের কদর কয়জনে করলেন? শুধু অনাদরে নয়, অবজ্ঞা ও পীড়নে এই সব সুন্দর পল্লীগীতি, এই সব চমৎকার খেলা লোপ পেতে বসেছে। কবি জছীমুদ্দিন, গায়ক আব্বাছ উদ্দিন, অধ্যাপক মনছুর উদ্দিন ও আরো যাঁরা এ দিকে নজর দিয়েছেন তাঁদের সাধনার কথা আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

আমাদের আন্তঃপার্লামেন্টের অধিবেশন স্থান ছিল ইলদীজ। আমাদের হোটেল তারাবিয়া ছিল ইলদীজ হতে ১২ মাইল দূরে। আমাদের পথের পাশে ছিল রোমেলো হিশার—এক বিরাট প্রাচীন পাষাণ দুর্গ। রোজ ২ বার, কোন দিন ৪ বার আমরা এই কেল্লার পাশ দিয়ে যাতায়াত করতাম। ছোট্ট একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত; মনে হয় কোনও ছোলায়মানের আদেশে দেও-দৈত্যরা এসব তৈরী করে দিয়ে গিয়েছিল। এখন আর এটি কেল্লা হিসাবে ব্যবহৃত হয় না; অথচ এইখানে বসে একদা সুলতান দ্বিতীয় মুহম্মদ ইস্তাম্বুল বিজয়ের পরিকল্পনা সম্পাদন করেছিলেন। সে ১৪৫২ সালের কথা। ওছমানিয়া তুর্করা এসিয়া মাইনরে স্থায়ী ভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে, কিন্তু কেবল এসিয়া মাইনর নিয়ে তারা তুষ্ট নয়, তারা চায় ইস্তাম্বুল। রোমক সম্রাট

কনষ্টানটাইন তখন ইস্তাম্বুলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত; তিনি বিনা যুদ্ধে ইস্তাম্বুলের এক ইঞ্চি জমিও ছেড়ে দিবেন না পণ করে বসলেন। কাজেই কনষ্টানটাইন আর দ্বিতীয় মুহম্মদের মধ্যে শীঘ্রই রণদামামা বেজে উঠল। দ্বিতীয় মুহম্মদ বসফরাসে এসিয়া পারে একটি কেল্লা তৈয়ার করলেন এবং ঐ সোজা য়ুরোপ পারে এই রোমেলো হিশার নির্মাণ করলেন—এই স্বল্প পরিসর স্থানে ভাসমান সেতু তৈয়ার করে খৃঃপূঃ ৫০০ অব্দে পারস্য সম্রাট দরায়ুস ৭ লক্ষ সৈন্য নিয়ে বসফরাস পার হন।

কিন্তু কেবল রোমেলো কেল্লার সাহায্যে ইস্তাম্বুল জয় করা সহজ হল না। গোলডেন হর্ণ নামক সরু জলপথে ইস্তাম্বুলের একদম কাছে গিয়ে না পড়লে সে রাজধানীর কিচ্ছু করা সম্ভব না; অথচ গোলডেন হর্ণের মুখে রোমান সম্রাট তাঁর নৌ-বাহিনী এমন সাজিয়ে রেখেছেন যে, তা অতিক্রম করে যাওয়া মানুষের সাধ্যের অতীত। তা হলে উপায়? উজীর বল্লেন, জাঁহাপনা, অনুমতি দিন, ফিরে যাই; অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করে শক্তিক্ষয় হবে মাত্র। সুলতান বল্লেন, সবুর—আমাকে ভাবতে দিন।

হঠাৎ সুলতান হুকুম দিলেন ৭২টি ছোট মজবুত যুদ্ধ জাহাজ নতুন করে তৈয়ার কর—এমন কৌশলে যে চাকার উপর টেনে নিয়ে অন্যত্র একত্র করা যায়—জলদী। খট-খট - - - - খটাখট কাজ শুরু হল। উজীর জিজ্ঞাসা করলেন—এ জাহাজ দিয়ে কি হবে জাহাঁপনা? সুলতান শান্ত কণ্ঠে বল্লেন, আমার একটা দাড়ি সে কথা জানলে তাকে টেনে উপড়ে ফেলতাম। উজীর কাঁপতে কাঁপতে সরে গেলেন। একদা সন্ধ্যায় সুলতান হুকুমজারী করলেন, আজ রাতের মধ্যে সমস্ত জাহাজের সমস্ত খন্ড পাহাড় প্রান্ত পাড়ি দিয়ে ঐ গোলডেন হর্ণে নিয়ে ফেলতে হবে, কাল সকালে সেই জাহাজে চড়ে আমি ইস্তাম্বুলের উপর হামলা চালাব।

তাই হল। সকাল বেলায় কনষ্টানটাইনের চরেরা গিয়ে তাঁকে খবর দিল, সম্রাট, সর্বনাশ। গোলডেন হর্ণের মুখের জাহাজ মুখেই আছে,

তুর্করা ভিতরে জাহাজে চড়ে হামলার জন্য তৈয়ার হচ্ছে।

তারপর শুরু হল উভয় পক্ষে মরণপণ সংগ্রাম। পরিণামে তুর্কের বাহুবলের কাছে রোমক সৈন্য টিকতে পারল না। সুলতান দ্বিতীয় মুহম্মদ বিজয়ী বেশে ইস্তাম্বুলে প্রবেশ করলেন (১৪৫৩ খৃঃ)।

৭ই সেপ্টেম্বর বেলা ১টার সময় আমরা ইস্তাম্বুল ছেড়ে কায়রো রওয়ানা হলাম। হোটেল ছেড়ে পথে নামলে মৌঃ তমিজুদ্দিন খাঁ সাহেব বল্লেন, এখন কেউ কথা বলবেন না, বিদায় কালে ইস্তাম্বুলকে শেষবারের মত দেখে যাই।

নিকোশিয়া
৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫১

খালেদা,

তোমার পত্রে জিজ্ঞাসা করেছ, আধুনিক তুরস্কে যে সব সংস্কার প্রবর্তন করা হয়েছে, তার বর্তমান ফল কি, ভবিষ্যতই বা কি?

তুরস্কে থাকতে সময় পাই নাই; ইস্তাম্বুল বিমান বন্দরে হাওয়াই জাহাজে উঠে ভাবতে শুরু করলাম, তোমার প্রশ্নের কি জবাব দেই? নিকোশিয়ায় জাহাজ অনেকক্ষণ থামে, তাই তোমার পত্রের উত্তর এই সুযোগে দিতে বসলাম।

সংস্কার সম্বন্ধে প্রথম কথা হল এই যে, সংস্কার মাত্রই সমস্যা সমাকুল; এক কথায় নিশ্চিন্ত মনে এর সম্বন্ধে সুনিশ্চিত উত্তর দেওয়া কঠিন। সংস্কারের ফল অল্পাধিক অনিশ্চিত বলেই যুগে যুগে কিছু সংখ্যক মানুষ অন্ততঃ সাময়িক ভাবে উপস্থিত সংস্কারের বিরোধিতা করে এসেছে।

আসল কথা ঃ যুগে যুগে দেশে দেশে যদিও সংস্কারের সত্যিকার প্রয়োজন উপস্থিত হয়ে থাকে, তথাপি সংস্কারের নামে অতি বড় মহৎ মানুষও মাঝে মাঝে ভুল করে থাকেন। সেই জন্য সংস্কার মাত্রেরই

নির্বিচারে বিরোধিতা করা যেমন অন্যায়, সংস্কার মাত্রকেই নির্বিচারে অভিনন্দন করাতেও তেমনি বিপদ থাকতে পারে। কোন কোন সংস্কার বিচার করে দেখা যায় যে তারা কতকগুলি বর্তমান বিপদ হতে সমাজ বা রাষ্ট্রকে রেহাই দিতে গিয়ে নতুন কতকগুলি বিপদ ডেকে এনেছে। নতুন-আসা বিপদগুলি যদি বিদায়-দেওয়া বিপদগুলির তুলনায় কম হয়, তবে তো ভাল; যদি উভয়ে সমান হয়, তবু রক্ষা। যদি নতুন-আসা বিপদ বেশী হয় তবেই হ্যাঙ্গাম।

তুর্করা মূলতঃ প্রাচ্যজাতি। তাদের আদিম বাসভূমি ছিল মধ্য এসিয়ায়। তুর্ক রাজ্যের তুর্করা অধিকাংশ এখনো এসিয়াখণ্ডেই বাস করে। অল্পসংখ্যক বাস করে ইস্তাম্বুলে। সেই ইস্তাম্বুলেরও একাংশ এসিয়ায় অবস্থিত। আগেকার দিনে তুর্করা নিজেদেরকে প্রাচ্যদেশীয় বলেই মনে করত; প্রাচ্যজাতিদের গৌরবে নিজেরা গৌরব বোধ করত। জাপানী সেনাপতি টুগোর হাতে যেদিন রাশীয়ার শ্বেতাঙ্গ সেনারা মার খেয়ে হটে গেল, সেদিন তুর্কদের আনন্দের অবধি ছিল না। মনস্বিনী খালেদা খানম তখন তাঁর ছেলের নাম রাখলেন হাছান হিকমত টুগো।

এত সত্বেও তুর্করা ক্রমে প্রাচ্য হতে পাশ্চাত্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল কেন, ভাববার কথা।

তুর্করা যতদিন ভুবন বিজয়ী জাতি ছিল, ততদিন পাশ্চাত্যকে তারা পরোয়া করে নাই, করবার দরকার ছিল না। সমগ্র খৃষ্টান য়ুরোপের বাছা বাছা যোদ্ধারা একত্র হয়ে এসেও যদি তুর্ক সুলতানের একার কাছে লড়াইর ময়দানে মার খেয়ে পালিয়ে যায়, তবে সে খৃষ্টান জগতের উপর বিজয়ী তুর্কদের ভক্তি হওয়ার কোন কথাই ওঠে না। কিন্তু কালক্রমে ঘটনার স্রোত উল্টা দিকে চল্ল ঃ তুর্করা ক্রমে ক্রমে পড়ে গেল পেছনে; খৃষ্টানেরা জ্ঞানে গরিমায়, অস্ত্রে শস্ত্রে ও যুদ্ধের কৌশলে এগিয়ে গেল। আজ তুর্ক সাম্রাজ্য হতে এ-রাজ্য খসে পড়ে, কাল ও-রাজ্য খসে পড়ে; তার পরদিন খসে পড়ে আরো একটি; আর এর সব গিয়ে পড়ে য়ুরোপীয়

শক্তিদের কবলে। তুর্করা মার খেয়ে খেয়ে অস্থির হয়ে উঠল; ভাবল, খৃষ্টানদের মত না হলে আর ওদের সাথে টক্কর দিয়ে কুলান যাবে না।

'আচ্ছা, ঐ শক্তিমান খৃষ্টানদের মত হতে হলে আমাদের কি কি করতে হয়?'—চিন্তাক্লিষ্ট তুর্ক ভাবতে লাগল। 'আমাদের পোশাক বড় ঢালা ঢিলা আর লম্বা; ওদের পোশাক ছোট, আটসাট, দৌড়াদৌড়ি, চটপট চলা ফিরার পক্ষে সুবিধাজনক। ওদের হ্যাটে আমাদের ফেজের চেয়ে রোদ বেশী ফিরায়। ওদের মেয়েদের কাপড় জামা ছোট খাট; তার দৌলতে তুফানের মত তারা চলে; আলো হাওয়ায় স্বাস্থ্য তাদের ভাল থাকে; লড়াইর সময় পুরুষদের কাজে কত সাহায্য ওরা করে। আর আমাদের মেয়েরা? ঐ লম্বা জামা আর বোরকার ভারে তারা চলে ধীরে, আলো হাওয়া পায় কম; তার পর চার দেয়ালের ভিতরে থেকে তারা পর্দাই রক্ষা করবে, না বাইরে এসে স্বামী ভাইদের পাশে দাঁড়াবে? য়ুরোপের সব জাতি ব্যবহার করে ল্যাটিন হরফ; আমরা একা আরবী হরফ ব্যবহার করে এক ঘরে হয়ে থাকি কেন? ওদের সাথেই তো আমাদের ওঠ-বস, লেন-দেন বেশী! আমরা 'ধর্ম' 'ধর্ম' করে কতকাল সংগ্রাম করলাম, কি ফায়দা আমরা পেলাম? খিলাফত আমাদের কোনই কাজে এল না। প্রথম মহাযুদ্ধের কালে জেহাদ ঘোষণা করলাম; শামী, হেজাজী, ইরাকী কেউ সাড়া দিল না, বরং তারা দুশমনদের সাথে যোগ দিয়ে তলোয়ার হাতে উল্টা আমাদেরকেই তাড়া করে নিয়ে এল। ধর্মের কাণ্ডারী বলে রাজ্যে যারা দাবী করে আসছে তারা পুরানপন্থী হোজা ঃ এই স্বল্প-শিক্ষিত হোজারা কত কাল থেকে দেশের সর্বপ্রকার প্রগতি-মূলক সংস্কারে কেবল বাধাই সৃষ্টি করে এসেছে।'

তুর্ক দেশপ্রেমিকদের মন যখন এমনি বিভিন্নমুখী চিন্তার দোলায় দোলায়মান, সেই সময় মুস্তাফা কামালের পতাকাতলে শুরু হল তুর্ক জাতির নতুন করে আবার জীবন-মরণ সংগ্রাম। সে সংগ্রামে মরে মরে করে তুর্ক কোন রকমে বেঁচে গেল। লড়াইর ময়দান হতে ফিরে তলোয়ার

বন্দুক হাত হতে রেখে তারা আবার ভাবতে বসল ঃ 'এবার তো মুস্তাফা কামালের বুদ্ধি আর সাহসের জোরে বেঁচে গেলাম; কিন্তু এই তো আমাদের শেষ বাঁচা নয়! আমাদের আবার লড়তে হবে, আবার জিততে হবে, আবার বাঁচতে হবে ঃ আর সে সমস্ত লড়াই-ই করতে হবে এই য়ুরোপীয় শক্তিদের সাথে ----হ্যাঁ, বাঁচতে আমাদের হবেই, তার জন্য যে ত্যাগ করতে হয় সব করতে রাজী, তবু বাঁচতে আমাদের হবেই---।' মুস্তাফা কামাল তীব্র কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, বন্ধুগণ, বাঁচতে আমাদের হবেই। কিন্তু তার জন্য কি করতে হবে, জান?' জীবন-পাগল দেশপ্রেমিকের দল সমস্বরে উত্তর দিল, 'না, তা স্পষ্ট বুঝতে পাচ্ছি না। তুমি আতাতুর্ক—তুর্কদের পিতা; তুমি বলে দাও, কি করতে হবে। তুমি যা বলবে, আমরা তাই মেনে নিব।' আতাতুর্ক বল্লেন, 'তবে আমি যা হুকুম করব বিনা বাক্যে মেনে নিতে হবে; কেউ তার বিরুদ্ধে কোন চুঁ-চেরা করলে কিন্তু তার কাঁধের উপর আমি মাথা থাকতে দিব না।' আতাতুর্কের ভক্তেরা বলে উঠল ঃ তাতেই রাজী। তুমি শুরু করে দাও তোমার নতুন অভিযান; চালিয়ে যাও তুমি জীর্ণ পুরাতনের কঙ্কালের উপর দিয়ে তোমার সংস্কারের দুর্নিবার রথ; আমরা তোমার পেছনে আছি।'

সদ্য-আক্রমণ-মুক্ত তুর্কজাতি তখন তার ভবিষ্যৎ আত্মরক্ষার চিন্তায় অধীর; অনাগত অক্ষুণ্ণ জীবনের নেশায় পাগল।

দেশের, জাতির উগ্র মুখর অংশের এই মানসিক আবহাওয়ার মধ্যে আতাতুর্ক তাঁর সংস্কারের রথ চালিয়ে দিলেন। আতাতুর্কের সংস্কারের রথ নির্মম গতিতে এগিয়ে চল্ল। ফেজ গেল, বোরকা গেল, আচকান চাপকান পাগড়ী গেল, আরবী হরফ গেল; রাষ্ট্রের সরকারী খাতা হতে ইছলাম গেল; আজানের ভাষা হতে আরবী জবান গেল; খলীফা সহ খিলাফতের দাবীও নির্বাসিত হল। তুর্করা জগতের কাছে সগর্বে ঘোষণা করল, 'আমরা মধ্যযুগের বন্ধন হতে মুক্তি লাভ করে

আধুনিকতার যুগে হিজরত করলাম।'

দেশে অনাচার আর কুসংস্কারের আবর্জনা যেখানে স্তূপীকৃত, সেখানে বল প্রয়োগে সংস্কারসাধনের বিরোধী আমি মোটেই নই ঃ কিন্তু সে চরম পথ; যেমন ঔষধ খাওয়ায় কোন ফল না হলে শেষ পর্যন্ত কোন কোন রোগীকে জোর করে ধরে তার উপর সার্জনের ছুরি চালান হয়ে থাকে। আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, আমাদের দেশেও কিছু কালের জন্য (কিন্তু নিশ্চিত রকমে, মাত্র কিছু কালের জন্য) অমন ডিকটেটরী শাসন ও সংস্কারের প্রয়োজন আছে; মোলায়েম পথে শম্বুক গতিতে এত অনাচারের, এত পেছনে পড়ে থাকার প্রতিকার বুঝি হবার নয়।

হ্যাঁ, আতাতুর্কের সংস্কারে যা যা গেল, তার সম্বন্ধে দুটি কথা।

ফেজ বা পাগড়ী বা আচকান গেল, যাক। ফেজের বদলে যখন ইরাণে রেজাশাহী টুপীর চল হল, বা পাকিস্তানে অনেকে জিন্না টুপী মাথায় দেওয়া শুরু করল, তখন কেউ তাতে কোন আপত্তি করে নাই; করার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না। তেমনি আচকান ছেড়ে পার্সীয়ান কোট যখন এদেশে চল্ল, তাতেও আমাদের আলেমরা তার বিরুদ্ধে কোন ফতোয়া দেন নাই। হ্যাটের বিরুদ্ধে আসলে তো বলবার কিছুই নাই; বাংলা দেশের কৃষকেরা বহুকাল হতে মাথাইল নামে বড় বড় হ্যাট পরে আসছে। হেজাজ ও হেজাজের অন্তর্গত মক্‌কা মদীনা যখন তুর্করা নিজ হেফাজতে রাখতে পারল না, তখন খিলাফতের দাবী অন্যে বলার আগে নিজ থেকে ভালয় ভালয় ছেড়ে দেওয়া শোভনই হয়েছে। তুরস্কের বাদশারা তো আগে কেবল সুলতান ছিলেন; হেজাজ দখল করার পর হতে তাঁরা খলীফা উপাধি গ্রহণ করেন। খিলাফত নাই, অথচ খলীফার দাবী নিয়ে একজন অকর্মণ্য বিলাস সর্বস্ব ব্যক্তি রাষ্ট্রের ঘাড়ে চেপে বসে থাকবেন, এ ব্যবস্থা কোন দেশই বেশী দিন বরদাস্ত করতে পারে না। সুতরাং খলীফাকে নিরাপদে সরে যেতে বলেও তুরস্ক কোন

অন্যায় করেছে মনে করি না। আরবী হরফ বাদ দিয়ে রোমান হরফ গ্রহণেও কোন ধর্মীয় আপত্তি থাকতে পারে না। আমরা বাংলা হরফে যদি আমাদের মাতৃভাষা লিখতে পারি, তবে তুর্করা রোমান হরফে তাদের মাতৃভাষা লিখতে পারবে না কেন?

এই পোশাক আর হরফ পরিবর্তন করতে গিয়ে তুর্করা কি করল, তার চেয়ে তারা এসব কেন করল, আমার বিবেচনায় তারই গুরুত্ব বেশী। দেশ কাল পাত্র অনুযায়ী হরফ বা পোশাকের উপযোগিতা বিবেচনার প্রয়োজন আছে; সে বিবেচনার ফলে এদের কোন কোনটির পরিবর্তনও দরকার হতে পারে; কিন্তু সেই পরিবর্তনের উপর কত খানি গুরুত্ব দিব?

নব্যতুর্কের সংস্কারের যাঁরা বিরূপ সমালোচনা করেন, তাঁদের কেউ কেউ বলে থাকেন ঃ 'সুদীর্ঘ ছয় শ বছর পর্যন্ত তুর্ক জাতি দুনিয়ার একটা বিরাট অংশের উপর প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করে এল, এর মধ্যে যে তাদের মধ্যে কোন আরাস্তু আফলাতুন, কোন নিউটন আইনষ্টাইনের উদ্ভব হল না, সে কি ফেজ আর পাগড়ীর অপরাধ? মাথার উপরে হ্যাট পরলেই কি মাথার ভিতরে ক্যান্ট আর হিগেলের বুদ্ধি এসে বাসা বাঁধবে?' তুর্করা নিজেরা অমন কথা বলে না; কাজেই আমাদের পক্ষে অমন অনুমান করা সুবিচার সঙ্গত নয়। হ্যাট না পরেও যে ইবনে ছীনা, ইবনে রোশদের মত মনীষীর আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল, সে কথা আমাদের চেয়ে ওরাই হয়তো বেশী জানে। আর ওদের নিজেদের সুলতানদের মধ্যে যাঁরা দেশে দেশে বিজয় পতাকা বহন করে ফিরেছেন, তাঁদের মাথায় তো ফেজ আর পাগড়ীই ছিল!

তুর্কদের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশে তাদের মনের কথা জানবার সুযোগ হয় নাই। ইস্তাম্বুল আঙ্কারা অবস্থানের কয়েকদিনের মধ্যে যা সামান্য বুঝতে পেরেছি, তাতে মনে হয় তাদের মনোভাব সংক্ষেপতঃ এই ঃ 'পোশাক আর হরফ পরিবর্তনের ফলে চলায় ফিরায়, স্বাস্থ্যের

বিবেচনায়, লেখায় পড়ায় যত টুকু অতিরিক্ত সুবিধা মিলে আমরা তাতেই তুষ্ট, তার চেয়ে বেশী আমরা আশা করি না। তারপর এই পরিবর্তনের ফলে পাশ্চাত্য জাতিগুলির সাথে আমাদের সাম্য যত সামান্যই বেড়ে থাকুক, তাও আমাদের কাম্য। অনেক শ বছর ওদের সাথে আমরা লড়াই করে কাটিয়েছি; পরিণামে আসল ফায়দা খুব বেশী কিছু হয় নাই; এখন ওদের সাথে মিলে মিশে বসবাস করতে চাই।'

তার পর আজানের ভাষা পরিবর্তন। নয়া রিপাবলিক হুকুম দিয়ে বসল ঃ 'অতঃপর তুরস্কে তুর্কী জবানে আজান দিতে হবে।' আমার মনে হয়, এ তাদের সাময়িক অতি আগ্রহের ফল। আজান যার যার মাতৃভাষায় হোক, নিছক নীতির দিক দিয়ে এতে কারো আপত্তি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু এ পরিবর্তনের কার্যগত সুফল কি? আজানের এত সুন্দর, এত সুপরিচিত, এত আবেগময় আবেদন—এ তো বহুকাল থেকে আন্তর্জাতিক হয়ে আছে। আর কত বিদেশী ভিন্নধর্মী লেখক এর প্রশংসায় মুখর! এর অনুবাদ হয় না, যেমন আমাদের তকবীর 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনির অনুবাদ হয় না।

তুর্করা নিজেরা তুর্কী জবানের আজানে হৃদয়ে সাড়া বোধ করে নাই। এই অভিজ্ঞতার ফলেই কিছুকাল হতে তুরস্কে আরবী জবানে আজান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সত্যকে স্বীকার করে নেওয়ার তুর্কদের এই জাগ্রত মনোভাব প্রশংসনীয়।

সর্বশেষে—রাষ্ট্রের ধর্ম হিসাবে ইছলামকে সরকারী দফতর হতে বাদ দেওয়ার কথা। এ কাজের ফলাফল সত্যি গভীরভাবে ভাববার কথা।

এ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আগে শুনে রাখ।

তুর্ক রিপাবলিক যে সরকারী দফতর হতে ইছলামকে বাদ দিয়েছে, তার মূল উদ্দেশ্য মনে হয় দুটি। প্রথম উদ্দেশ্য—রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যাপারে ধর্মের নামে কাউকে কোন বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করতে দেওয়া হবে

না; দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—ইছলামের নামে তুর্ক সরকার বাইরের কোন শক্তির সঙ্গে ঝগড়া ফছাদ করতে রাজী নয়। এইটুকু ছাড়া ধর্মের উপর আর কোন হস্তক্ষেপ তুর্ক সরকার করে নাই; ব্যক্তিগত জীবনে রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক নিজ নিজ ধর্ম পালনে সম্পূর্ণ স্বাধীন। দেশে আল্লা ও মানুষের মধ্যবর্তী স্থানে নিজেদের আসন প্রতিষ্ঠিত করে যে একদল লোক ধর্মের নামে প্রভূত ক্ষমতা পরিচালন করে আসছিল, তুর্ক রিপাবলিক তাদের প্রভাবের অবসান ঘটিয়ে দিল। রাজনীতির অলিগলি সর্বাংশে দোষমুক্ত নয়, হতে পারে না। প্রভুত্বপরায়ণতার অস্বাভাবিক লোভ, রাতারাতি ঐশ্বর্য সঞ্চয়ের দুরাকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা সাধনের অসঙ্গত চেষ্টা—প্রভৃতি নিন্দনীয় মনোভাব দ্বারা রাজনীতি কোন কোন সময় প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে। আর রাজনীতিতে বাস্তবিক গলৎ যতখানি থাকে, তার চেয়ে অনেক বেশী গলৎ আছে বলে নানা কারণে জনসাধারণ বিশ্বাস করে। এই যদি রাজনীতির স্বাভাবিক প্রকৃতি ও ভাগ্য হয়, তবে তার সাথে ধর্মকে ওতপ্রোতভাবে জড়িত করলে ধর্মের উপরও লোকের মনে অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা পয়দা হওয়ার কথা। সুতরাং রাজনীতির কবল হতে ধর্মকে মুক্ত করার ফল হয় তো ভবিষ্যতে ভালই হবে; রাজনীতির কুয়াশা-নির্মুক্ত ধর্মকে মানুষ সত্যিকার ভাবে চিনতে পারবে, সত্যিকার ভাবে তার অনুসারী হতে পারবে; সত্যিকার ইছলাম মানুষের মনে তার যথাযোগ্য স্থান অধিকার করে বসবে।

তুমি লিখেছ, যাদের ঐশ্বর্যের গরিমা, যাদের প্রতিভার ঝলক, যাদের আণবিক বোমার বিস্ময় তুর্কদের মনকে মুগ্ধ করেছে, তারা তো তাদের নিজেদের কথাবার্তায়, তর্ক আলোচনায়, বইয়ে পুস্তকে অহরহ 'খৃষ্টান জগত', 'খৃষ্টান ধর্ম", 'খৃষ্টান জাতি', 'খৃটান সভ্যতা', 'খৃষ্টান সংস্কৃতি', 'খৃষ্টান সাহিত্য', 'খৃষ্টান উদারতা'—প্রভৃতি কথা সগর্বে ব্যবহার করে আসছে।

আমারো মনে হয় ব্যক্তি ও জাতি উভয়েরই বড় হওয়ার জন্য সামনে বড় আদর্শ চাই। প্রেরণা মহত্বের উৎস, আবার আদর্শ প্রেরণার উৎস। শাক্য সিংহ একটা আদর্শ দিয়ে গেলেন, জন্ম হল বৌদ্ধ সভ্যতার, উদ্ভব হল অশোকের। আমাদের রছুলুল্লা একটা আদর্শ দিয়ে গেলেন, জন্ম হল এক নবীন জাতি আর নতুন সভ্যতার। রুশো একটা আদর্শ দিয়ে গেলেন, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার তরঙ্গ ফ্রান্সের সীমা পার হয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। কার্ল মার্কস একটা আদর্শ দিয়ে গেলেন, জন্ম হল লেনিনের, বিকাশ হল সোভিয়েট রাশিয়ার। প্রাচীন গ্রীস জ্ঞান বিজ্ঞানকে আদর্শ করে চলেছিল, তাতেই সে বড় হয়েছিল। প্রাচীন রোম সাম্রাজ্য-বিস্তার ও আইনের অনুশীলনকে সামনে ধরে সাধনা করেছিল, তাতেই সে বড় হয়েছিল। আরব ইছলামের পতাকা হাতে নিয়ে যাত্রা করেছিল, তাতেই সে বড় হয়েছিল। আগেকার দিনের তুর্ক সুলতানদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল রাজ্য বিস্তার আর সামরিক প্রতিষ্ঠা অর্জন; সে উদ্দেশ্য তাদের সফল হয়েছিল। অনেক কাল হতে তুর্কদের রাজ্যবিস্তার ও সামরিক যশ অর্জনের পথ অবরুদ্ধ; রাষ্ট্রের আদর্শ হিসাবে ইছলামকেও তারা ছেড়ে দিল। তাদের তা হলে নতুন আদর্শ একটা খুঁজে নিতে হবে। এর মানে এ নয় যে সামনে কোন সুস্পষ্ট বিঘোষিত আদর্শ না থাকলে তারা মরে যাবে। হয় তো তারা বর্তমানের চেয়েও খেয়ে দেয়ে সুখে সম্পদে বেঁচে থাকবে। দুনিয়ায় টিকে থাকাও একটা বড় কথা; কিন্তু বেঁচে থাকার সেই-ই সব চেয়ে বড় কথা নয়। বিশ্বের জ্ঞানের ভাণ্ডারে, মহামানবের কল্যাণের অভিসারে অতঃপর তাদের স্থায়ী দান কি হবে, বড় কথা তাই।

তুর্কজাতির পক্ষে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার সময় এখনো সামনে আছে। মানুষের উপর প্রভুত্ব করার ব্যাপারে তুর্করা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে; মানুষের খেদমতের ব্যাপারেও তারা দক্ষতার পরিচয় দিক, এই কামনা করি।

—৬

জিজ্ঞাসা করতে পার ঃ ইছলাম দিয়ে একটা জাতি বড় হয় কেমন করে? নামাজ পড়ে, হজ করে, জাকাত দিয়ে একটা জাতি বড় হয়? তোমার মত আরো অনেকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে থাকেন। এর সংক্ষিপ্ত উত্তর এই ঃ

মানুষের জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করে সাফল্যের পথে নেওয়ার জন্য ইছলাম একটি কর্মক্রম। সে কর্মক্রম, সে পরিকল্পনা, সে আদর্শ সহজ, সুন্দর, মহিমময়। ইছলামের প্রাণ তার তৌহীদ। আল্লা এক, তার সৃষ্ট মানুষও এক। সকল মানুষ একই আদমের সন্তান, অতএব তারা সকলে ভাই ভাই। আদম মাটিতে তৈরী; অতএব মানুষের অহংকার করবার কিছু নাই। কালা ধলা, ধনী গরীব, এ দেশের ও দেশের সে দেশের সকল মানুষ সমান। আল্লার সৃষ্ট এ দুনিয়া; এ দুনিয়ার সম্পদ ভোগের জন্য সকলে সমান সুযোগের অধিকারী। নামাজ রোজা হজ জাকাত নিতান্ত দরকার; কিন্তু কেবল পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ছেজদা করলেই আল্লা খুশী নয়, আল্লা দেখে মানুষের মন, তার ঈমান। কোরবানী করা দরকার, কিন্তু কোরবানীর পশুর রক্তমাংসে আল্লা খুশী নয়; আল্লা দেখে আল্লার পথে, ন্যায়ের পথে, সত্যের পথে কে কতখানি ত্যাগ স্বীকার করতে রাজী। মানুষের দুয়ারে আল্লা খেতে চাইতে আসে না; ভুখাকে খেতে দিলেই আল্লাকে খেতে দেওয়া হয়। আল্লার বান্দার সেবার ভিতর দিয়েই আল্লাকে পাওয়া যায়। এসব ব্যাপারে আল্লার রছুলের সেবাময়, প্রেমময়, মহিমময় জীবন আমাদের বড় আদর্শ।

ইছলামের এই মহান আদর্শ যে-মানুষ জীবনের চিন্তায়, কথায়, কাজে রূপায়িত করে, সে বড় হয়; যে-জাতি তার মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করে সাধনার পথে অগ্রসর হয়, সে জাতিও বড় হয়।

ইছলামের পয়গম্বর ঘরের সমস্ত অতিথিকে দিয়ে নিজে পেটে পাথর বেঁধে থাকেন; ইছলামের খলীফা ওমর রাত্রিতে ময়দার বস্তা

পিঠে বয়ে দুস্থ প্রজার বাড়ী দিয়ে আসেন; সাথী সাহায্য করতে চায়, খলীফা গরম আওয়াজে জবাব দেন, কিয়ামতের ময়দানে আমার দায়িত্বের বোঝাটা তুমি বয়ে নিয়ে দিবে? ইছলামের সুলতান ছালাহুদ্দীন—বিপুল সাম্রাজ্যের অধিপতি; তিনি এন্তেকাল করেন, টাকা ধার করে তাঁর কাফনের কাপড় কিনতে হয়। ইছলামের বাদশা আওরঙ্গজেব : অগাধ ঐশ্বর্যময় সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট—তিনি নিজ হাতে টুপী সেলাই আর কোরান নকল করে যা পান, তাই খরচ করে খান। ইছলামের বেগম ভারত সম্রাটের হারেমে, দামেস্কের খলীফা ওমর-ইবনে আবদুল আজীজের মহলে, নিজ হাতে রান্না করেন; ইছলামের পয়গম্বরের কন্যার হাতে বাট্‌না বাটতে বাটতে কড়া পড়ে যায়। ইছলামের যে প্রাণময়ী প্রেরণা এ'দেরে উদ্দীপ্ত করেছিল, সেই প্রেরণা আর ইছলামের এই সুসন্তানদের আদর্শ—এ দুয়ে অনুপ্রাণিত অবস্থায় যারা শাসন কাজ পরিচালন করবে, দুর্বল, দুস্থ, সর্বহারাদের জন্য সাধারণের চেয়ে তাদের চিত্ত আগে দুলে উঠবে, তাদের সাহায্যের হাত আগে প্রসারিত হবে, এই-ই তো স্বাভাবিক।

তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি। তুর্করা বলে, 'আমরা রাষ্ট্রের সামনে থেকে ইছলামের আদর্শকে সরিয়ে দিয়েছি বলে জীবনের সামনে থেকে তো সে আদর্শকে সরিয়ে দেই নাই।' এরই থেকে ফুটে উঠছে একটা আশার আলো। মানুষ হিসাবে যদি তুর্করা সত্যিকার মুছলমান হয়, তবে রাষ্ট্রের উপর তার প্রভাব পড়বে। তুরস্ক এখন রিপাবলিক। রিপাবলিকের অধীনে তুর্ক অতুর্ক, মুছলমান অমুছলমান, সকল নাগরিকের সমান অধিকার। এত সব সত্বেও রিপাবলিকের শাসন যন্ত্র তুর্কদের হাতেই আছে, তুর্কদের হাতেই থাকবে। কাজেই তুর্করা যদি ব্যক্তিগত জীবনে ইছলামের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়, তবে রাষ্ট্রের আদর্শ প্রকাশ্যভাবে ইছলাম না থাকলেও রাষ্ট্রের কার্যকলাপে ইছলাম রূপায়িত হয়ে উঠবে। আর যদি নাগরিকেরা আসলে মুছলমান না হয়,

তবে রাষ্ট্রের সামনে কেবল ইছলামের ধ্বজা উঁচু করে রাখলে তাতে প্রকৃত ফায়দা কি?

ব্যক্তিগত জীবনে তুর্করা যে তাদের অন্তরের অন্তস্থলে ইছলাম-প্রিয় একথা মনে করার একাধিক কারণ আছে। আজান আরবীতে দেওয়ার অনুমতি তারা দিয়েছে, একথা আগে বলেছি। মছজিদে মুছুল্লীর সংখ্যা রোজ-বরোজ বেড়ে চলেছে, তারো উল্লেখ করেছি।

ইদানীং তুর্ক রাজনীতিতে এমন একটি বিরোধী দল জন্ম লাভ করেছে ধর্মকে পুনর্জীবন দান যাদের কর্মসূচীর অন্যতম প্রধান দফা। এরা সাময়িক কাগজ ও পুস্তক-পুস্তিকা মারফত জোরে প্রচার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা পদ্ধতিতে ধর্ম-শিক্ষাকে স্থান দান তাদের এক বিশেষ দাবী। তুর্ক সরকার তাদের এ দাবী মেনে নিয়েছেন।

তুর্ক সরকার আরো স্বীকার করেছেন, ইমাম ও অন্যান্য ধর্ম-শিক্ষকদের ট্রেনিং-এর জন্য বিশেষ বিশেষ কলেজ খোলা হবে। এরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্ম সংক্রান্ত উচ্চ শিক্ষালাভ করবেন।

তবে এই সব কলেজে ভর্তি ও অধ্যয়ন ব্যাপারে সরকার দুটি শর্তকে অপরিহার্য করেছেন। প্রথম শর্ত ঃ পাঠ্য বই ও শিক্ষাসূচীকে সরকারের অনুমোদন লাভ করতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত এই ঃ এসব কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য যারা প্রার্থী, তাদের একটা নির্দিষ্ট মান পর্যন্ত ধর্মের বাইরের সাহিত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত থাকতে হবে।

আমাদের দেশের মফস্বলে ধর্মপ্রচারক ও ইমামগণকে ধর্মের নামে সত্য, অসত্য, অর্ধসত্য প্রচারের যে অবাধ সুযোগ দেওয়া হয় এবং তার ফলে গাঁয়ে অন্ধ সংস্কার যে ভাবে এখনো তার রাজত্ব কায়েম রেখেছে, তার তুলনায় তুর্ক সরকারের এ ব্যবস্থাকে একান্ত প্রশংসা করতে হয়।

ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাটীন ভাষার আধ্যাপিকা—নাম

ডাক্তার নিস্তেরীন দিরবানা—বয়স সাতাশ-আটাশ—আতাতুর্ক জামানার আবহাওয়ায় লালিত বর্ধিত—তাঁর সঙ্গে আলাপ হল। কথা প্রসঙ্গে তিনি বল্লেন ঃ

'শোক দুঃখের মুহূর্তে আমি ধর্ম সংক্রান্ত বই ছাড়া আর কোন বই-ই বরদাশত করতে পারি না। কেবল ইছলাম আর কল্পনায় অতীত যুগের মনীষীদের ছোহ্বত—এই-ই শান্তি দিতে পারে। আহা! যদি আমরা তাঁদের সেই জ্ঞানোজ্জ্বল সরল জীবন, তাঁদের সেই পবিত্রতার মহিমায় ফিরে যেতে পারতাম! কিন্তু হায়! আধুনিক যুগের মোহের কুয়াশা সে সবকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।'

কিন্তু হাওয়াই জাহাজে ওঠার সময় এসে গেল। এখন জাহাজে গিয়ে বসি আর নিকোশীয়া সম্বন্ধে দুটি কথা বলি।

ষ্টেশনটি নিতান্ত সুন্দর। চারদিকে ফুল, তারপর পাইনের সারি, তারপর পাথরকাটা প্রশস্ত রাস্তা; দূরে দূরে আকাশে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো পাহাড় পর্বত।

দুনিয়ার নানান দেশের লোক নিকোশীয়ার বিমান বন্দর দিয়ে চলাফিরা করে; কাজেই বিমান বন্দরের লোকেরা অনেক দেশ বিদেশের খবর রাখে। আমরা পাকিস্তানের মানুষ, একথা জানতে পেরে ষ্টেশনের একজন বল্ল—'দেখুন, আপনাদের কায়েদে আজম জীন্না একবার আমাদের এ ষ্টেশনে নেমে কিছুক্ষণ আমাদের মেহমান ছিলেন।'

নিকোশীয়া সাইপ্রাস দ্বীপের রাজধানী। সাইপ্রাস দ্বীপ ভূমধ্যসাগরের পূর্ব অংশে অবস্থিত ঃ এশিয়া মাইনরের উপকূল হতে ৪০ মাইল, আর সিরীয়ার উপকূল হতে ৬০ মাইল;—লম্বায় ১৪০ মাইল, পাশে ৬০ মাইল—বাসিন্দা সংখ্যা ৪,৫১,০০০; তার মধ্যে ৮০,৫০০ তুর্কী মুছলমান, বাকিরা গ্রীক ও আর্মেনীয় খৃষ্টান। সরকারী ভাষা তিনটি—ইংরেজী, গ্রীক, তুর্কী। প্রাথমিক স্কুল ৬৮৩, মাধ্যমিক ৪৩।

দ্বীপটি ছোট; কিন্তু এর সভ্যতা অতি প্রাচীন। খৃষ্টপূর্ব

১৪৫১ অব্দে মিসরীয়েরা এ দ্বীপ দখল করে। তারপর দ্বীপটি যায় পারস্যের হাতে। পারস্যের হাত হতে দ্বীপটি রোমকরা কেড়ে নেয়। ১৫৭১ সালে রোমক সাম্রাজ্যের কবল হতে দ্বীপটিকে তুর্করা নিজ শাসনাধীনে নিয়ে যায়। ৩০০ বছর তুর্ক শাসনে থাকার পর ১৮৭৮ সালে দ্বীপটি ইংরেজের হাতে যায়। ইংরেজরা এর জন্য তুরস্কের সুলতানকে একটা বার্ষিক খাজনা দিত। বোধ হয় এই কারণেই আমাদের দেশের জনসাধারণ মুছলমান সগর্বে বলাবলি করত ঃ 'ইংরেজরা এত বড় হলেও আমাদের রুমের বাদশাকে খেরাজ দেয়।' প্রথম মহাযুদ্ধে তুর্কপক্ষ হেরে যায়, ইংরেজপক্ষ জয়লাভ করে। সেই সুযোগে ইংরেজরা তুরস্ককে খেরাজ দেওয়া বন্ধ করে দেয়। তখন হতে সাইপ্রাস ইংরেজদের ক্রাউন কলোনী হয়ে আছে।

আগে তুর্ক বাসিন্দাদের সংখ্যা বর্তমানের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। ইংরেজ অধিকারের পর এদের অনেকে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছে; গ্রীকরা এসে তাদের স্থান পূরণ করেছে।

দ্বীপটি অত্যন্ত সুন্দর। পাহাড়ে পর্বতে, সমতলে উপকূলে একই সময়ে এখানে নানা ঋতু বিচরণ করে। বাইরের দেশ বিদেশ হতে অনেক লোক এখানে হাওয়া খেতে আসে। বাসিন্দারা নিতান্ত সৌখীন। তাদের বারমাসে তের পার্বন। তারা মহা ধুমধামে বসন্ত উৎসব সমাপন করে। আবার ক্ষেতে ক্ষেতে যখন আঙ্গুর পেকে ওঠে, তারা তখন আঙ্গুরের উৎসবে মেতে যায়।

দ্বীপে খৃষ্টান আমলের বহু কীর্তিচিহ্ন আছে। মুছলিম আমলের কীর্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ

১। আয়াছুফিয়া—নিকোশিয়ার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত—বিরাট সুন্দর মছজিদ।

২। সুলতানের কুতুবখানা—আয়াছুফিয়ার অঙ্গনে অবস্থিত। তুর্ক সুলতানেরা এর পৃষ্ঠপোষকতা করতেন—'আরবী, ফারসী ও তুর্ক

ভাষায় লিখিত বহু অমূল্য গ্রন্থের সংগ্রহ।

৩। দরবেশের আস্তানা—১৭শ শতাব্দীতে স্থাপিত। মওলানা জালালুদ্দীন রুমী তুরস্কের অন্তর্গত কোনীয়া শহরে ১২৭৩ সালে এন্তেকাল করেন। তাঁর ছুফীতত্ত্বকে কেন্দ্র করে তুর্ক সাম্রাজ্যময় এখানে সেখানে নানা আস্তানা গড়ে ওঠে। এ আস্তানাটি তাদেরই অন্যতম।

৪। উম্মুল হারামের মাজার—কথিত আছে ৬৪৬ সালে আরবেরা যখন সাইপ্রাস আক্রমণ করে তখন তাদের সাথে ছিলেন রছুলুল্লা ছাল্লাল্লাহু আলায়হেচ্ছালামের ফুফু—এখানেই তিনি এন্তেকাল করেন। তাঁর মাজারের কাছে পরবর্তীকালে এক বিরাট মছজিদ নির্মিত হয়। ঈদের দিন হাজার হাজার মুছলমান এখানে জিয়ারত করতে হাজির হয়। লবণহ্রদের তীরে এই মাজার অবস্থিত।

ELEVEN BULLET CLUB Estd. 1961 BOGRA.

কায়রো

৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫১

আমিন,

তুমি লিখেছ, কায়রোতে গিয়ে আর যাই করি, প্রাচীন মিসরের সভ্যতা সম্বন্ধে যেন তোমাকে কিছু লিখে জানাই। কারণ তোমার মতে, অর্থাৎ কিনা তুমি যাঁদের বই পড়েছ তাঁদের মতে অমন পুরাতন সভ্যতা তো আর দুনিয়ায় জন্মায় নাই।

হ্যাঁ,মিসরের সভ্যতা যে সুপ্রাচীন তাতে সন্দেহের অবকাশ নাই; ওসম্বন্ধে দুচার কথা তোমাকে লিখবও। তবে একটা কথা।

কোন্ দেশের সভ্যতা কত প্রাচীন, আর সে প্রাচীন সভ্যতা কত বড় ছিল, তা নিয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। অত কালের ব্যাপার, মতভেদ তো থাকারই কথা। তার মধ্যে আবার প্রত্নতত্ত্ববিদ পন্ডিতেরা নিজেরা এ মতভেদ খানিকটা বাড়িয়ে তুলেছেন।

সাধারণতঃ যে দেশের সভ্যতার প্রতি যে পাণ্ডিতের মায়া আছে

তিনি সেই দেশের সভ্যতার বাপ-দাদার খোঁজ নিতে যান। মায়া মাত্রই মানুষের মনকে অল্পাধিক আচ্ছন্ন করে। সুতরাং সে দেশের প্রাচীন মহিমা কীর্তন ব্যাপারে তাঁর কাছে খানিকটা অতিরঞ্জন হওয়াই স্বাভাবিক। তা ছাড়া যিনি যে সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করেন, তাঁর আবিষ্কৃত তথ্য যত প্রাচীন হয়, ততই তাঁর নাম যশ। সুতরাং অজ্ঞাতসারে হলেও তাঁর হাতে তাঁর গবেষণার বিষয়ীভূত সভ্যতার বয়স বেড়ে যাওয়া মোটেই বিচিত্র নয়।

ছোট বেলায় সাধারণ পাঠ্য বইয়ে পড়েছি, গ্রীস রোম মিসরের সভ্যতা খুব প্রাচীন। এখন কিন্তু আরো অনেক দাবীদার এসে জুটেছে।

ধর, আমাদের মোহেনজোদারো আর হরপ্পার সভ্যতা। পন্ডিতেরা বলেন, এদুটি সভ্যতার বয়স কমছে-কম আট হাজার বছর। লক্ষ্য রেখো, এঁরা আট হাজার বছরের আগে খুব স্পষ্ট করে 'কমছেকম' শব্দটি এঁটে দিয়ে থাকেন, যাতে ভবিষ্যতে এদের বয়স নির্ধারণের নতুন কোন উপকরণ আবিষ্কারের ফলে অথবা অন্য কোন প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে বয়সের পাল্লা দেওয়ার প্রয়োজনে এদের বয়স বাড়িয়ে দশ বারো হাজার বছরে নিয়ে তুলতে কোন বাধাবিঘ্ন না ঘটে। ইরাকের উপর দিয়ে আসতে বছরায় কিছুক্ষণের জন্য নেমেছিলাম। সেখানকার এক পান্ডিত্যের দাবীদার বল্লেন, আমাদের বাবিলনীয়া, আসিরীয়া, নাইনেভ—এসব স্থানের সভ্যতার মত প্রাচীন সভ্যতা দুনিয়ার আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তাঁর উৎসাহ আবেগের গতিক দেখে মনে হল, একজন জোশীদাদিল মোহেনজোদারোওয়ালাকে তাঁর মোকাবেলা করে দিলে দুইজনে বিষম মারামারি লেগে যেত। আমার নিজেরই লোভ হচ্ছিল যে আমি ভয়ানক রেগে গিয়ে তাঁর সাথে বাহাছ শুরু করে দেই। কিন্তু বিদেশ বিভুঁই স্থান, লোকটাও দেখা গেল গোঁয়ার পত্তনের, আর আমিও অহিংসাব্রত গ্রহণ করে অনেক দিন অসহযোগ আন্দোলনে কাজ করেছিলাম, কাজেই

এ মহৎ সংকল্প কাজে পরিণত করার প্রচেষ্টা হতে ক্ষুব্ধ চিত্তে বিরত রইলাম।

বছরা হতে গেলাম বৈরুতে। বৈরুতওয়ালাদের দাবী শুনে তো চোখ চড়কগাছ! তারা বলে—দুনিয়াকে হরফ দিয়েছি আমরা, দুনিয়াকে নৌবিদ্যা দান করেছি আমরা, দুনিয়াকে দালান-ইমারত গড়তে শিখিয়েছি আমরা। আমি ভেবে ঠিকই পেলাম না, এরা কি আফলাতুনের ওস্তাদ-গোষ্ঠী, খোয়াজ খেজেরের বংশধর, না বিশ্বকর্মার নাতি নাতকুরের দল!

আঙ্কারার যাদুঘরে গেলাম। সেখানকার কর্তারা তাঁদের দেশের প্রাচীন সভ্যতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এর পর ইরান, চীন—এ সব দেশ তো আছেই।

আমি বলি, আমাদের পূর্ববাংলার সভ্যতাই দুনিয়ায় সবচেয়ে প্রাচীন। যে সভ্যতা যত প্রাচীন, তা মাটির তত গভীর তল হতে খুঁড়ে বের করতে হয়। অল্প প্রাচীন সভ্যতা ছিল অল্প মাটির নীচে, তা সহজে খুঁড়ে বের করা সম্ভব হয়েছে। আমাদের সভ্যতা বহু—বহু প্রাচীন: তা বহু—বহু গভীর মাটির তলে পড়ে গেছে। অত মাটির নীচে যাওয়ার ক্ষমতা যে দিন মানুষ অর্জন করবে, সেদিন সে দেখবে যে মাটির সেই অতল তলে আমাদের প্রাচীন সভ্যতার সুস্পষ্ট পরিচয় অক্ষত অবস্থায় রক্ষিত আছে।

নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কারের জন্য মানুষ মাটি খুঁড়ছে, সমুদ্রে ডুব দিচ্ছে, পর্বতের চূড়ায় উঠছে। এঁরা মনীষী—এঁরা জ্ঞানের বন্ধু—এঁরা মানুষের গৌরব। এ জ্ঞান আমাদের আজো অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। কাজেই আমার দেশ বা আমার জাতির সভ্যতাই দুনিয়ায় সব চেয়ে প্রাচীন, নিশ্চিত মনে এ দাবী করার সময় এখনো আসে নাই; কখনো আসবে কি না বলা যায় না। এমন অবস্থায় আমাদের মহানবীর কথা স্মরণ করে পথ চলাই শ্রেয়ঃ। তিনি বলেছেন—সকল মানুষ এক আদমের সন্তান, কাজেই তারা সমান, তারা ভাই ভাই। আর আদম মাটিতে তৈরী.

কাজেই কারো অহঙ্কার করবার কিছু নাই।

হ্যাঁ, এখন আমাদের মিসর ভ্রমণ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ শোন। বাস্তবিক যৎকিঞ্চিৎ ছাড়া এই সুপ্রাচীন দেশ সম্বন্ধে এই স্বল্প পরিসরে আর কিছুই বলা সম্ভব নয়।

নিকোশীয়া হতে রওনা হয়ে আমরা গত কাল রাত ৮॥ টার সময় কায়রো এসে হাজির হলাম। পাকিস্তান দূতাবাসের বন্ধুগণ বিমান বন্দরে উপস্থিত ছিলেন; তাঁদের সংগে গিয়ে শেফার্ডস্ হোটেলে উঠলাম।

হোটেলটির শেফার্ডস্ নাম শুনে মনে হল, ঠিক জায়গাতেই আমাদের স্থান হয়েছে। প্রথম কারণ ঃ আমরা যে কয়জন এখানে এলাম, তাঁরা কোন না কোন সময়ে এক কালে স্কুলে রাখালী করেছি। এখনো আমাদের অনেকের যে পেশা তা রাখালের কাজেরই অনুরূপ। দ্বিতীয় কারণ ঃ মিসরের ইতিহাসের প্রথম ঊষার ধূসর আলোকে এখনো যেন দৃষ্টির দিগন্ত রেখায় ধু ধু নজরে পড়ে যে সেকালের রাখালেরা নীল দরিয়ার পারে পারে মেষ চরিয়ে বেড়াচ্ছে। সে রাখালদের মধ্যে কত আমীর রইছ, কত পীর পয়গম্বর আছে কে জানে? মিসরের উজীর আর পয়গম্বর হজরত ইউছুফ,—তিনিও ছোট বেলায় ভাইদের সাথে মেষ চরাতে গিয়েছেন। আর এই মেষ চরান উপলক্ষে বাইরে না গেলে তাঁর হয়তো মিসরেও আসা হত না, মিসরে বনি ইছরাইলদের উপনিবেশ স্থাপনও ঘটে উঠত না। মিসরের ফেরাউনের জুলুমের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল আজাদী অভিযান চালিয়ে যিনি পরিণামে বনি-ইছরাইলদেরে উদ্ধার করে দেশে ফিরিয়ে আনেন, তিনিও প্রথম যৌবনে মেষ চরিয়ে খেয়েছেন। এই সেদিনও মিসরের আজাদীর জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যিনি অকাতরে চিরনির্বাসন দন্ড গ্রহণ করলেন, সেই আহ্মদ আল-আরাবীও নিজেকে রাখালের ছেলে বলে পরিচয় দিতে গর্ব বোধ করেছেন।

হোটেলে রাত্রিতে খাওয়ার পর মিসরের অতীত ইতিহাসের দিকে

ফিরে চাইলাম।

মনে হল, কেবল কায়রো নয়, সমস্ত মিসরই যেন সুদূর অতীতের সহস্র কীর্তির এক বিরাট যাদুঘর ঃ এমন বিচিত্র যাদুঘর বুঝি দুনিয়ার আর কোথাও নাই। এ যাদুঘর দুই-এক দিনের কথা দূরে থাক, দুই-এক মাসেও দেখে শেষ করা সম্ভব নয়।

ছোট বেলা হতে শুনে আসছি মিসরের নীল দরিয়ার কথা। সে দরিয়ার বুকে শিশু মুছার ভেলা ভাসে; সে দরিয়ার কিনারে দাঁড়ানো ফেরাউনের শাহী মহলের মহিলারা মুছাকে তুলে নিয়ে লালন পালন করেন। জালিমের পুরীতে এমনি করে তাঁর জানের দুষমন ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে। তারপর বাধে সংগ্রাম ঃ একদিকে উদ্ধত জালিম বাদশা, অন্যদিকে সত্য-অভিসারী আজাদী যোদ্ধা। একদা আল্লার গজবে নীল দরিয়ার সমস্ত পানি রক্ত হয়ে যায়, জালিম ফেরাউন প্রমাদ গণে আপোশের প্রস্তাব পাঠায়, অনুতাপ করে, পানির রক্ত চলে যায়। কিন্তু ফেরাউনের মন আবার কঠিন হয়, আবার শুরু হয় তার অকথ্য জুলুম। আবার গজব নেমে আসে ঃ নীল দরিয়ার পানি হতে বেরিয়ে আসে লাখে লাখে ব্যাঙ ঃ ছোট ব্যাঙ, মাঝারি ব্যাঙ, বড় ব্যাঙ। ব্যাঙে ব্যাঙে ফেরাউনের লোক-লশকরের ঘর দুয়ার ছেয়ে যায়। তাদের ঘরে ব্যাঙ, বাইরে ব্যাঙ, বিছানায় ব্যাঙ, বালিশে ব্যাঙ, কলসে ব্যাঙ, গেলাসে ব্যাঙ, চুলায় ব্যাঙ, হাড়িতে ব্যাঙ। ব্যাঙের জ্বালায় বাদশা অস্থির, উজীর নাজীর অস্থির, সৈন্য অস্থির, সামন্ত অস্থির, দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা অস্থির। আবার ফেরাউন সন্ধির প্রস্তাব পাঠাতে বাধ্য হয়। তখন নীল দরিয়াকে বাদ দিয়ে মিসরের কথা কল্পনা করা আমাদের পক্ষে কঠিন ছিল। আসলেও নীল দরিয়া না থাকলে মিসর দুই একটা মরূদ্যান সহ একটা মরুভূমি হয়েই পড়ে থাকত; যুগে যুগে নব নব সভ্যতার লালন ভূমি হতে পারত না, তার বুকে নব নব সাম্রাজ্যের উত্থান সম্ভব হত না। ৪২০০ মাইল লম্বা নীল নদী আবিসিনিয়ার উর্বরা

পলি বয়ে এনে বর্তমান মিসরের সৃষ্টি করেছে। মিসর নীল দরিয়ার দান।

মিসরের ইতিহাসের প্রথম যুগের দিকে আবার নজর ফিরে যায় ঃ তার জীবন ধারার অনুসরণ করে।

নীল নদী। শীত ও বসন্ত ঋতুতে ক্ষীণকায়া হয়ে পড়ে, মরার মত ধীরে ধূলিময় উপত্যকার ভিতর দিয়ে কষ্টে চলে। তারপর আসে গ্রীষ্ম কাল। নদী ফুলে উঠতে শুরু করে, ভৈরব-গর্জনে উন্মত্তের মত বিপুল তরঙ্গ বিক্ষেপে সমুদ্রের দিকে প্রধাবিত হয়; পানির রং কখনো শুধু ঘোলাটে, কখনো রক্তের মত লাল, কখনো বা সবুজ: পানি পার ছাপিয়ে ওঠে, দুই পাশের প্রান্তর ডুবিয়ে দেয়, পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে তবে থামে।

নদীর এ দৃশ্যে মিসরীয়রা আনন্দ কোলাহলে মেতে ওঠে। তারা হাত তুলে তাদের দেবতাদেরে কৃতজ্ঞতা জানায়। রং-বেরং-এর পাল তুলে গ্রামবাসীরা নৌকায় গ্রাম হতে গ্রামান্তরে যায়। এই প্লাবন মরুর বুকে যে অসম্ভব উর্বরতা এনে দিবে আর তার ফলে ক্ষেতে যে সোনা ফলবে, তারই কল্পনায় তারা আনন্দে আত্মহারা। তারা মেলা জোটায়, নৌকা বাইছ খেলে, কুশতী লড়ে, চারণেরা একতারা হাতে গেয়ে ফিরে, বাপেরা পুতুল কিনে, স্বামীরা দুল খরিদ করে, শাদা পোষাক-পরা পুরোহিতেরা স্তোত্র গাইতে গাইতে নদীর পারে যায়, সোনার অর্ঘ পানিতে অর্পণ করে।

বাসিন্দারা মাত্র মাস চারিকের পরিশ্রমে সারা বৎসরের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করে নেয়; বাকি সাত আট মাস থাকে তাদের হাতে। এই সুপ্রচুর অবসর তারা প্রয়োগ করে তাদের আত্মোন্নতির বিভিন্ন প্রচেষ্টায়। তাদের মধ্যে সভ্যতা জন্ম লাভ করে।

তখনো বাকি দুনিয়ার সাথে মিসরের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই। তখনো তারা সমুদ্র আর মরুভূমির আঙিনার মধ্যে তাদের উপত্যকায় আবদ্ধ। কাজেই যে বৎসর নীল দরিয়ায় জোয়ারের অভাব হয় সে বৎসর বাসিন্দাদের অভাব আর দুঃখের অন্ত থাকে না। হাজারে হাজারে তারা

উপবাসে প্রাণ ত্যাগ করে, বাকিরা অনশনে অনশনে কঙ্কালসার হয়ে পড়ে। আকালের কবল হতে বাইরের জগতে পালিয়ে যাওয়ার কোন পথই তাদের জানা নাই।

অভাবই উদ্ভাবনের জননী। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মিসরীয়রা তখন ভাবতে শুরু করে, নীল নদীকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না? কেন সে তার খোশ খেয়াল মত একবার দেশে সৃষ্টি করবে অফুরন্ত প্রাচুর্য, আবার দেশকে বিরান করবে দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর অভিশাপে? এই চিন্তা হতে আসে সাধনা, সাধনা হতে আসে মিসরীয়দের আয়ত্তে পানি নিয়ন্ত্রণের বিজ্ঞান—হাইড্রলিক্স। অতিরিক্ত প্লাবনের বছরের পানি তারা বড় বড় হ্রদের মত জায়গায় জমিয়ে রাখে, তারপর যে বছর নীল নদীতে জোয়ারের অভাব হয়, সে বছর সেই জমিয়ে-রাখা পানির সাহায্যে ক্ষেতে শস্য উৎপাদন করে, নদীর চেয়ে উঁচু যে-সব জায়গা, সেখানেও তারা এই বিজ্ঞানের বলে পানি নিয়ে যায়। নীলের প্লাবনের সঙ্গে আসে বিপুল পরিমাণ পলিমাটি, এই মাটি ক্ষেতের আইল-বাতর মাঝে মাঝে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে। এই বিপদ হতে মুক্তি দানের জন্য তাদের মধ্যে উদ্ভূত হয় জরিপ বিজ্ঞান। প্লাবন কখন থেমে যায়, কখন কমে, কখন বা ফেঁপে ওঠে, এসব পর্যবেক্ষণ করতে করতে তারা দেখে—চাঁদ, সূর্য, তারার গতিবিধি. উদয়-অস্তের সাথে প্লাবনের সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তারা আবিষ্কার করে জ্যোতির্বিজ্ঞান। কৃষিকাজ হয়ে ওঠে বৈজ্ঞানিক ব্যাপার। ক্ষেতের উপর কয় হাত পানি কতদিন থাকলে সে ক্ষেতে কয় মণ শস্য উৎপন্ন হবে. তা তারা ক্ষেতে পানি থাকতেই গুণে গেথে কয়ে দিতে পারে।

এমনি ভাবে দেশে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উদ্ভব হয়। প্রথমে তারা মাতব্বরী করেই তুষ্ট থাকে; কিন্তু কালক্রমে এরাই হয়ে ওঠে পুরোহিত, উজীর, নাজীর ও রাজাবাদশা। এদিকে উপত্যকা দেশের এই ঐশ্বর্য-প্রাচুর্য মরুবাসী বেদুঈনদের প্রলুব্ধ করে; তারা সুযোগ বুঝে হঠাৎ

হামলা করে লুঠপাট শুরু করে দেয়। ফলে আত্মরক্ষার জন্য একদল যোদ্ধার সৃষ্টি হয়—এরাই হয়ে ওঠে ক্রমে দেশের ক্ষত্র সম্প্রদায়। বাহু-বল-জীবী ও মস্তিষ্ক-বল-জীবীরা অতঃপর মিলেমিশে জনগণের উপর প্রভুত্ব পরিচালন করতে থাকে। রাজা তার ইচ্ছা ইশারায় জানায়, পুরোহিত তা শাস্ত্রবচনের ভাষায় দেবদেবীর নামে প্রচার করে, যোদ্ধাশ্রেণী বর্শা তলোয়ার হাতে সেই শাস্ত্রাদেশ কাজে পরিণত করে। ক্রমে জনগণ প্রভু সম্প্রদায়ের গোলামে পরিণত হয়ে পড়ে। প্রভু সম্প্রদায় ধীরে ধীরে বিলাসী হয়ে ওঠে; বিলাসের উপকরণ দেশ বিদেশ হতে সংগ্রহের তাগিদে যোদ্ধাশ্রেণী হয়ে পড়ে পরদেশ আক্রমণকারী—বিজয়ী বীর। বিদেশ হতে আসে ধন, আসে গন্ধ-দ্রব্য, আসে যুদ্ধবন্দী গোলাম বাঁদী, তারা প্রভু সম্প্রদায়ের আরাম আয়েশের জোগান দিতে শুরু করে। পুরোহিতেরা আর আগেকার মত সাদাসিধা জীবন যাপন করতে রাজী নয় ঃ তাদের মন্দিরে জ্বালানের জন্য এখন বহুমূল্য গন্ধ-দ্রব্য চাই; হাতীর দাঁতের আছবাবপত্র ছাড়া অভিজাতদের আর চলে না; বড় ঘরের মহিলাদের অংগ এখন হীরা জহরতে ঝলমল না করলে মানায় না; মহিলাদের সামনে থাকা দরকার আবলুসের মত কালো রং-এর চাকরাণী—তাদের তুলনায় তাদের কর্ত্রীর রূপ যাতে ভাল রকমে খোলে। এই সব বিলাস উপকরণ সরবরাহের জন্য দেশে জেগে ওঠে গন্ধ-দ্রব্য শিল্প, বস্ত্র শিল্প, সুরা শিল্প, বাসন শিল্প। দেশ বিদেশে মিসরের নাম ছড়িয়ে পড়ে। পুরোহিত শ্রেণী তাদের পদ ও মর্যাদা রক্ষণে চিন্তিত হয়ে ওঠে; সে জন্য করে তারা নব নব পথের উদ্ভাবন। ধর্মকে করে তোলে তারা কঠিন, জটিল, হেয়ালীময়; মন্দির ও ধর্মোৎসবকে করে তোলে ঐশ্বর্য ও জাঁক-জমকে বিস্ময়কর; জোয়ার ভাটা, প্লাবন, চন্দ্র সূর্যের উদয়-অস্ত সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী দ্বারা জনগণের চিত্তে করে সম্মোহন সৃষ্টি। ধীরে হায়ারোগ্লিফীক হরফের জন্ম হয়। বিদ্যা চর্চাকেও রাখে তারা যখের ধনের মত অভিজাতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

মন্দিরের রূপসজ্জা করতে গিয়ে চিত্র-শিল্প জন্মলাভ করে। রাজারা কথায় থাকে সর্বেসর্বা—দেবতাদের ক্ষমতায় ক্ষমতাপন্ন, কিন্তু আসলে তারা হয়ে পড়ে পুরোহিতদের নিয়ন্ত্রণের অধীন। তাদেরই দেওয়া শাস্ত্রের বিধান মতে রাজাকে চলাফিরা করতে হয়। সকালে উঠে রাজা চিঠিপত্র তছদীক ও রওনার কাজ করে, তারপর সে যথাযোগ্য পোশাক পরে মন্দিরে গিয়ে পূজা অর্চনা করে, অতীত রাজাদের মহান কীর্তি-কথা ও দুষ্কৃতির বর্ণনা করে পুরোহিত বক্তৃতা দেয়, রাজা কি কি খাদ্য খাবে, তার পেয় সুরার পরিমাণ, তার অন্দরে যাওয়ার সময়, এসব ধর্মযাজকেরা ঠিক করে দেয়। রাজা মরে গেলে দেশময় শোকের অভিনয় হয়,—বাহাত্তর দিন পর্যন্ত মন্দিরের দুয়ার বন্ধ থাকে, কান্নাকাটিতে আকাশ বাতাস ভরে ওঠে, কেউ উপবাস করে, কেউ কেউ বা সাময়িকভাবে মদ, মাংস, স্নান ও প্রসাধন ছেড়ে দেয়, অতিভক্তেরা অন্দর মহল হতে দূরে থাকে। পুরোহিতেরা রাজার রোজনামচা লিখে, দেশের ইতিহাস প্রণয়ন করে, কবরের উপর শিলা-লিপি অঙ্কন করে, রোগীকে ঔষধ দেয়, চিকিৎসা শাস্ত্রের উদ্ভাবন করে, মৃতের দেহের উপর পবিত্র মালিশ লেপে দেয়।

বিচারে এ সমাজ নিরপেক্ষ ও নির্ভীক। কেউ নিজ গোলামকে হত্যা করলেও তার শাস্তি মৃত্যু। গর্ভবতী স্ত্রীলোকের মৃত্যুদণ্ড হলে নিষ্পাপ শিশু ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত সে নারীর মৃত্যুদণ্ড মউকুফ থাকে। সমাজ নারীকে যথাযোগ্য মর্যাদায় ভূষিত করে। বিচারকেরা উচ্চহারে বেতন পায়, যেন লোভ সহজে তাদের কাছে না ভিড়তে পারে। তাদের গলায় সোনার চিকন শিকলে ঝুলান থাকে সত্যের ছোট্ট মূর্তি। তারা মৃতেরও বিচার না করে ছাড়ে না। লাশ প্রলেপ-প্রকোষ্ঠ হতে ফিরে এলে তাকে রাখা হয় একটি ফুলে-ঢাকা বাক্সে, বাক্স রাখা হয় একটি গাড়ীতে, গরু সেই গাড়ী টেনে নিয়ে চলে পবিত্র হ্রদের পারে। লাশের অনুগমন করে মৃতের আত্মীয় বন্ধুরা; পুরুষেরা মাথা মুড়ে

ফেলে, মুখে ধুলো নিক্ষেপ করতে থাকে, মেয়েরা বুকে করাঘাত করে ও শোক সংগীতে আকাশ বাতাস উতলা করে তোলে। হ্রদের তীরে বিয়াল্লিশ জন বিচারক অর্ধচন্দ্রাকারে বসে; উপস্থিত জনতা চারদিক ঘিরে দাঁড়ায়। তাদের সামনের পানিতে বাঁধা থাকে একটি ছোট্ট খেয়া নৌকা, নৌকায় অপেক্ষা করে অন্তিমের মাঝি। হ্রদের অপর পারে দেখা যায় মরুময় ভূখন্ড—তার কিনারে ছোট ছোট পাহাড়, সেই পাহাড়ে মৃতদের থাকবার গুহা মুখ ব্যাদান করে আছে। উপস্থিত জনতার মধ্য হতে যদি কেউ মৃতের বিরুদ্ধে নালিশ করে, তবে তখনি তার বিচার শুরু হয়। অভিযোগ সপ্রমাণ হলে লাশ ফেলে জনতা ধীরে যার যার পথে ফিরে যায়। অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হলে ফরিয়াদীর শাস্তি হয়; উপস্থিতদের কেউ কেউ মৃতের জীবনের সৎকাজের প্রশংসা কীর্তন করতে থাকে, বাকিরা শোনে, হয়তো বা হাততালি দেয়, বলে, মৃত নিশ্চয় সত্য-নিষ্ঠদের দরবারে স্থান পাবে। তারপর লাশের বাকস খেয়া-তরণীর উপর স্থাপিত হয়; মাঝি গম্ভীর ভাবে লাশ নিয়ে অপর পারের দিকে বেয়ে চলে; সংগে থাকে পুরোহিত—সে পবিত্র বচন আবৃত্তি করে; অবশেষে লাশ তার শেষ বিশ্রাম স্থানে রক্ষিত হয়। জনতা মৃতের গুণকীর্তন করতে করতে ঘরে ফিরে যায়।

অভিজাতদের লাশের পাষানময় কবর-কক্ষের গায় উৎকীর্ণ হয় তাদের জীবনের কীর্তিকাহিনী, অংকিত হয় সুন্দর লতা পাতা ফুল ফলময় বিবিধ চিত্র। এমনি ভাবে বিত্তশালীদের কবর হয়ে ওঠে বিচিত্র চিত্রশালা।

কিছুকালের জন্য মিসরে বেদুঈনদের উৎপাত শুরু হয়। তাদের স্বাধীনতাও হয়ে পড়ে বিপন্ন। কিন্তু মিসরীয়রা ফের তাদের আজাদী ফিরে পায়। মিসরে শুরু হয় সাম্রাজ্যের যুগ। কেবল সাম্রাজ্য স্থাপন করে মিসরীয়রা তুষ্ট থাকে না; তাদের বিজয় বৈজয়ন্তি এসিয়ার দেশে দেশে উড্ডীন করে, তাদের রণতরীর বহর ভারত মহাসাগরেও টহল দিয়ে

ফিরে। মিসর অপূর্ব সভ্যতা ও ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

মিসরের রাজা বাদশাদের কথা এক নিশ্বাসে বর্ণনা করতে গেলে বলতে হয় ঃ—

এর ঐতিহাসিক বাদশাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিলেন মিনিস (খৃঃপূঃ ৩৩০০)। তার পর শুরু হয় ফেরাউনী যুগ (খৃঃপূঃ ২৭৭৮—২৩০০)। পীরামিডগুলি এই যুগের অমর কীর্তি। এর পর একে একে চারটি যুগ চলে যায়। তারপর আসে রোমক যুগ (খৃঃপূঃ ৩০—৩২৮ খৃষ্টাব্দ)। রোমক যুগের পর আসে খৃষ্টীয় যুগ (৩২৮—৬৪০ খৃষ্টাব্দ)। এর পর ৬৪০ খৃষ্টাব্দে শুরু হয় আরবীয় যুগ; এই যুগ মামলুক যুগের সঙ্গে মিলে চলে ১৫৭১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। তারপর আসে তুর্কী যুগ (১৫১৭—১৮৪১ খৃষ্টাব্দ)। সর্বশেষে ১৮৪১ সালে আরম্ভ হয় মুহম্মদ আলী যুগ ঃ আজো তাঁরই বংশধরেরা মিসরে প্রভুত্ব করে চলছে।

সিন্ধু সভ্যতা ও ইউফ্রেতীস সভ্যতা ছাড়া মিসরীয় সভ্যতার মত প্রাচীন সভ্যতা দুনিয়াতে আর একটিও আছে বলে মনে হয় না। খৃষ্ট পূর্ব ৩৩০০ সাল হতে মিসরীয় সভ্যতার ইতিহাস পাওয়া যায়। কিন্তু আদিম সভ্যতার আরম্ভ এরো অনেক আগে।

আগে বলা হয়েছে, প্রাচীন মিসরীয়রা যে লিখন পদ্ধতি আবিষ্কার করে, তার নাম হায়ারোগ্লিফীক্স্ ঃ ছবি এঁকে এঁকে এই রচনা তারা লিখত। খৃষ্টধর্ম গ্রহণের পর মিসরীয়রা রোমক হরফ গ্রহণ করে। আরবেরা মিসর জয় করার পর মিসরীয়রা আরবী হরফে লেখা শুরু করে। আধুনিক যুগে বহু কাল পর্যন্ত হায়ারোগ্লিফীক্স কেউ পড়তে পারত না। তাই জটিল, অবোধ্য, হেঁয়ালী গোছের কোন কিছু হলেই লোকে বলত—ওটা হায়ারোগ্লিফীক্স। অবশেষে কিন্তু এ রহস্যের দুয়ার উদঘাটিত হয়েছে। চ্যামপোলিওন নামক একজন ফরাসী পন্ডিত এই ভাষা পড়ার পথ আবিষ্কার করে ফেলেছেন। এই সময় হতে হায়ারো-

গ্লিফীক্সের সাহায্যে মিসরের প্রাচীন যুগের অনেক সমস্যার সমাধান হয়েছে।

৮ই সেপ্টেম্বর সকাল বেলায় আমরা পিরামিড দেখতে চল্লাম। শহর হতে বের হওয়া মাত্রই পিরামিড চোখে পড়ল। মনে হল, দূরে মরুভূমির বুকে ছোট বড় তিনটি পাহাড় খা-খা রোদের নীচে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে ঃ তিনটি নিষ্করুণ পাষাণের সন্ন্যাসী—লতাপাতা হীন, ফুলফল হীন, পশুপাখী হীন। আস্তে আস্তে কাছে গেলাম। মোটর হতে নামা মাত্র কেউ গাধা, কেউ খচ্চর, কেউ ঘোড়া, কেউ ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে এসে হাজির। চড়ুন—চড়ুন—চড়ুন!—টানাটানি করার জো আর কি! কেউ কেউ খালি খালি এসে হাজির—গাইড্ হতে চায়; তারা সব দেখাবে, সব বুঝাবে, ইতিহাসের সমস্ত গূঢ় তত্ব বলে দিবে। কেউ কেউ নিয়ে আসে পিরামিড, ফিনক্স বা মমীর পুতুলের মত ছোট কৃত্রিম মূর্তি—বিক্রী করতে; প্রচার করে মূর্তি ঘরে রাখার মহিমা—ভূত-প্রেত, দেও-দৈত্য কেউ কাছে আসতে পারে না। আমি ভাবলাম—মমী নিজে তা হলে না জানি কত বড় শক্তিশালী দৈত্য যে তার ছোট্ট একটি মূর্তি নিকটে থাকলে তার ভয়ে যক্ষ রক্ষ কেউ কাছে ভিড়তে সাহস পায় না। কিন্তু অবশেষে এক দিন এই মমী-দৈত্য তো মনীবের ঘাড় মুচড়ে ভেঙ্গে পলায়ন করবে না? কিন্তু মমীওয়ালাদেরে একথা বলবার মত হিম্মত জুটিয়ে উঠতে পারলাম না।

আমাদের এই অজানা সেবা-উৎসাহী বন্ধুদের জোরাজুরিতে আমাদের কেউ কেউ বিরক্তি প্রকাশ করলেন: ধমক দেওয়ার কথাও মনে মনে সংকল্প করলেন। তা করবারই কথা। আমার কিন্তু রাগ হল না; বিরক্তিও বোধ করলাম না। আমি মনে মনে গভীর ব্যথা বোধ করলাম। আমি দেখলাম—এই একদল লোক, তাদের স্বাস্থ্য আছে, বয়স আছে, উদাম আছে, তাদের পরিশ্রম করে দুটি হালাল রুজী রোজগার করে মুখে দেওয়ার আকাঙ্খা আছে—ভিক্ষা তারা চায় না, অনুগ্রহ তারা মাগে

না, তারা চায় হকপথে পরিশ্রম করার একটু সঙ্গত সুযোগ। সে সুযোগ সরকার এদেরে দেয় নাই, সমাজ এদেরে দেয় নাই; এরা মেহনত করতে চেয়ে বদলে পায় ভ্রূকুটি। কিন্তু কেন এই ব্যবস্থা? অন্যায় কারা বেশী করে?—এরা, না তারা যারা দেশের মা বাপ সেজে দেশের এ সন্তানদেরে অকাতরে দুঃখের দরিয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে নিজেরা পরম আরামে বিলাসে মেতে আছে? এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার সময় ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে। জবাব এর একদিন দিতেই হবে। তবে সে বাধ্যকরী জবাব আসার আগে এ অভাগারা কাজ-চাওয়ার বিনিময়ে ভ্রূকুটি লাভ করেই চলে যাবে, সে নতুন জামানা দেখে যেতে পারবে না। আফছোছ!

এদের মধ্য হতে আমরা কোন গাইড্ নিলাম না। দূতাবাসের বন্ধু যাঁরা সাথে এসেছিলেন, তাঁরাই গাইডের কাজ করার ভার নিলেন। আমরা হেঁটে হেঁটেই সব দেখতে শুরু করলাম। মোঃ তমিজুদ্দীন খাঁ সাহেবের পায় বাত আছে, তাই তিনি কিছুক্ষণ হাটার পর একটি ঘোড়ার গাড়ী নিলেন।

আমরা যে পিরামিডগুলি দেখতে গেলাম, তাদেরে বলে গীজার পিরামিড। এদের মধ্যে যেটি সবচেয়ে বড়, আমরা তাতে উঠতে গেলাম —উপর দিয়ে নয়, ভিতরের পথে। পাহারাওয়ালা এসে দুয়ারের তালা খুলে দিল। পাথর-ভাঙ্গা পাহাড়ের অসমান পথ, কিন্তু মাথা খাড়া করে চলা যায়। শুনলাম পথের এই অংশ চোরদের তৈরী। তারা এই পথে গিয়ে বাদশা বেগমদের কবরের মালমাত্তা চুরি করেছে। খানিক দূরে গিয়েই পেলাম সুন্দর সরল মসৃণ পথ। এ পথ পিরামিডের সঙ্গে তৈরী। কিন্তু পথ বড় সরু, মাথা নীচু করে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই; অসাবধানে মাথা একটু উঁচু করলেই চাঁদির উপর পাথরের ঠোক্কর লাগে। আমার মাথায় কয়েকবার ঠোক্কর লাগল। চাঁদিতে হাত বুলাতে বুলাতে ভাবলাম, হায়, প্রভুত্ব পিয়াসী বাদশা! তুমি কমছে-কম সাড়ে চার হাজার বছর আগে অক্কা পেয়েছ, তবু আজো তুমি আমাদের কাছ থেকে জবর-

দস্তী মূলক ভাবে আমাদের এই মস্তক-অবনতি আদায় করে নিচ্ছ! চোরেরা স্বাধীন; তারা মাথা খাড়া করে চলার পথই ভেঙ্গে বের করেছে; কিন্তু রাজার ভক্ত আমলারা উজীর নাজীর হলেও চাকর ছাড়া তো আর কিছু নয়; তাই তারা বিগত মনিবের লাশের কাছেও মাথা নত করার এই হেকমতী কল বানিয়ে রেখেছে।

চলার পথে মাঝে মাঝে বিজলী বাতি লাগানো আছে; নইলে বিষম অন্ধকারে এক কদমও এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হত না। বেশ খানিক দূর উঠে আমরা উপস্থিত হলাম মহারাণীর শেষ শয়ন শয্যার পাশে। মস্ত কোঠা, সুনির্মিত, তারই একপাশে রাণীর শূন্য শয্যা। এখন কিছু নাই; হয়তো মমী ছিল; চোরে নিয়ে গিয়েছে। তারপর আবার চল্লাম। এবার উঠলাম গিয়ে মহান সম্রাটের সমাধি পাশে। এ কোঠা আরো বড়, আরো সুনির্মিত, কিন্তু শয্যা তেমনি শূন্য—একই কারণে।

কিন্তু চোরেরা এত মেহনতে পাথর ভেঙ্গে পথ করে কেন পিরামিডে আসে? কি জিনিসের উপর তাদের এত লোভ?

আজ হতে সাড়ে চার হাজার বছর আগে মিসরে ফেরাউনী বংশের বাদশারা শাসন দণ্ড পরিচালন করতেন। পিরামিডগুলি তাঁদেরই সমাধি মন্দির। ছোট বড় প্রায় আশিটি পিরামিড এখনো বর্তমান। পিরামিড যুগের মিসরীয়রা ছিল নিতান্ত ধর্মপ্রাণ। তারা পরকালে বিশ্বাস করত। ভাবত, মৃত্যুর পর আত্মা মানুষ কিংবা অন্য প্রাণীর দেহ ধারণ করে বেঁচে থাকবে। কিন্তু আত্মাকে বেঁচে থাকতে হলে দুটি শর্ত পালন করতে হবে। প্রথমতঃ শরীরকে একদম ধ্বংস হতে দেওয়া যাবে না, দ্বিতীয়তঃ মাইয়াতকে তার নাম ভুলে যেতে দেওয়া যাবে না। এইজন্য মিসরীয়রা মৃতদেহকে মমীতে পরিণত করে খুব নিরাপদ স্থানে রেখে দিত, আর সে সমাধিমন্দিরের গায় বহুস্থানে মৃতের নাম লিখে রাখত। পাহাড়ের মত এই পিরামিডগুলি সেকালের মিসরীয় রাজা বাদশাদের সমাধি স্থান। মৃত্যুর পর বাদশা বেগমের যাতে কোন অভাব বা তকলীফ না হয় সেজন্য

তাদের মমীর সংগে কবরে দেওয়া হত বহুমূল্য হীরা জহরত। কেউ কেউ মনে করেন, বাদশা বেগমের খেদমতের জন্য তাঁদের গোলাম বাঁদীকে হত্যা করে মনীবের সংগে কবরে দেওয়া হত। বড় পিরামিডের কাছে সেকালের একটি মন্দির আজো বর্তমান। হয়তো অভাগা অভাগিনীদেরে এই পবিত্র মন্দিরে এনে দেবতার সামনে হত্যা করা হত—মনীবের কবরে দেওয়ার জন্য।

মমী সম্বন্ধে দুটি কথা বলতে হয়। প্রাচীন মিসরীয়রা বিশেষ রকম কোন বৈজ্ঞানিক উপায়ে অভিজাতদের দেহ রক্ষা করত, পঁচতে দিত না। মানুষের এই শুকনো দেহকে সাধারণতঃ মমী বলা হয়। ঠিক কি পদ্ধতিতে মমী করা হত, তা এখন কারো জানা নাই। তবে নানা সূত্রে যতটুকু বুঝতে পারা যায়, তাতে মনে হয়, নিম্নরূপ উপায়ে মমী তৈয়ার করা হত ঃ

প্রথমে মৃতের দেহ হতে নাড়ীভুড়ী সমস্ত বের করে ফেলা হত। তবে কলজেটা সাধারণতঃ রেখে দেওয়া হত। তারপর বিশেষ রকম এক যন্ত্রের সাহায্যে নাক দিয়ে মগজ বের করে আনা হত। এর পর ৭০ দিন পর্যন্ত কোন এক আরকের মধ্যে দেহ ডুবিয়ে রাখা হত। তারপর করাতের গুড়া, খড় অথবা কোন মসলা দিয়ে দেহ ভরা হত। এর পর দেহকে খুব হালকা ভাবে ব্যাণ্ডেজ করে সিন্দুক বিশেষে একান্ত হেফাজতে রক্ষা করত।

পিরামিডগুলি আগাগোড়া বড় বড় পাথরে তৈরী। কি কৌশলে এই বিরাট পাথরখণ্ড—একটি দুটি নয়, হাজারে হাজারে, হয়তো বা লাখে লাখে,—হাঁ, কি হেকমতে এদেরে মিসরীয় ওস্তাগরেরা এত উপরে তুলেছিল, তা আজো জগতের বিস্ময়। কেউ কেউ মনে করেন, সেকালের লোকে এ কাজে কাঠের ক্রেন ব্যবহার করত। আবার অন্যেরা বিশ্বাস করেন, কাঠের ক্রেনে এই অসংখ্য পাথর অত উপরে তুলবে এ সম্ভবপর নয়। বরং সম্ভব এইটে ঃ পিরামিডের গোড়ার দিক খানিকটা পাথর

দিয়ে মজবুত করে গেঁথে সেই পর্যন্ত তারা মাটি দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। তারপর সেই তোলা মাটি পিটিয়ে পিটিয়ে শক্ত করে তার উপর দিয়ে কতকগুলি পাথরখণ্ড উপরে টেনে তুলেছে ঃ হয়তো হাজার হাজার যুদ্ধ বন্দী বা গোলাম এই কাজে মোতায়েন ছিল। আর এক স্তর পাথর গাঁথা হলে আবার তারা মাটি তুলে তা ঢেকে দিয়েছে; আবার তার উপর দিয়ে পাথর উপরে টেনে তুলেছে। এমনি ভাবে গোটা পিরামিডটির নির্মাণ শেষ করে অবশেষে তার গা হতে মাটি কেটে দূরে ফেলা হয়েছে।

কেবল বিপুল আয়তনের দিক দিয়ে নয়, আর্টের দিক দিয়েও পিরামিড জগতের অন্যতম বিস্ময় হয়ে আছে। সে আমলে এত অদ্ভুত সুন্দর স্থাপত্য কৌশলের নিদর্শন নাকি দুনিয়ার আর কোথাও নাই।

পিরামিডের উদর হতে যখন বের হলাম, তখন বাইরে রোদ খা—খা করছে। মিসরের মরুভূমির প্রচণ্ড সূর্য, তাও আবার সেপ্টেম্বর মাস, এদিকে বেলা তখন প্রায় এগারটা;—মনে হল উপর হতে আগুনের শ্বেত ফুলকি অবিরাম ঝরে পড়ছে। আমার সাথে ছাতা ছিল না। কাজেই খালি মাথা নিয়েই সেই আগুনের ভিতর দিয়ে ফিন্‌ক্স দেখতে হেঁটে চল্লাম।

ঘোড়াওয়ালারা অনেক সাধাসাধি করল; কিন্তু আমরা তাদের অনুরোধে কর্ণপাত করলাম না। আমার নিজের মনের কথা গোপনে বলতে দোষ নাই ঃ মনে হচ্ছিল, কত কাল ঘোড়ায় চড়ি নাই; আজ এই এতগুলি বিদেশী মানুষের সামনে ঘোড়া যদি আমাকে অকারণে অকস্মাৎ ফেলে দেয়, তবে আমার সাথীরা বড় শরম পাবেন। আমার সাথীদের দিলেও যে পড়ে যাওয়ার অমন একটা দহ্‌শত নিতান্ত নিদারুণ ভাবেই বিদ্যমান ছিল, তা আমি স্পষ্ট টের পেলেও ভদ্রতার খাতিরে দুনিয়ার কাউকে বলব না। ঘোড়ার চেয়ে গাধায় চড়া অবশ্য সহজ ছিল। গাধাগুলি ছোট, নিরীহ, আর তার পিঠে গদী এমন আটশাট ভাবে বাঁধা যে দুই হাতে ধরে কষ্টে-সৃষ্টে ব্যালেন্স ঠিক রাখা চলে। কিন্তু সামনে ঘোড়া থাকতে

গাধায় চড়া—এ আমাদের ইজ্জতে বিষম বাধল; বিশেষতঃ যখন দেখলাম যে দুটি মেম সাহেব নির্বিবাদে বড় বড় দুটি ঘোড়ায় চড়ে আমাদেরই পাশ দিয়ে গ্যাট গ্যাট করে চলে গেলেন। আমরা অবশ্য মনে মনে মেম সাহেবদেরে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বল্লাম—চেয়ে দেখ, আমরা স্নিগ্ধ শ্যামল মোম-হেন নরম সমতল দেশের মানুষ হলেও এ নির্মম মরু সূর্যকে মোটেই পরোয়া করি না; এ নিঠুর পাথরের ভুঁইকে আমরা পায়ের তলে অবহেলে দলে চলে যাই। আমাদের এই বীরোচিত কাজের ফলে মেম সাহেবদের মনে আমাদের সম্বন্ধে যে ভীষণ সম্ভ্রম পয়দা হয়েছিল, সে বিষয়ে আমাদের কারো দিলে শক-শোবা নাই। কেবল মিসরীয় ঘোড়াওয়ালারা আইন ঘাইন ও বড় কাফের যথাযথ মোখরেজ আদায় করে রাগত ভাবে যা বলেছিল তার মর্ম বুঝি ছিল এই ঃ কোথাকার কিপ্পনের কুটুম এই লোকগুলোরে? একজন ছাড়া বাকি সবাই কারুনের ছেলের মামার দল নাকি?

ফিন্ক্সের কাছে গেলাম। সে এক বিরাট পাথরকাটা দেবমূর্তি। মনে হল, কি বিরাট কল্পনাই না ছিল এই মিসরীয় বাদশাদের! এরা মরণপুরে যাত্রা করতেও লোক-লশকর, নফর-বাঁদী, হীরা-জহরত নিয়ে ধুমধামে গিয়েছে। আর কি বিরাট সে মরণপুরী! কোন মানুষের তৈরী চাঁদোয়ায় সে সমাধি ঢেকে রাখে নাই; অনন্ত আকাশ তার উপর নীল সামিয়ানা টানিয়ে রেখেছে। কোন মোমবাতি, কোন ফটিক-ঝাড়ে সে গোরস্তানের আলোর ব্যবস্থা হয় নাই; দিনের বেলায় সূর্য তার উপর বহিয়ে দেয় আলোর মুক্ত প্লাবন, রাত লাখো লাখো তারার বাতি জেলে রচনা করে তার আলোক সজ্জা। সমাধির চারদিকে কোন ভঙ্গুর দেয়ালের সংকীর্ণ সীমা নাই, আছে কেবল অন্তহীন মরুর বিস্ময়কর বিথার; তার অফুরন্ত হাওয়া অনুদিন এ মাজারে ব্যাজন করে ফিরে। যেমন বিরাট এদের কবরস্তান, তেমনি বিরাট এদের দেবমূর্তি। ফিনক্স্ মরু ও মৃতের দেবতা ঃ এর বয়স পিরামিডের চেয়েও বেশী। এই দেবতার

হেফাজতে কবরস্তান রক্ষিত হবে, এই বিশ্বাসে এর কাছে এ বিরাট পিরামিড তৈরী হয়। ফিনক্‌স্‌ মানুষের মাথাওয়ালা এক বিপুল আকারের সিংহমূর্তি—লম্বায় ৫৭ মিটার, উচ্চতায় ২০ মিটার, মুখ-মণ্ডল ৫ মিটার, কান ১ মিটার ৩৭ সেন্টিমিটার। তাজা পাথর হতে কেটে এই বিরাট দেবমূর্তির দেহ ও মাথা তৈরী হয়েছে। পাঞ্জা দুটিও বিরাট; তারা আলাদা পাথরে নির্মিত।

বেলা সাড়ে বারোটায় শহরে ফিরলাম। কবি হেমচন্দ্রের কথা মনে পড়ল ঃ

বাঁধিয়া পাষাণ স্তূপ অবনীতে অপরূপ
দেখাইলা মানবেরে কি কৌশল বল—
প্রাচীন মিসর বাসী—কোথা সে সকল?

বিকালে ফের বের হলাম। এবার কেবল আমি আর আমাদের পাঞ্জাবী সহযোগী চৌধুরী আলী আকবর খাঁ।

রাস্তায় জনস্রোত বয়ে চলেছে। কি বিচিত্র সে জনস্রোত! মনে হল, বহু শতাব্দীর সভ্যতা সংস্কৃতি ও রীতিনীতির একটা জীবন্ত ছবি কায়রোর এক রাস্তাতেই মিলে। এখানে পাওয়া যায় বিলাতী সাহেব—মোমবাতির মত শাদা রং, পরনে হ্যাট কোট নেকটাই। তারই পাশে পাওয়া যায় আবিসিনীয়ার আদিম কাফ্রী—গায়ের রং এমন কালো যে তার উপর কালো কালির বোতল ঢেলে দিলে মনে হবে কালিটা সহসা পাতলা ফ্যাকাসে হয়ে গেল—মাথায় তোয়ালে, মোটা দড়ির প্যাঁচে সুন্দর ভাবে বাঁধা, গলা হতে পায়ের পাতা পর্যন্ত লম্বিত এক অখণ্ড কোর্তা, কখনো তা এত লম্বা যে চলবার সময় রাস্তার ধূলা খানিকটা ঝাড় দিয়ে নিয়ে যায়। এখানে পাওয়া যায় লাল ফেজ মাথায় আচকান চাপকান পরা আধুনিক মিসরী মুছলমান আবার তার পাশে তারই ভাই হয়তো চলেছে হ্যাট কোট নেকটাই পরে বিলাতী কায়দায় পা ফেলে ফেলে। পথে সাবেকী জামানার বোরকায় সর্বাঙ্গ-আবৃত মহিলা মূর্তি চোখে পড়ে, হালকা

দামী গাউন পরা মুখ খোলা মাথায় রেশমী রুমাল তরুণী মিলে, আবার কলে কোঁকড়ান অনাবৃত এলো চুল নাচিয়ে নাচিয়ে হাল ফ্যাশানের মেম-সাহেবী পোশাক পরে চলেছে, এমন আধুনিকাও যথেষ্ট পাওয়া যায়।

আমরা প্রথমে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে গেলাম। গরমের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ, তবু ভিতরে প্রবেশ করলাম। সামনে পরীক্ষা—দেখলাম, আট দশ দল ছাত্র এখানে সেখানে বসে পড়াশুনা করছে। তাদের সাথে সামান্য আলাপ করলাম। আগ্রহ তাদের ছিল প্রচুর, আমাদেরও কম ছিল না; কিন্তু সময় কম। শিক্ষকেরা কেউ হাজির ছিলেন না; তখন হাজির থাকার কথা নয়। যে কয়টি ছেলে দেখলাম, তাদের পঁড়ার ধরণ ভাল লাগল। কিন্তু তাদের পোশাক ও স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখে মন খুশী হল না। পোশাক নিতান্ত ঢালা ঢিলা; সবার গায়ের পোশাক পরিষ্কারও নয়। স্বাস্থ্যও তাদের ভাল নয়। হয়তো এ ছেলেগুলি কেতাবকীট দলের—এদের খেলাধুলাও নাই, শখ-বিলাসও নাই।

৯৭০ খৃষ্টাব্দে আল-আজহার মছজিদ রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ৯৮৯ সালে একে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা হয়। প্রথমে ফাতেমীয়া খলীফারা একে তাঁদের শিয়া ধর্মের প্রচার কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করতে থাকেন। সুলতান ছালাহুদ্দীন ১১৭১ সালে মিসর দখল করেন; ফলে আল-আজহার সুন্নীদের নিয়ন্ত্রণে আসে। অতঃপর অল্পকাল মধ্যেই আল-আজহারের যশ চারদিকে এত ছড়িয়ে পড়ে যে সেই হতে আল-আজহার মুছলিম জগতের বৃহত্তম শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে গণ্য হয়ে আসছে। আল-আজহার লাইব্রেরীতে বইয়ের সংখ্যা ৮০ হাজার, তার মধ্যে ২০ হাজার দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি। মিসরের সুবিখ্যাত চিন্তানায়ক মুফতী আবদুহু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটার ছিলেন।

আল-আজহারে দুই রকম শিক্ষা পদ্ধতি চলিত—পুরাতন ও নতুন। পুরাতন নেছাবের ছেলেরা আল-আজহার মছজিদে পড়াশুনা করে—শিক্ষার প্রধান বিষয় আরবী ভাষা ও ইছলাম ধর্ম। সমগ্র কোর্স ১২

বছর—৪ বছর প্রাথমিক, ৪ বছর মাধ্যমিক, ৪ বছর উচ্চ। নতুন নেছাবের ক্লাসের জন্য আল-আজহার সংলগ্ন কয়েকটি প্রাসাদসম ইমারত আছে—শিক্ষার বিষয় আরবী ভাষা, ইছলাম ধর্ম, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি। কোর্স এখানেও ১২ বছর। কোর্স শেষ করার পর গবেষণা করার সুযোগ আছে।

আল-আজহারের ২৭টি বড় বড় হোষ্টেল আছে—এদেরে সেখানে বলা হয় রিওয়াক। আল-আজহারে কোন ছাত্রের বেতন নাই, হোষ্টেলেও সিট ভাড়া দিতে হয় না; বরং অনেক গরীব ছেলে বৃত্তি পেয়ে থাকে। এক এক কামরায় অনেক ছেলে থাকে—এ ব্যবস্থাকে সন্তোষজনক বলা চলে না।

পৃথিবীর যেখানে যেখানে মুছলমান আছে, তার প্রায় প্রত্যেক দেশ হতেই কিছু না কিছু ছাত্র আল-আজহারে পড়তে যায় ঃ যথা ত্রিপলী, তিউনীস, আলজিরিয়া, মরক্কো, সুদান, সোমালীল্যান্ড, আবিসিনিয়া, বোরনু, দক্ষিণ আফ্রিকা, নাইজিরিয়া, উগান্ডা, সিরীয়া, ইরাক, ছউদী আরব, ইমেন, জাভা, সিংহল, পাকিস্তান, ভারত, চীন, জাপান, রুশীয়া, ককেশীয়া, এসিয়া মাইনর, কুর্দীস্তান, আফগানিস্তান, তুরস্ক, আলবেনিয়া, যুগোস্লাভীয়া, পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া ইত্যাদি।

নিম্ন হিসাব হতে আল-আজহারের ছাত্র সংখ্যার কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যাবে।

মোট ছাত্র সংখ্যা ঃ—১৯২৪—১০৭৪৫; ১৯৪৮—১৮৫৮২।

মিশরের বাইরের কয়েকটি দেশের ছাত্র

দেশ	ছাত্রসংখ্যা	দেশ	ছাত্রসংখ্যা
	১৯২৪—১৯৪৮		১৯২৪—১৯৪৮
তুরস্ক	১০৪—১১৪	জাভা	৭— ৪৬
সিরীয়া	২৬৪—২৬০	ভারত	৩— ১৩
উত্তর আফ্রিকা	১৬৫—১৪৪	আফগানিস্তান	৫— ৪

RAMNOGOR ELEVEN BULLET CLUB
Estd. 1967
DATE ... ...
P.O. SHARIAKANDI,
DIST. BOGRA.

দেশ	ছাত্রসংখ্যা	দেশ	ছাত্রসংখ্যা
কুর্দীস্তান	৯— ১১	চীন	অজানা— ৪
ইরাক	২— ১২	আবিসিনীয়া	৬— ৩
হেজাজ	৭— ৩৮	সুদান	৫৭—১৬৩

বর্তমানে পাকিস্তানী ছাত্র সংখ্যা ৮, ভারতীয় ৬।

আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বৈশিষ্ট এর অন্ধ-বিভাগ। চোখ-ওয়ালা ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশী সুযোগ সুবিধা দিয়ে অন্ধ-ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

আল-আজহারের অন্ধছাত্রদের মধ্যে অনেকে জীবনে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। শেখ আল-কুয়েছনী এঁদের অন্যতম। ইনি অবশেষে আল-আজহারের রেকটার পদে বৃত হন। সুবিখ্যাত শিক্ষাবিৎ ও মিসরের এক কালীন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার তাহা হোছেন বে এইখানে তাঁর অধ্যয়ন শুরু করেন। মিসরের স্বনামধন্য অন্ধকবি শেখ আহমদ আল-জঈনও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

১৯৪৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্ধ ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৭২৫।

আল-আজহারের ছেলেরা খেলাধুলার প্রতি ইদানীং আর উদাসীন নয়। বর্তমান যুগ উপযোগী প্রায় সব রকম খেলাধুলা ও ব্যায়ামেই এরা যোগ দিয়ে থাকে, এ বিষয়ে এরা মিসরের অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পেছনে নয়। এদের মধ্যে ইদানীং সামরিক ড্রিলেরও প্রবর্তন হয়েছে। এদের মধ্য হতে অনেকে গত ফিলিস্তিনের লড়াইয়ে যোগ দিয়েছিল।

মনীষী জামালুদ্দীন আফগানী একদা কিছুকালের জন্য এই জমি-উল-আজহারের ছাত্রগণকে শিক্ষাদান করেন। শেষ পর্যন্ত আজহারকে বাদ দিয়ে তাঁর বাস-ভবনই শিক্ষাকেন্দ্র হয়ে উঠতে শুরু করে। তখন আজহার পুরাতন পদ্ধতির শিক্ষাদানেই ব্যাপৃত ছিল। আফগানীর চেষ্টায় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দানের সূত্রপাত হয়।

মুফতী আবদুহু এই সময়ই আফগানীর অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। জগলুল পাশাও আফগানীর শিক্ষার অন্যতম ফল।

এইখানে থাকতেই আল্লামা আফগানী 'আনজুমানে-হায়াতে-ওতনী' নামক একটি প্রতিষ্ঠান মারফত সমগ্র মিসরকে একীভূত করে নব জীবনের পথে চালাতে শুরু করেন।

আল-আজহার হতে বিদায় হয়ে আমরা মুহম্মদ আলী পাশার মছজিদ দেখতে গেলাম। মুহম্মদ আলী পাশা এক ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল আলবেনীয়ায়। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি তুর্কী সৈন্যদলে ভর্তি হন এবং অল্পকাল মধ্যে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ফরাসীদের সাথে কয়েকটি লড়াইয়ে তাঁর সামরিক প্রতিভা পরিস্ফুট হয়ে উঠে। তুরস্কের সুলতান তাঁকে ১৮০৫ সালে মিসরের পাশা নিযুক্ত করতঃ সে দেশে শান্তি স্থাপনের আদেশ দেন। ১৮০৭ সালে মুহম্মদ আলী আলেকজান্দ্রিয়া হতে ইংরেজদেরকে তাড়িয়ে দেন। ১৮১১ সালে তিনি মামলুকদের শক্তি সম্পূর্ণ ধ্বংস করেন এবং মিসরের উন্নতি বিধানে একান্তভাবে ব্রতী হন। তাঁর চেষ্টায় মিসরে নতুন নতুন খাল কাটা হয়, নতুন নতুন কৃষির প্রবর্তন হয়, জল ও স্থল বাহিনী গঠিত হয় এবং দেশে য়ুরোপীয় সভ্যতার আমদানী হয়। ১৮৪১ সালে তুরস্কের সুলতান তাঁর সর্বনায়কত্বের অধীনে মুহম্মদ আলীকে বংশানুক্রমে মিসরে রাজত্ব করার অধিকার দান করেন। মিসরের অধীশ্বর রাজা ফারুক সেই মুহম্মদ আলী পাশারই বংশধর।

১৮৩০ সালে মুহম্মদ আলী পাশা এই মছজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৮৪৭ সালে এর নির্মাণ শেষ হয়। বাইজেণ্টাইন স্থাপত্য আদর্শে মছজিদটি তৈরী। ভিতরে গিয়ে আমাদেরো মনে হল, এ যেন আর একটি ইস্তাম্বুলী আয়াছুফীয়া দেখতে এলাম। সমজদারগণের মতে আয়াছুফীয়ার সম্পূর্ণ সফল অনুকরণ না হলেও এ মছজিদের ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালে এর বিরাটকায়, বিশাল স্তম্ভ, আলাবেস্তারের

গাথনি—এ সমস্ত মিলে যে একটি মহান সামঞ্জস্য ভাবের উদ্রেক করে, দর্শক তাতে অভিভূত না হয়ে পারে না। এই মছজিদের ভিতরে এক পাশে মুহম্মদ আলী পাশা ঘুমিয়ে আছেন।

মছজিদের প্রায় সংলগ্নই তাঁর বাড়ী ও কেল্লা। কেল্লা, বাড়ী ও মছজিদ সমস্তই একটা টিলার মত স্থানের উপর অবস্থিত। মছজিদের বাইরে এক পাশে দাঁড়ালে নজরে পড়ে সমস্ত কায়রো শহর, নজরে পড়ে নীলনদীর ঝিকিমিকি, নজরে পড়ে দিগন্তে পিরামিড শ্রেণী। মছজিদের আঙিনার প্রান্তদেশ হতে যেমন সমস্ত কায়রো নজরে পড়ে, সমস্ত কায়রো হতেও মছজিদটি তেমনি নজরে পড়ে।

কায়রোর মত মুছলিম আর্টের এত বড় কেন্দ্র নাকি দুনিয়ার আর কোথাও নাই। যে মুছলিম বংশ যখন শাসনযন্ত্র অধিকার করেছে, তারাই তখন তাদের রাজধানী সুরম্য প্রাসাদ ও সুদৃশ্য মছজিদ দিয়ে ভরে তুলেছে। এরা সকলে একই রাজধানীতে বসে রাজ্য শাসন করে নাই; নিজেদের সুবিধা মত রাজধানী এদিক সেদিক সরিয়ে নিয়েছে। ফলে প্রাসাদ ও মছজিদও দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে।

মুছলিম যুগে মিসরে ঘন ঘন শাসন শক্তির পরিবর্তন ঘটেছে। এমন দ্রুত পরিবর্তনের অসুবিধা আছে প্রচুর। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলের কীর্তি-কাহিনীর রক্ষণের দিকে উমাইয়া খলীফারা মনোযোগ দেন নাই; তাঁরা মনে করতেন—'ওতে আমাদের যশ-মান তো আর বাড়বে না।' সেই জন্য মিসর-বীজয়ী বীর আমর-ইবনুল-আছের মছজিদ—যে মছজিদ মিসরে হয়তো ইছলামের সর্বপ্রথম এবাদত-গা, এবং যা মিসর বিজয়ের সাল ৬৪০ অব্দে স্থাপিত—তার মেরামতের দিকে পরবর্তীরা যথেষ্ট মনোযোগ দেয় নাই। তেমনি উমাইয়া খলীফাদের আমলের কীর্তির প্রতি আব্বাছীয়া বা ফাতেমীয়া খলীফারা নেক নজর দেন নাই। এত সব সত্ত্বেও মিসরে ইছলামের কীর্তিচিহ্ন আজো যা আছে, তা বিশ্বের বিস্ময়।

মিসরের প্রাচীন কীর্তি-ঐশ্বর্যের একটু সামান্য নজীর দেই। মুছলিম স্থাপত্য শিল্পের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হল এই যে দালান-কোঠার গায় নির্মাণের তারিখ, নির্মাতার নামধাম উৎকীর্ণ থাকে, আর এই সব শিলালিপির রচনা ও হরফ-চিত্রণে সেকালে যথেষ্ট ওস্তাদীর পরিচয় থাকত। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ হতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত যে যুগ—এই যুগের ৩,০০০ মিসরীয় শিলালিপি কায়রোর আরব মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

মুছলিম আমলের আরো কয়েকটি কীর্তি :

(ক) সুলতান হাছান মছজিদ ও কলেজ : মিসরের মামলুক তুর্ক শাসকদের মধ্যে সুলতান হাছান সর্বোত্তম ছিলেন। তিনি ১৩৫৬ সালে শুরু করে ১৩৫৯ সালে এই মছজিদটির নির্মাণ কাজ শেষ করেন। স্থাপত্য দক্ষতা, অসাধারণ জাঁকজমক ও নিপুণ সৌন্দর্যে এই মছজিদ সম্ভবতঃ সমগ্র মিসরে অতুলনীয়। এ মছজিদের সাথে একটি মাদ্রাছা আছে। মছজিদের গায় কোরান মজীদের আয়াত তোগরা হরফে যে-সুন্দর ভাবে উৎকীর্ণ আছে অমন বর্তমানে আর কোথাও নাই।

(খ) কায়েত-বে মাজার : আল-আশরাফ আবু নছর কায়েত-বে-র (১৪৭২—১৪৭৪) সমাধি। মামলুক স্থাপত্যের এও এক অসাধারণ নিদর্শন। বৈজ্ঞানিক, পরিব্রাজক, প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ—এঁরা অনেকেই দেখতে যান। মাজারের সঙ্গে লক্ত আছে একটি প্রাথমিক স্কুল, একটি লাইব্রেরী, একটি পানির উৎস। মছজিদের বাইরের দৃশ্য, ভিতরের কারু-কাজ, মিনারের সৌন্দর্য—এ সমস্তই দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে।

(গ) কেল্লা : সুলতান ছালাহুদ্দীন এই কেল্লা নির্মাণ করে ফাতেমীয়দের সুন্নী বিদ্বেষ প্রচারের পথ বন্ধ করার পরিকল্পনা করেন। কারণ ফাতেমীয় খলীফাদের বংশধর ও ভক্তেরা তখন পর্যন্ত ছালাহুদ্দীনের বংশকে উৎখাত করার জন্য ঘন ঘন ষড়যন্ত্র করছিলেন। মুহম্মদ আলী পাশা এর বিস্তৃত মেরামত করেন।

শেফার্ড্‌স্‌ হোটেলে আশ্রয় নিয়েছি; তার একতলায় এক পাশে একটি লাইব্রেরী—বই ও ছবি বিক্রি হয়। দেখতে গেলাম। নানা রকম বই, বিচিত্র ছবি—অত্যন্ত সাজানো গোছানো। বিক্রি করছে একটি তরুণী। পরম সৌজন্যের সঙ্গে বই ছবি দেখতে লাগল। আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে সে যেন একটু অবাক হয়ে আমার দিকে চাইল; বল্ল—

'আপনি কি বইপত্র লেখেন?'

'যৎসামান্য।'

'কি আপনার বিষয়?'

'প্রধানতঃ ইতিহাস, সভ্যতা, সংস্কৃতি।'

'বাঃ! আচ্ছা, তা হলে আপনাকে তেমন বই দেখাই।'

'তুমি কি কর, মা? পড়?'

'না। আমি এইবার বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডিগ্রী নিয়ে বের হয়েছি।'

'বেশ! তোমার মা-বাপ আছেন?'

'আছেন।'

'কয় ভাই, কয় বোন তোমার?'

'একটিও নাই।'

'তুমি বড় লোভী—মা-বাপের সমস্ত স্নেহ একা দখল করে ভোগ করছ।'

'তাই। আর সেইজন্য আমার মা-বাপ সব সময় আমাকে সব চেয়ে ভাল স্কুলে আর কলেজে পড়িয়েছেন।'

'তোমরা মুছলমান?'

'না।'

'খৃষ্টান?'

'না। আমরা ইহুদী।'

'ওহ্‌! অতি প্রাচীন জাতি। আচ্ছা, মা, আমাকে ঐ উটের ছবিটা

দাও দেখি।'

'উট বুঝি আপনি ভালবাসেন?'

'ভালবাসি কিনা বলতে পারি না, তবে খুব কৌতূহলের সঙ্গে দেখি। অমন অদ্ভুত কিম্ভূতকিমাকার জীব তো আর হয় না।'

'কিন্তু উটের কণ্ঠে ভাষা থাকলে সে কি বলত জানেন?'

'কি—বলত, মা?'

'বলত, একটু লক্ষ্য কর, লেজের আগা হতে নাকের ডগা পর্যন্ত বিচিত্র তনুভঙ্গিমায় লীলায়িত সৌন্দর্যের কি অপরূপ বিকাশ! তারপর চেয়ে দেখ ঐ মানুষ নামক জীবটির দিকে ঃ খাড়া যেন কাঠের খাম্বা—নিস্তরঙ্গ, অকাব্যিক, অসুন্দর।'

'উট তোমাদের প্রিয় দেশের প্রিয় প্রাণী, একথা ভুলে গিয়েছিলাম, মা। তোমার মনে ব্যথা দিয়েছি, মাফ করো।'

'না, মাফের কথা ঠিক নয়। আসলে ও-জানোয়ারটি তো সত্যি আমাদের পরম উপকারী; তা ছাড়া ওর সৌন্দর্যও তো কেবল কল্পনার কথা নয়।'

'সত্যি, মা, সত্যি। আচ্ছা তুমি বুঝি আর্টের চর্চা কর?'

'কিছুদিন ছবি এঁকেছিলাম। এখন সঙ্গীত চর্চা করি।'

'সঙ্গীতও তো আর ছোট আর্ট নয়।'

'নিশ্চয় নয়, এ মস্ত আর্ট। সঙ্গীতেই আমি একটু নাম করতে চাই।'

'আশীর্বাদ করি, সফল হও।'

'আপনারা কয়দিন আছেন?'

'আজই রাতে রওনা হব।'

'আজই? ওহ্! দুনিয়া এত বড়, কাজ এত বেশী, সময় এত কম!'

'তবে আসি, মা?'

'হ্যাঁ, আসুন, চাচ্চা।'

'আর কখনো হয়তো দেখা হবে না ঃ বিদায়।'

'হয়তো নয় ঃ ছালাম।'

বিদ্যা ও বিনয়, সৌজন্য ও সৌন্দর্য, মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের অমন সুন্দর সমাবেশ আর কোথাও চোখে পড়েছে বলে মনে হয় না।

৮ই সেপ্টেম্বর দিবাগত রাত্রিতে আমরা কায়রো হতে হাওয়াই জাহাজযোগে জেদ্দায় রওনা হলাম।

জেদ্দা

৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫১

শুজা,

আজ তোমাকে পত্র লিখছি সেই দেশের একটি বন্দর হতে যে দেশ দুনিয়ার ধর্ম-পিয়াসী মুছলমানদের ধ্যানের স্বপন। আমি ধার্মিক নই, তবু আমারো দিল ঘন ঘন দুলে উঠছে।

গতকাল রাত ১২॥টায় আমরা কায়রো হতে হাওয়াই জাহাজে জেদ্দা চল্লাম। আজ সকাল ৮টায় জেদ্দা এসে পেঁাছেছি। পাকিস্তান লিগেশনের তরফ হতে বন্ধুরা হাজির ছিলেন; কাজেই কোন তকলীফ হয় নাই।

তবে এই সেই জেদ্দা যার কথা শৈশব হতে শুনে আসছি? যার নামের পরশে চিত্ত-তলে জেগে উঠেছে কত দূর-দূরান্তের স্বপন? কত রোমাঞ্চকর কল্পকাহিনী? কত ব্যথা-বিদগ্ধ স্মৃতি?

শোনা যায়, দাদী হাওয়া এইখানে তাঁর শেষ শয্যায় শয়ন করেছিলেন। আচ্ছা, মরবার আগে দাদী হাওয়ার বয়স কত হয়েছিল? তাঁর চুলে বেনী গেঁথে দেওয়ার কেউ কাছে ছিল বলে তো মনে হয় না। তবে কি তাঁর সেই শাদা এলো চুল তাঁর চলবার সময় আরব সাগরের হাওয়ায় কেবল উড়ত আর উড়ত? দরিয়া পারের সেই বিজন ময়দানে হাওয়ার

উজান একেলা চলবার সময় তাঁকে কেমন দেখাত? ডানা কাটা পরীর মত? অপ্সরা কিন্নরীর মত? না, উদাসিনী মানবীর মত? আচ্ছা, তাঁর মরণ মুহূর্তে কেউ কি তাঁর মুখে পানি দিয়েছিল? তাঁর কানে কলেমা দিয়েছিল? তাঁর জবানে তওবা দিয়েছিল?

কোন্ সুদূর অতীতে হাওয়ার আয়ু শেষ হয়ে গেছে, অথচ যুগে যুগে তিনি বিশ্বের দাদী হয়ে বেঁচে আছেন! তিনি বাপের দাদী—ছেলের দাদী—নাতির দাদী—তস্য নাতির দাদী।

বেদুঈনরা এখনো আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলে ঃ এই দাদী হাওয়ার কবর। কতখানি ঠিক ভাবে একথা তারা কয় বলতে পারি না। হয়তো এটি নিতান্ত কাহিনী মাত্র। কিন্তু মনে হয়, দাদী হাওয়ার কথা বলবার যদি কারো কোন অধিকার থেকে থাকে, তবে তা এদেরই আছে। কারণ যে পনর কুড়িটি বেদুঈন পরিবার জেদ্দায় দেখলাম, তাতে মনে হল, এরা এদের দেহে, মনে, জীবনযাত্রা প্রণালীতে কত হাজার হাজার বছর আগের স্মৃতি আর রীতি বহন করে চলেছে, তা অনুমান করাই কঠিন। এরা যেন দাদী হাওয়ার জামানার সঙ্গে সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রেখে আসছে। সেই মুক্ত মরুর বুকে সেই পাতার তাবু, ভবিষ্যতের জন্য সেই বেপরোয়া ভাব, নিজ খোশ খেয়াল মোতাবেক সেই যত্রতত্র চলাচল। এরা অব্যয়--এরা অক্ষয়—এরা চির সনাতন।

দেশ-দেশান্তরের কত হজযাত্রী এই জেদ্দায় জাহাজ হতে নামে; 'এসেছি রছুলুল্লা, তোমার দেশে এসেছি;' 'এসেছি আল্লা, তোমার প্রথম এবাদত-গাহের মুলুকে এসেছি' বলে, কত আকুল প্রাণ কেঁদে ওঠে; উত্তেজনার আতিশয্যে কত বয়োদুর্বল যাত্রী এখানেই ঢলে পড়ে, তাদের মক্কা মদীনা জিয়ারত আর হয়ে ওঠে না; তারা প্রতীক্ষমানা আপন জনের এ দুনিয়ার ঘরেও আর ফিরে যায় না!

সমগ্র আরবের ছবি মনের চোখে ভেসে উঠল।

সেমিটিক জাতি সমূহের লালন ভূমি এই আরব। এই আরবদেরই

এক শাখা বাবিলনে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করে। ফিলিস্তিন, আবিসিনিয়া এদেরই দিয়ে আবাদ হয়। বিভিন্ন রকম শিলালিপি হতে এখন প্রমাণিত হয়েছে যে হজরত ঈছার কম-ছে-কম হাজার বছর আগে আরবে এক বিরাট সভ্যতা বর্তমান ছিল। তারপর আসে পতনের যুগ। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে আরবের বুকে বিরাজ করতে থাকে অজ্ঞতার ভয়াবহ অন্ধকার,অনাচারের অনিরুদ্ধ জুলুম। মুক্তির বাণী নিয়ে আসেন মরুসূর্য মুহম্মদ (দঃ); নতুন আলোকের পরশে আরবের বালুকারাশি পর্যন্ত জ্বলে ভাস্বর হয়ে ওঠে। দিকে দিকে গড়ে ওঠে নব নব জাতি, নব নব রাজ্য, নব নব সভ্যতা। তারপর মুছলমানের জাতীয় জীবনে শুরু হয় অবনতির ভাটা; ইছলামের সত্য সনাতন আদর্শ ভুলে তারা চলে ভুল পথে, ডেকে আনে নিজেদের মৃত্যু ঃ আজরাঈল শিয়রে এসে বসে, জান কবজ করতে তৈরী হয়।

এমন সময় আবির্ভাব হয় মুহম্মদ ইবনে আবদুল ওহ্হাবের। মধ্য আরবের অন্তর্গত আযাইনাতে জন্ম—বছরা, দামেশ্ক ও মক্কায় অধ্যয়ন শেষ করে এই সংস্কারক ১৮৫০ সালে জন্মভূমিতে ফিরে আসেন ও ঘোষণা করেন—মুছলমানেরা ইছলামের পথ হতে অনেক—অনেক দূরে সরে গিয়েছে—তাদের আজকের এই দুর্বলতা, এ বেইজ্জতী এরই জন্য। অতএব মুছলমানকে আগের পথে ফিরে যেতে হবে; ধর্মে ফিরে যাওয়ার মধ্যেই তার পুনর্জীবন লাভের একমাত্র পথ; যা ইছলামের বিরোধী তার সাথে কোন আপোষ নাই, কারণ সে আপোষের পরিণাম জাতির অধঃপতন।

আযাইনা-র আমীর আবদুল ওহ্হাবকে আপদ মনে করে রাজ্য হতে তাড়িয়ে দিলেন। তিনি আশ্রয় পেলেন দরীয়া-র আমীর মুহম্মদ ইবনে ছউদের উদার পক্ষপুটতলে। মুহম্মদ ইবনে আবদুল ওহ্হাবের আহ্বানে দলে দলে বেদুঈন এসে তাঁর এই সংস্কার-পন্থী ধর্মমত গ্রহণ করতে লাগল এবং নব নব সংস্কারের জন্য পাগল হয়ে উঠল। আর

এদিকে মুহম্মদ ইবনে ছউদ তাদেরে সমর শিক্ষায় নিপুণ করে তুলতে লাগলেন। এই নব-গঠিত সৈন্য দলের সাহায্যে মুহম্মদ ইবনে ছউদ অল্পকাল মধ্যেই সমগ্র মধ্য ও পূর্ব আরবে তাঁর শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করে ফেল্লেন। এমনি ভাবে আরবে ছউদী শক্তি শিকড় গেড়ে বসল।

মুহম্মদ ইবনে ছউদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আবদুল আজীজ পিতার রাজ্যের সীমাকে আরো প্রসারিত করেন। আরব তখন তুর্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। এইবার তুর্ক প্রভুদের চৈতন্য উদয় হল; তাঁরা তাঁকে দমন করতে লোক-লশকর পাঠিয়ে দিলেন; কিন্তু তুর্ক সৈন্যরা কিছু করতে পারল না; ফিরে গেল। আবদুল আজীজ তুর্ক আক্রমণের জওয়াবে কারবালা ও মক্কা দখল করে তত্রস্থ মাজারগুলিকে একে একে ধূলিসাৎ করে ফেলেন ও বহু পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন লুঠ করে নিজ রাজধানীতে নিয়ে যান। আবদুল আজীজের এই ব্যবহারে ব্যথিত হয়ে একজন শিয়া একদা দারিয়া-র মছজিদে হঠাৎ আক্রমণ করে আবদুল আজীজকে হত্যা করে।

এমনি ভাবে কখনো জোয়ার কখনো ভাটার ভিতর দিয়ে ছউদী শক্তি কালের তীর বেয়ে চলতে থাকে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। তখন শাহজাদা আবদুল আজীজ পিতা আবদুর-রহমানের সাথে কুয়ায়েত-এ নির্বাসিত, প্রভুশক্তি মুহম্মদ-ইবনে-রশীদ নামক এক বিচক্ষণ আমীরের কুক্ষিগত। মাত্র কয়েকজন অনুচর সহ একদা শাহজাদা আবদুল আজীজ পিতার তাঁবু হতে বের হয়ে ধূসর, মরুর দুস্তর পথে বিলীন হয়ে গেলেন। তারপর এদিক সেদিক ওঁত পেতে থেকে এক রাত্রির অন্ধকারে রাজধানী রিয়াদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, শাসন কর্তাকে পরাজিত করে হত্যা করলেন, তারপর নিজেকে রিয়াদের আমীর বলে ঘোষণা করে চারদিকে তাঁর শক্তি বৃদ্ধির কাজে মনে প্রাণে লেগে গেলেন। ইনিই ছউদী আরবের অধিপতি মহামান্য রাজা আবদুল আজীজ ইবনে ছউদ।

আজ এ-আমীর, কাল ও-আমীরের সঙ্গে মিলে আবদুল আজীজ আপন শক্তি বাড়িয়ে তুলতে লাগলেন। ইতিমধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। আবদুল আজীজ বৃটিশ পক্ষ গ্রহণ করে নিজ শক্তি বৃদ্ধির নতুন নতুন পথ খুঁজতে লাগলেন। এদিকে মক্কার শরীফ হোছেন-ইবনে-আলী তুর্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নিজেকে আরব দেশ সমূহের রাজা বলে ঘোষণা করে বসলেন। আবদুল আজীজ চাপা হুঙ্কারে কেবল বল্লেন—বটে! আচ্ছা!! অবশেষে ১৯১৭ সালে—আবদুল আজীজ ও শরীফ হোছেনের মধ্যে রণভেরী বেজে উঠল। আবদুল আজীজের প্রচন্ড আক্রমণের সামনে শরীফিয়া সৈন্য টিকতে পারল না। ১৯২৫ সালে আবদুল আজীজ তায়েফ, মক্কা ও মদীনা দখল করে নিলেন। এমনি ভাবে তিনি নেজদ ও হেজাজের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসলেন।

ছউদী আরবের লোক সংখ্যা ৭৫ লাখ—এর মধ্যে আছে মক্কায় ২ লাখ, রিয়াদে দেড় লাখ, জেদ্দায় ৫০ হাজার, তায়েফে ৪০ হাজার। মক্কা ও রিয়াদ উভয়ই ছউদী আরবের রাজধানী।

সুলতান আবদুল আজীজ প্রকৃত পক্ষে স্বেচ্ছাতন্ত্র শাসন যন্ত্রই পরিচালন করে আসছেন; তবে একটা মন্ত্রী পরিষদ আছে; তিনি ইচ্ছা করলে সে পরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন। শাসন প্রণালীর মূল ভিত্তি ইছলামী শরীয়ত।

ইবনে ছউদের ৩৫টি ছেলে; মেয়ে কয়টি জিজ্ঞাসা করি নাই: বিবি, বেগম, শাহজাদী এরা পর্দানশীন, কাজেই এঁদের সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করাও নাকি খেলাফে তহজীব। তবে বিশ্বস্ত সূত্রে শোনা গেল শাহজাদীদের সংখ্যা আপাততঃ আটাশ। বড় ছেলে ভাবী উত্তরাধীকারী—নাম শাহজাদা ছউদ। দ্বিতীয় ছেলে বৈদেশিক মন্ত্রী ও হেজাজের রাজপ্রতিনিধি, নাম শাহজাদা ফয়ছল। তৃতীয় ছেলে দেশ-রক্ষা মন্ত্রী—নাম শাহজাদা মনছুর।

হজ উপলক্ষে যে আয় হয়ে থাকে এতকাল পর্যন্ত তাই ছিল ছউদী আরবের প্রধান সম্পদ। সে আয় আজো আছে; কিন্তু ইদানীং তেলই ছউদী আরবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পারস্য উপসাগরের তীরে বাহ্‌রান নামক স্থানে এই তেলের খনি—এক মার্কিন কোম্পানী এই তেলের ব্যবস্থা করছে; ছউদী আরব মালিকানা পাচ্ছে। শোনা যায়, এই তেলের দৌলতে ছউদী আরব অচিরেই নিতান্ত ধনী দেশের মধ্যে গণ্য হবে। মক্কা মদীনার মধ্যস্থ এক স্থানে একটি সোনার খনিও আবিষ্কৃত হয়েছে।

আমরা যেখানেই গিয়েছি, সেখানেই সুলতান আবদুল আজীজের প্রভাবের পরিচয় প্রত্যক্ষ করেছি। শরীফীয় শাসন আমলে বুদ্দুদের জুলুমের অন্ত ছিল না। কাফেলা ছেড়ে কোন যাত্রী একটু পেছনে পড়লে সে ফিরবে, না কোন বুদ্দুর পাথরের আঘাতে পথেই পড়ে থাকবে, তার নিশ্চয়তা ছিল না। কোন সময় কাফেলাকে কাফেলাই আক্রান্ত হয়ে পড়ত। এখন সেসব কিছুই নাই। চুরিও সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। জেদ্দা হতে মদীনা সে যুগে উটের পিঠে ১২ দিনে যেতে হত; এখন মোটর বাসে ২ দিনে যাওয়া যায়, হাওয়াই জাহাজে যেতে লাগে দেড় ঘন্টা। পানির ব্যবস্থা আগের চেয়ে ভাল হয়েছে। আগে দিনে মাছির জ্বালায় ঠিক হয়ে বসার জো ছিল না; সেই ডরে আমরা মশারী সাথে নিয়েছিলাম। কিন্তু বাক্স হতে মশারী বের করতে হয় নাই। মক্কা ও জেদ্দায় ভাল ভাল রাস্তা ও দালান-কোঠা তৈরী হচ্ছে—শুনলাম, মার্কিনী পরিকল্পনা মোতাবেক। মক্কার বাজারে রেশম পশমের পোশাক-পরিচ্ছদ যা ও যে পরিমাণ দেখলাম ঢাকার বাজারে তা নাই।

ছউদী আরবের দিন দিন উন্নতি হোক। আমরা এই কামনা করি।

তবে সুলতানের পঁয়ত্রিশটি ছেলের কথা ভাবতে মনে একটু

ভয় হয়। সুলতানের এন্তেকালের পর এঁরা যদি পিতার বর্তমান ব্যবস্থা মেনে চলেন, তবে ভাল। শাহজাদা ছউদকে তখতে বসিয়ে বাকি চৌত্রিশ ভাই যদি চার পাশে তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে তাঁকে একবার শুধু ছালাম বাজিয়ে ছড়িয়ে পড়ে আর দুশমনদের দিকে চেয়ে ক্রুদ্ধ হুঙ্কার ছাড়ে, তবে সে সিংহাসন সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে এ আশা বেশ করা চলে। নাদির খাঁরা সাত ভাই ছিলেন। সেই দৌলতে তাঁরা কাবুলের তখ্‌ত দখল করে বসলেন; ছউদী ভাইয়েরা পঁয়ত্রিশ জনে মিলে কি না করতে পারেন? কিন্তু হঠাৎ সিংহাসন নিয়ে যদি কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে যায়, তবে সেই সুযোগে বাইরের কোন্ শক্তি যে এসে শিকড় গেড়ে বসবেন, তা আলিমুল-গায়েবই জানেন।

আরবে কওমী জোশ এখনো প্রবল। কওমী দেশে যিনি যত বেশী কওমকে আয়ত্ত করতে পারেন, তিনি তত শক্তির অধিকারী হয়ে থাকেন। কাগজে কলমে সন্ধির বন্ধন বা মুখের কিরা-কছমের বন্ধনের চেয়ে রক্তের বন্ধনের জোর বেশী। কাজেই কোন শেখ একে একে দশ কওমে দশটি বিয়ে করলে তিনি দশ কওম আত্মীয় পান। একে একে বলছি এই জন্য যে এক সঙ্গে শেখেরা চার জনের বেশী বিবি রাখেন না। বিবিদের মধ্যে কেউ মরে, কেউ তালাক নেয়, কাউকে তালাক দেওয়া হয়। ফলে নতুন বিয়ের সুযোগ ঘটে। শেখের যথেষ্ট ক্ষমতা থাকলে তিনি এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে থাকেন। দশ কওমে দশটি বিয়ে করলে যদি ত্রিশ পঁয়ত্রিশটি ছেলেমেয়ে হয়, তবে তাদের বিয়ে শাদী উপলক্ষে আরো কতকটি কওম আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হয়। আত্মীয় কওমের বাইরের দুশমনের সঙ্গে লড়াই বাধলে সমস্ত আত্মীয় কওমরা এক হয়ে যায়।

সুতরাং কওমী দেশে রাজার ঘরে সন্তান সংখ্যা বাড়লে সুবিধা আছে।

কিন্ত সন্তান সংখ্যা বাড়লে আবার বিপদও আছে। বড় ছেলেটি বড় বলেই সিংহাসন দাবী করে বসে। আমীর রইছরা তার দাবী

স্বভাবতঃ সমর্থনও করে থাকেন। কিন্তু সেই বড় ছেলেটি যদি বোকা বা দুষ্ক্রিয়াশীল হয়, অথবা তার ছোট ভাইদের মধ্যে কেউ যদি বুদ্ধিতে অত্যন্ত তুখার হয়, অথবা তার মামার কওমের জোর যদি বেশী থাকে, তবে সিংহাসন নিয়ে গোল বেঁধে যায়। তখন শুরু হয় আত্মঘাতী সংগ্রাম।

হাজার হাজার বছর হতে দেশে দেশে যুগে যুগে এই আত্মঘাতী সংগ্রামের অভিনয় হয়ে এসেছে; আর সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলেই মানুষ রাজতন্ত্র পরিত্যাগ করে গণতন্ত্রের দিকে চলেছে। গণতন্ত্রে কেবল রাজপুত্রদের মধ্যে নয়, সমগ্র দেশের জনগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মানুষের ক্ষমতা পরিচালনার সুযোগ ঘটে; তাতে প্রতিযোগিতা আছে, রক্তারক্তি নাই, আর সে ব্যবস্থায় দেশের হয় বিরাট কল্যাণ।

কিন্তু শাসন যন্ত্র দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনার জন্য দেশের বাসিন্দাদের মধ্য হতে যোগ্যতম লোক বেছে বের করার একমাত্র উদ্দেশ্যেই যে গণতন্ত্রের দরকার এমন নয়, যোগ্যতম লোক পাওয়া যাওয়ার পরও তাঁকে সাহায্য করার জন্য অন্য যোগ্য লোককে বাছাই করে নিতে হয়। একজন মানুষ যত শক্তিশালীই হোন না কেন, তাঁর একার পক্ষে বর্তমান যে কোন রাষ্ট্রের জটিল ও বহুবিধ কাজের বোঝা বহন করা কেবল দুঃসাধ্য নয়, অসাধ্য। যে যুগে গণতন্ত্রের নাম লোকের কল্পনায় আসে নাই, সে যুগেও যে চিন্তাশীল লোকেরা একথা বুঝতেন, তার প্রমাণ লঙ্কেশ্বর রাবণের কাহিনী। কবি প্রথমে ঠিক করলেন যে রাজা রাবণকে দিয়ে অসাধ্য সাধন করতে হবে। কিন্তু একটা লোকের একটা মাথায় এত বুদ্ধি জোগাবে কি করে, আর মাত্র একজোড়া হাত দিয়ে এত কাজ করাই বা কি করে সম্ভব হবে? তাই কবি বুদ্ধি করে রাবণের ঘাড়ে বসিয়ে দিলেন দশ দশটি মাথা, আর তাঁর কাঁধের কাছে জুড়ে দিলেন বিশটি হাত। এত মাথা আর এত হাত মিলে কাজ করত বলেই তো রাবণের আস্তাবল ছাফ করতে নেমে আসত স্বয়ং দেবতারা; আর সেই

ক্ষমতা বলেই তো তিনি দুনিয়া হতে বেহেস্তে যাওয়ার সিঁড়ি করে দিতে চেয়েছিলেন। সমগ্র দুনিয়াতে কোন কল্পকাহিনীতেও মাত্র এক-মাথা আর এক জোড়া হাত সম্বল করে কেউ স্বর্গের সিঁড়ি তৈরী করার কথা ভাবতে পারে নাই।

এ জামানাতেও সম্পদ সভ্যতার সিঁড়ি তৈরী করে বেহেস্তকে দুনিয়াতে নামিয়ে আনতে অথবা দুনিয়াকে বেহেস্তের পর্যায়ে উন্নীত করতে একাধিক মাথা আর একাধিক হাতের সমবেত সাধনা দরকার।

তাই দুনিয়াতে আজো যেখানে যত রাজতন্ত্র আছে তাদের পক্ষে ভবিষ্যতে গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর হওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নাই।

আমরা সমস্ত দিন জেদ্দায় কাটিয়ে দিলাম। জেদ্দার হাওয়াই জাহাজের বন্দরটি দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে। ছাফ-ছাফাই জ্ঞান যাত্রীদের কম বলে মনে হল। পেশাব পায়খানার কোন সুব্যবস্থা এখনো হয় নাই। দারিয়ার জাহাজ ঘাট-টিরও দ্রুত প্রসার হচ্ছে। এতকালের পুরানা বন্দর, অথচ এ যাবত ওতে জেটী ছিল না। জাহাজ কিনার হতে দূরে দাঁড়িয়ে থাকত, যাত্রীরা নৌকাযোগে কিনারে নামত। ইদানীং কর্তারা এদিকে মনোযোগ দিয়েছেন। ইতিমধ্যে যতটুকু জেটী তৈরী হয়েছে তাতে তিনটি জাহাজ এক সঙ্গে এসে ভিড়তে পারে। বন্দরের এখানে সেখানে ২২টি জাহাজ নঙ্গর করে আছে দেখলাম। জেদ্দায় শিক্ষার কোন সুব্যবস্থা এখনো হয় নাই। জেদ্দা দূতাবাসের কর্মাধ্যক্ষ মিঃ আবুল মছউদ তাঁর মেয়েকে পড়াশুনার জন্য কায়রো পাঠিয়ে দিলেন।

জেদ্দা দূতাবাসে একটি তরুণ যাত্রীকে খুব সেবারত দেখলাম। কৌতূহল হল। মিঃ আবুল মছউদকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বল্লেন ঃ

এর বাড়ী নোয়াখালী। খালি হাতে বাড়ী হতে বের হয়; চুপে-চাপে কোন রকমে জাহাজে ওঠে। জেদ্দায় নামা মাত্র ছউদী সরকারের লোকেরা একে পাকড়াও করে; বলে, অমন কপর্দকহীন মানুষকে দেশের ভিতরে যেতে দিয়ে ভিক্ষুকের সংখ্যা আমরা বাড়াব না। সরকারী

লোকেরা ওকে পাঠিয়ে দেয় আমার কাছে; কয়ে পাঠায়, তোমার পাকিস্তানী নাগরিক—একে ফেরত পাঠানর যে ব্যবস্থা হয় তুমি কর।

একথা শুনে ওর যে বুকফাটা কান্না! সে কিছুতেই থামে না। আমি হয়রাণ হয়ে অবশেষে বল্লাম—'আচ্ছা বাপু, এখন থাম, তোমাকে আমিই খরচ দিয়ে মক্কায় পাঠাব।' তখন ওর আনন্দ দেখে কে? ও যেন নতুন জীবন ফিরে পেল।

একদিন কথা প্রসঙ্গে ওকে বল্লামঃ 'খালি হাতে হজে রওনা হলে হজ করা সম্ভব হয় না ঃ এই শাদা কথাটা আমাদের দেশের লোকে কখন বুঝবে?' ও আস্তে মুখ তুলে বল্ল—'কিন্তু খালি হাতে এলেও তো হজ সম্ভব হয় হুজুর।' আমি ধমক দিয়ে বল্লাম, 'তুমি কোথায় পেলে এর নজীর?' ও উত্তরে বল্লঃ 'কেন, এই আমিই তো নজীর!'

আমি চুপ মেরে গেলাম।

মক্কা শরীফ
২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫১

খালেদা,

তুমি জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছ, মক্কায় কোন্ কোন্ জিনিস সবার আগে আমার চোখে পড়ল। উত্তরটা একান্ত অকাব্যিক ভাবে দিব।

মক্কা শরীফে এসে সবার আগে চোখে পড়ল এর অসম্ভব রকমের ভীড়। পথে ঘাটে, হাটে বাটে, ঘরে দুয়ারে ভীড়, ভীড় আর ভীড়। ভীড় না হয়ে উপায়ই বা কি? মুছলিম জাহানের সর্বত্র হতেই এ মৌছুমে হজ-যাত্রীরা এসে ভেঙ্গে পড়ে তো!

অথচ ভীড়কে আমি বরাবরই ভয় করে চলি। গাঁয়ের বাড়ী গেলে হাটে যাই; কখনো কখনো মাছ কিনতে চেষ্টা করি; কিন্তু মেছো বাজারের ভীড় দেখে ভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকি। হঠাৎ কেউ এসে দেখে, তার

দয়া হয়। আমি বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকি; সে ভীড় ঠেলে ভিতরে গিয়ে আমার জন্য মাছ কিনে আনে। একবার কলকাতা সেক্রেটারিয়েট থেকে নেমে আসছি, হঠাৎ পোষ্টাফিস দেখে মনে হল, কয়েকটা টিকিট নিয়ে যাই। প্রায় ঘন্টা খানেক দাঁড়িয়ে রইলাম—ভীড়ের বাইরে। একটি অচেনা ছেলে তার টিকিট খরিদ করে বেরিয়ে যাচ্ছিল; আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল। বল্ল, স্যার, আপনি কি কিছু কিনবেন? বল্লাম; সে কিনে এনে দিল। মক্কায় এ খাতির পাওয়ার জো নাই। এখানকার লোক মন্দ, একথা কিন্তু বলছি না। হজের মৌছুমে মক্কার বাসিন্দাদের নিশ্বাস ফেলার অবকাশ নাই ঃ একাজ, ওকাজ, সেকাজে তারা অষ্টক্ষণ লেগেই আছে। সমস্ত বছরের রোজগার এই সময়টাতেই তারা করে নিতে চেষ্টা করে। কারণ আর তো তাদের তেমন রোজগারের কোন পথ নাই। যারা হজ যাত্রী, অন্যের দিকে তাকাবার ফুরছত তাদের আরো কম। এক একজন মোয়াল্লেম বা ছফীর পেছনে গড়ে বার জন করে হাজী চলে। এদের সাড়ে পোনেরো আনারও বেশী লোক আরবীতে অজ্ঞ; বাংলা ইংরেজী জানা লোকের সংখ্যাও তেমন বেশী নয়। পথে মোয়াল্লেম বা ছফীকে হারালে এদের বিপদের অন্ত নাই ঃ হারিয়ে গেলে ডরে ভয়ে, না খেতে পেয়ে কেউ কেউ মরেই যায়। কাজেই মোয়াল্লেম বা ছফীর পাছে পাছে যখন এরা চলে, তখন তাদের এদিক ওদিক তাকাবার সাহসও নাই, সাধ্যও নাই।

আমার প্রাকৃতিক শত্রুদের মধ্যে সব চেয়ে বড় হল গরম। গরম আমি সইতে পারি না। অথচ সে গরম এখানে এত পেলাম যে কেউ কেউ বলেন, গত বিশ বছরের মধ্যে এখানে এমন গরম পড়ে নাই। আমি কেবল ভয়ে ভয়ে শুনি, কিছু বলি না; কি জানি আমাকেই বা কেউ মূর্তিমান অযাত্রা মনে ভেবে এ গরমের জন্য দায়ী করে!

মক্কায় আর যে সব জিনিষ দেখলাম, তা তোমাকে রোজ-বরোজ হিসাব দিয়ে বলি।

আমরা সুলতান আবদুল আজীজ ইবনে ছউদের মেহমান হব, এ ব্যবস্থা করাচীর ছউদী দূতাবাস আগেই করে রেখেছিলেন। জেদ্দায় বসে মক্কায় ফোন করা হল; সরকারী তরফ হতে তারা আমাদের জন্য একটি মোটর পাঠিয়ে দিলেন। ৯ই সেপ্টেম্বর বাদ মগরেব আমরা সেই গাড়িতে চড়ে মক্কা শরীফ চল্লাম।

পথে যেতে যেতে অনেকগুলি মোটর-বাসের সঙ্গে দেখা হল। এরা জেদ্দা হতে হজ যাত্রী নিয়ে মক্কায় যাচ্ছিল। প্রত্যেক গাড়ীতেই যাত্রীর ঠাসাঠাসি ভীড়—যেন বিশজনের জায়গায় পঞ্চাশ জন তুলে নিয়ে চলেছে। কোন কোনটিতে অর্ধেকের বেশী লোক দাঁড়ানো; কোন কোনটি দেখে মনে হল, কলাইর বস্তার মত যাত্রীদেরকে ভরে নিয়ে লরী ছুটেছে। রাগ হল লরীওয়ালাদের উপর—ততোধিক রাগ হল যাত্রীদের উপর ঃ কেন পয়সা দিয়ে এরা এই ভেড়া বকরীর মত যায়? কেন এরা তার প্রতিবাদ করে না? এদের মুখে কি আল্লা জবান দেয় নাই?

পরক্ষণেই মনে হল; আল্লা এদের জিব দিয়েছিলেন কিন্তু আমরা সমাজপতি, রাষ্ট্রপতিরাই তো সে জিবে ভাষা ফুটতে দেই নাই। এদের মধ্যে যাদের কণ্ঠে ভাষা আছে, তারাও আজ চুপ। ভাবছে—আল্লার রাস্তায় চলেছি, একটু তকলীফ তো করতেই হবে। হঠাৎ মনে হল—তাই তো, আজ ধর্মের নিক্তিতে আমাদেরে একপাশে আর ওদেরে অন্য পাশে তুলে দিলে কোন্ দিকে পাল্লা ঝুলে পড়বে তাতে তো কোন সন্দেহ আছে বলে মনে হয় না।

জেদ্দা হতে মক্কা ৪৫ মাইল পথ; আমরা দুই ঘণ্টায় পাড়ি দিলাম। মক্কায় উঠলাম গিয়ে মিসর-হোটেলে। এইটিতে সুলতানের মেহমানদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সুন্দর চারতলা ইমারত—আছবাব পত্র, খানার সরঞ্জাম, খানা, সমস্তই পাশ্চাত্য ষ্টাইলে ঃ পরিচালক সংঘ মিসরীয়; কর্তাদের চেহারা অত্যন্ত সুন্দর, পরিবেশকরা প্রধানতঃ হাবশী—বখশীশ দিতে অকারণে বিলম্ব না করলে এরা বিনয়ী, ত্রস্ত,

হাসিমুখ ঃ কথা আরবীতে বলে; আমরা আরবী লফ্জ দুই চারটি যা জানি তাই দিয়ে চালিয়ে নিতাম। ওরা বুদ্ধিতে তুখার—ইশারাতে বুঝে যেত,—অল রাইট, ওয়েল, থ্যাঙ্ক-ইউ—এর একটা কিছু বলে চটপট সব গুছিয়ে করে ফেলত।

আমাদেরে হোটেলে নামিয়ে দিয়েই ড্রাইভার গাড়ী নিয়ে চম্পট দিল। সুলতানের গাড়ী—তারই মোতায়েন ড্রাইভার—তাঁরই প্রজা—চুরি করলে যে মনীব হাত কাটে সেই মনীবের চাকর—আমরা মোটা টিপও দিলাম। কিন্তু কুছ-পরোয়া নাই, সে আমাদের অনুরোধ সত্ত্বেও অবলীলাক্রমে অবহেলে চলে গেল। এমন একটা অঘটন যে অনায়াসে ঘটতে পারে, তার আভাষ জেদ্দা দূতাবাসের বন্ধুরা আগেই দিয়ে রেখেছিলেন। কাজেই আমরা না ঘাবড়াতেই কোশেষ করলাম। পরদিন মীনা যেতে গাড়ী ভাড়া করতে হল। ভাড়া জিয়াদা নয়; ৩ মাইল পথ, ভাড়া মাত্র পঞ্চাশ রিয়াল অর্থাৎ বাষট্টী টাকা আটগণ্ডা পয়সা। ড্রাইভারদের এমনি ভাবে গায়েব হয়ে যাওয়া ব্যাপারে নাকি সুলতানী কর্মচারীরা বিশেষ বে-রহমী করে না; তারা ভাবে—আহা! বেচারা গরীবের দল! আর বছরে একটা মাত্রই তো মউছুম—রশীটা একটু ঢিলা না দিলে ওরা দাঁড়ায় কোথায়? আমাদের নামে বাট-করা গাড়ী দিয়ে আমাদের জন্য মোতায়েন ড্রাইভার বাবাজী পবিত্র হজের যাত্রী বয়ে বয়ে কি পরিমাণ হালাল রুজীর ব্যবস্থা করেছিলেন, তার খোঁজ নেওয়ার অবকাশ আমাদের হয় নাই। তবে ছোকরার বেপরোয়া ভাব দেখে আমার মনটা খুশী হয়েই উঠল। ভাই আলী আফজালকে জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা, আমরা দেশে সরকারী গাড়ী নিয়ে কি কি করি, বান্দরটা টের পেয়েছে নাকি? নইলে আমাদের মোকাবেলা ওর এ দুঃসাহস আসে কোথেকে? তিনি বল্লেন—কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটা বিরাট তফাৎ আছে। হাজার হলেও আমাদের দেশ ভব্যতার দেশ—কালচারের মুলুক; সেখানে যারা এসব করে তারা ভদ্রভাবে চুপে চাপে করে, মনীবকে মুখের সামনে

এমনভাবে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে কখনো করে না।

তমিজুদ্দীন খাঁ সাহেব আপোষের সুরে বল্লেন—এদের ভিতরের বেদুঈন খুন এখনো ঠান্ডা হওয়ার যথেষ্ট ফুরছৎ পায় নাই কিনা, তাই। অল্প বিস্তর লেখাপড়া শিখলে, আর আমাদের মত দেশ বিদেশের সুসভ্য জাতিদের সাথে আরো ব্যাপক ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপনের সুযোগ পেলে আস্তে আস্তে এরাও ভদ্র, ভব্য সবই হয়ে উঠবে, এ আশা আমরা নিশ্চিত রকমেই করতে পারি। মৌলভী আলী আকবর খান চৌধুরী গম্ভীর ভাবে বল্লেন—তবে এই আশায় বুক বেঁধে আমরা সে সুদিনের প্রতীক্ষায় রইলাম।

আলী আকবর খান চৌধুরীর এখানে একটু পরিচয় দিতে হয়। এঁর বাড়ী আগে ছিল পূর্ব পাঞ্জাবে; হিজরত করে এসে এক্ষণে পশ্চিম পাঞ্জাবের লায়ালপুরে ওকালতী করেন। ইনি পাকিস্তান গণ-পরিষদের সভ্য ও ইস্তাম্বুল কনফারেন্সের অন্যতম প্রতিনিধি। ইনি করাচী হতে সোজা ইস্তাম্বুলে উড়ে এসে আমাদের সাথে যোগ দেন এবং তারপর হতে আমরা চারজন এক সঙ্গেই আছি। ইনি ইতিমধ্যেই আমাদের মধ্যে বড় খোকা বলে নাম করে ফেলেছেন। জাতিতে রাজপুত—দেখবার মত জোয়ান—শিশুর মত সরল—কোথায় কোন্ জিনিষ রাখেন, কিছু ঠিক নাই—নিজের জিনিষ হারিয়ে ফেলে আমাদের কারো জিনিষ সামনে পেলে কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করে তাই দিয়ে অবলীলাক্রমে নিজের কাজ চালিয়ে নেওয়া, খেতে বসে পাশে-বসা কারো গোশতের পেয়ালা আপন মনে উজাড় করে ফেলা, কারো কিছু করতে পারার সুযোগ পেলে সে সুযোগ গ্রহণের জন্য সদা উন্মুখ,—আলী আকবর খাঁর এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়। কথা প্রসঙ্গেই শুনলাম, তাঁর ওকালতীর চেম্বার বাড়ী হতে কিঞ্চিৎ দূরে। বাড়ী ফিরতে একটু বেশী রাত হলেই তার বেগম গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়েন; ভাবটা এই রকম ঃ পথ ভুলে কোথাও চলে গেল নাকি, দেখি, খোঁজখাঁজ করে কুড়িয়ে নিয়ে আসি।

হোটেলে একটু বিশ্রাম অন্তে ওজু করে নিলাম, তারপর বিছমিল্লা বলে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তাঘাট, অলি-গলি হজ যাত্রীতে ভর্তি। পথ বোঝাই হজ যাত্রী, পথের এপাশে ওপাশে বসে আছে হজ যাত্রী, একটু দূরে দূরে খোলা আকাশের নীচে বালির উপর শায়িত হজযাত্রী। জোয়ান-বুড়া, সবল-দুর্বল, নারী-পুরুষ, কালা-ধলা হরেক রকম হাজার হাজার, হয়তো লাখো হজ যাত্রীতে মক্কা গিজ গিজ।

আমরা প্রথমে বয়তুল্লা তওফ করতে গেলাম। বয়তুল্লা মানে আল্লার ঘর, আর তওফ মানে প্রদক্ষিণ। মনে হল, চার হাজার বছরের ইতিহাস এই বয়তুল্লা আর তওফের সাথে বিজড়িত হয়ে আছে।

হজরত ঈছা আলায়হেচ্ছালামের দুই হাজার বছরেরও আগের কথা। তখন মহান আল্লার কথা মানুষ ভুলে গেছে; দেবদেবী, পাহাড়-পর্বত, নদীসাগরের পূজায় দুনিয়া ভর্তি।

সেই সময় মেসোপটেমিয়ায় হজরত ইব্রাহীমের জন্ম—দুর্দোণ্ড-প্রতাপ সম্রাট নমরুদের রাজধানীতে—তাঁরই মন্দিরের প্রতিমা-নির্মাতা আজরের ঘরে।

তরুণ বয়সেই ইব্রাহীম প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে দিলেন ঃ বল্লেন, এ পূজায় ফায়দা নাই, তোমরা এ ধর্ম ছাড়, আল্লার এবাদতে ফিরে এস। একদিন তিনি রাজমন্দিরের কয়েকটি দেব-মূর্তির মাথা কেটে পূজারীদেরে বল্লেন—তোমাদের ত্রিকালের এই যে ত্রাতা, এদেরই জিজ্ঞাসা কর, কে এদের মাথা কেটেছে।

কথা সম্রাট নমরুদের কানে গেল। তিনি বিচার করে শাস্তির আদেশ দিলেন—এই ধর্মদ্রোহীকে আগুনের কুণ্ডে ফেলে পুড়ে মার—এক্ষণি। শেষ শব্দের সঙ্গে সম্রাটের ক্রুদ্ধ কণ্ঠ গর্জে উঠল।

বিরাট লাকড়ীর স্তূপ—হাজার হাজার দর্শক—স্তূপে আগুন দিতেই তার সমগ্র শিখা আকাশে লক লক লাফিয়ে উঠল—ইব্রাহীমকে তারই মধ্যে নিক্ষেপ করা হল—দর্শকরা কেউ ইব্রাহীমের উপর তুষ্ট নয়,

তবু স্বাভাবিক করুণা বশে মুহূর্তের জন্য তাদেরো চোখ বুঁজে এল। তারপর ভয়ে ভয়ে তারা চোখের পাতা খুল্ল—ভয়ে ভয়ে কুণ্ডের ভিতরের দিকে নজর করল—দেখল—চোখ মুছে আবার দেখল—জ্বলন্ত আগুনের কুণ্ডে বসে ইব্রাহীম ফুলের মত হাসছে!

প্রভুত্ব লালিত গর্বিত অসত্যের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম, তাতে এমনি ভাবে সহায়হীন সত্যের সৈনিক জয়লাভ করলেন।

হজরত ইব্রাহীম হলেন সত্যের বাণীর বাহক—পয়গম্বর। এই পয়গম্বর ইব্রাহীম একদা এলেন মক্কায়। এখানে তিনি নিজ হাতে তৈয়ার করলেন আল্লার এবাদতের জন্য একটি পাথরের ঘর—এই-ই বয়তুল্লা।

বহু আবর্তন বিবর্তনের ভিতর দিয়ে এসেছে এই উপাসনালয়। কখনো ভেঙ্গেছে, আবার মেরামত হয়েছে; কখনো ভ্রান্ত মানুষ আল্লার ঘরে এনে বসিয়েছে কাঠ, পাথর, মূর্তি, দেবতা, উপদেবতা। শেষ পয়গম্বর হজরত মুহম্মদ মুস্তফা (দঃ) একে ফের একমাত্র মহান আল্লার এবাদতের জন্য নিয়োগ করেন।

বয়তুল্লার চার পাশে তওফ করতে করতে মোনাজাত করলাম, আমাদের জীবনের সমস্ত কল্পনা, সমস্ত কথা, সমস্ত কাজ এমনি ভাবে সত্যকে কেন্দ্র করে যেন নিয়ন্ত্রিত হয়।

তারপর গেলাম ছাফা আর মারোয়ার মাঝখানের পথে। কয়েকবার যাতায়াত করলাম। একদা এই দুই পাহাড়ের মাঝখানের পথে মা হাজেরা শিশু ইছমাইলের জন্য পানির খোঁজে বেকরার হয়ে আকুলি-বিকুলি করেছিলেন;—সেই নির্বাসিতা অসহায়া নারী, সেই মহিয়সী জননী যিনি অপরিসীম অভাব ব্যথার মধ্যে তাঁর একমাত্র পুত্রকে বুকের তলে রেখে মানুষ করে অবশেষে হাসিমুখে আল্লার রাস্তায় কোরবান করতে পাঠিয়েছিলেন ঃ শয়তান এসেছিল তাঁর কানে কুমন্ত্রণা দিতে—তিনি পাথর ছুঁড়ে শয়তানকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

১১ই সেপ্টেম্বর। মীনা যেতে হবে। কিন্তু গাড়ী নাই। গাড়ী খুঁজতে খুঁজতে দুপুর হয়ে গেল। বাইরে ভীষণ রোদ—ভিতরে বিষম গরম। কিন্তু যেতে তো হবেই অবশেষে সেই রোদের মধ্যেই চল্লাম—গাড়ীতে। অনেকগুলি সরকারী তাঁবু টানানো ছিল—তারই একটিতে গিয়ে উঠলাম।

সন্ধ্যার আগে সংবাদ পেলাম—এক জায়গায় রাস্তার পারে দুটি পাকিস্তানী হজযাত্রী বিপন্ন—একটির অসুখ, আর একটি হারিয়েছে তার মুয়াল্লিম। খোন্দকার আলী আফজাল ও চৌধুরী আলী আকবরকে সঙ্গে নিয়ে তাদের খোঁজে বের হলাম। মুয়াল্লিম-হারা লোকটির একটা ব্যবস্থা হল। ব্যারাম লোকটির তখন জবান বন্ধ—রাস্তায় পড়ে আছে। পাকিস্তান মেডিকেল মিশনে গিয়ে একজন ডাক্তার ডেকে আনলাম। তিনি দেখে বল্লেন—সর্দিগরমি। চোখে-মুখে-মাথায় বরফপানি দেওয়ায় তার হুশ হল। বাঙ্গালী। ছউদী সরকারের হাসপাতাল কাছে ছিল, সেইখানে গেলাম। সেখানে রোগীর বিষম ভীড়। একই ব্যারাম—সর্দি-গরমি। বলে কয়ে একটা ষ্ট্রেচারের ব্যবস্থা করে রোগীটিকে হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে দিলাম। পরদিন ভোরে চল্লাম আরফাতের ময়দানে; রোগীটির আর খোঁজ নেওয়া সম্ভব হয় নাই।

১২ই সেপ্টেম্বর সমস্তদিন আরফাতে রইলাম। আরফাত মানে সাক্ষাৎ—মিলন। সুতরাং আরফাতের ময়দান মানে মিলনের ময়দান। আরফাত এক বিরাট মরুময় ময়দান, তার বুকে বালি আর বালি; তার চারিদিকে গাছপালা-লতা-পুষ্পহীন নির্মম পাহাড়। একটি পাহাড়ের নাম জবলুর-রহমত—রহমতের পাহাড়।

মিসরের এক বন্ধু কাছে ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, এর নাম রহমতের পাহাড় হল কেন? তিনি বল্লেন—শোনা যায়, দীর্ঘ বিরহের পর এই পাহাড়ের কোলে হজরত আদম আর হাওয়ার পুনর্মিলন হয়; আর এই পাহাড়ের পাশে দাঁড়িয়েই নাকি মহানবী মুহম্মদ (দঃ) তাঁর

বিদায় হজের খোতবা দিয়েছিলেন।

বিদায় হজের খোতবা! ওহ্! অমন মহান বক্তৃতা দুনিয়ার ইতিহাসে বুঝি আর দ্বিতীয়টি নাই।

স্মৃতির মুকুরে তেরশ বছরেরও আগের এক বিচিত্র ছবি ভেসে উঠল ঃ

মহানবী তাঁর জীবনের শেষ হজের বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়েছেন ঃ সামনে আসীন হাজার হাজার মানুষ—আনছার, মুহাজেরীন, আরো বাইরের কত লোক।

শুধু আনছার মুহাজেরীনের
নহে আজি সমাবেশ
মহা মানবের মহা আহ্বানে
মিলেছে সকল দেশ।

সেই বিপুল জন-সংঘের সামনে দাঁড়িয়ে হজরত বক্তৃতা দিচ্ছেন। অপূর্ব প্রেরণায় তাঁর দিলের দরিয়া দুলে উঠেছে, অভূতপূর্ব আবেগে তাঁর সে স্বভাবতঃ শান্ত কণ্ঠও ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছে; আর সে জোশের জোয়ারে, তাঁর সে বক্তৃতার আবেদনের আকুলতায় শিহরণ জেগেছে আরফাতের বালি-কণার বুকে বুকে, আরফাতের পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়, আরফাতের হাওয়ার পাখায় পাখায়, হয় তো বা অন্তরীক্ষের অদৃশ্য তারায় তারায়।

আরফাতের সে বালি, সে পাহাড়, সে হাওয়া আজো বুঝি সে খোতবা ভুলতে পারে নাই; বছরে বছরে এই হজের দিনে আজো বুঝি তাদের বুকে বুকে সেই অবিস্মরণীয় খোতবার অনুরণন ধ্বনি মুহুর্মুহু জেগে ওঠে।

আরফাত ময়দানের চারিদিকে নতুন করে চাইলাম ঃ তাঁবু আর তাঁবু—সে তাঁবুর বুঝি অন্ত নাই। কত বিচিত্র মানুষের সমাবেশ! কালা ধলা, ধনী গরীব—আর্য অনার্য, সর্বদেশের সর্বশ্রেণীর মানুষ

একই এহরামের পোষাকে আজ এখানে হাজির। জবলুর-রহমতের দিকে মুখ ফিরিয়ে চাইলাম; মনে হল, সেখান হতে আজো ভেসে আসছে মহান নবীর সেই মহান বাণী ঃ

চরণে দলিনু অন্ধযুগের
বংশ-অহংকার,
ভাই ভাই মিলি মুছলিম যত
এক মহা পরিবার।
নাহি ভেদাভেদ আজমী আরবী,
এক আদমের সন্তান সবি,
ধূলায় রচিত আদম তনয়,
গরব কিসের তার?

ময়দানের কোন কোন তাঁবুতে নারীর আনাগোনা দেখছি। এঁরা দুনিয়ার নানা দেশ হতে স্বামী বা পুত্রের সাথে হজ করতে এসেছেন। ধর্মে নরের যে অধিকার, নারীরও সেই অধিকার, নারীর প্রতি এ আমাদের মহান নবীর অন্যতম অমূল্য অবদান। পথের কষ্টে অধিকাংশ নারীই হয়রান—কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সেই অসুস্থ শরীর বহন করেই এঁরা এখানে এসে হাজীর হয়েছেন। এঁদের প্রতি স্বামীদের যত্নের অন্ত নাই—সমস্ত প্রাণ দিয়ে এঁদের শুশ্রূষা করে যাচ্ছেন। দেখছি আর ভাবছি, এমন সময় মনে হল যেন আরফাতের হাওয়ার বীনায় বিদায়হজের সেই অপূর্ব আবেদনের রেশ আজো ক্ষণে ক্ষণে বেজে উঠছে ঃ

সাবধান, ভাই, সাবধান সব—
তোমাদের পুরনারী!
পুণ্য শপথে বরিয়া লয়েছ
মহাদান বিধাতারি।
তাহাদের প্রতি তোমা সবাকার
দিয়াছে বিধাতা যেই অধিকার,

তোমাদেরো পরে সেই অধিকারে
তাহারাও অধিকারী।

বেলা বাড়তে লাগল। আরফাতের বালি, পাহাড় গরম—আরো গরম—অবশেষে দুপুর পর্যন্ত যেন আগুন হয়ে উঠল। হাওয়ার তরঙ্গে তরঙ্গে আগুনের হলকা ছুটতে লাগল। চেয়ে দেখি, সেই আগুন-ঝরা আকাশের তলে জবলুর-রহমতের উত্তপ্ত পাষাণ পরে খালি মাথায় দাঁড়িয়ে হাজার হাজার মানুষ। আল্লার রহমতের পাহাড়—এই পাহাড়ের উপর গিয়ে ক্ষণিক দাঁড়িয়ে দুটি দোওয়া পড়লে বে-এন্তেহা ছওয়াব, মুয়াল্লিমদের কাছে এরা এই খবর শুনেছে, আর সেই পুণ্যের অন্বেষণে এরা আগুনের দাহকে অবহেলে অগ্রাহ্য করেছে।

জ্ঞান-বৃদ্ধ বন্ধুরা কেউ কেউ হয়তো আড় চোখে কটাক্ষ করবেন; কেউ কেউ হয়তো ঠোঁটের কোণে ক্ষণিক হাসির উদ্রেক করে বিজ্ঞতার অভিনয় করবেন; কেউ কেউ বা পরম অবজ্ঞার সঙ্গে বলে ফেলবেন ছেলেমি—নিছক ছেলেমি বিশ্বাস—কুসংস্কার—একদম - - -।

আমি অমন কিছুই ভাবতে পারি নাই। আমার মনে হয়েছে, একটা ক্ষুদ্র জনপদের শুধু শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের কেবল রাজনৈতিক অধিকার অর্জনে আরো হাজার হাজার জনের সহযোগিতায় সংগ্রামে নেতৃত্ব করার জন্য জর্জ ওয়াশিংটনের কবরের উপর জগতের বিভিন্ন দেশের সুসভ্য রাষ্ট্রনায়কেরা যদি সগৌরবে ঘটা করে ফুলের মালা দিয়ে তৃপ্তি লাভ করতে পারেন, তবে যেখানে দাঁড়িয়ে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকল ধন-পীড়িত, সকল জন-পীড়িত, সকল বর্ণ-পীড়িত, সকল আভিজাত্য-পীড়িত, সকল প্রতিহিংসা-পীড়িত—এক কথায় সকল যুগের সকল দেশের সকল শ্রেণীর নিপীড়িতদের জন্য একা হজরত মুহম্মদ তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে মুক্তির বাণী ঘোষণা করেছেন—যে বাণীর দৌলতে দেশে দেশে যুগে যুগে অগণ্য নরনারী অকথ্য জুলমের হাত হতে রেহাই পেয়ে আসছে,—সেইখানে দাঁড়িয়ে যদি কেউ আল্লাকে ডেকে বলে—হে

প্রভো, এই স্থান হতে উদ্‌গত মহাপুরুষের সেই আজাদীর বাণী আমাদের জীবনের সর্বস্তরে যাতে রূপায়িত করে তুলতে পারি, সেই আশীর্বাদ, সেই শক্তি আজ তোমার হুজুরে আমরা চাই—এই মোনাজাত যারা করে তাদের কথা ভেবে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ছাড়া আর কিছু তো কল্পনা করা সম্ভব নয়।

ক্রমে পূর্বের সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ল। ধীরে গরম কমে এল; কিন্তু গেল না। আমরা আরফাতেও ছউদী সরকারের মেহমান ছিলাম। কাজেই বরফের পানি আমরা ঘন ঘনই পেলাম। খোলা তাঁবু, ঠাণ্ডা পানি, পাখার বাতাস—এসবের দরুন আমাদের কষ্ট কমই হল। সাধারণ যাত্রীদের এসব সুবিধা ছিলনা বল্লেই চলে। কিন্তু তাদের ঈমানের জোর ছিল প্রচুর; তাই এসব অসুবিধাকে তারা মোটেই গ্রাহ্য করলনা।

অভিজ্ঞেরা বল্লেন, ১৯৩২ সালে একবার হজের মৌছুমে ভীষণ গরম পড়েছিল; ১৯ বছর পরে এবার আবার তেমনি গরম পড়েছে। সেবার বহু যাত্রী সর্দিগরমিতে মারা গিয়াছিল এবারও নাকি প্রায় তিন হাজার যাত্রী মক্কা মীনা আরফাতে সর্দিগরমির ফলে মারা গিয়েছে।

আরফাতে আমরা জোহর, আছর ও মগরেবের নামাজ পড়লাম। আমাদের দেশের ঈদের জামাতের মত কোন বড় জামাত হল না; বিভিন্ন তাঁবুতে ছোট ছোট জামাতে যাত্রীরা নামাজ পড়ে নিলেন। ঈদের খোতবার মত হজের কোন খোতবাও কেউ দিল না।

বার বার মনে হল, এত দেশের এত মানুষ আমরা এক ময়দানে হাজির হলাম, অথচ আমাদের মধ্যে কোন পরিচয়, কোন আলাপ, কোন আলোচনা কিছুই হল না; আমরা বিভিন্ন তাঁবুর আঙিনায় পৃথকই রয়ে গেলাম। যে পরিমাণে আমরা এই পরিচয় ও আলোচনার সুযোগ গ্রহণে স্বেচ্ছায় বিরত রইলাম, আমাদের হজের উদ্দেশ্য সেই পরিমাণে ব্যর্থ হল না তো?

আরফাতের যে পরিবেশ, তাতে, অন্ততঃ গরমের মৌছুমে,

বাস্তবিক কোন বড় সভা সমিতির সুযোগও নাই।

কিন্তু এও মনে হয় যে সরকার চেষ্টা করলে এ সুযোগের অন্ততঃ আংশিক ব্যবস্থা হতে পারত। মক্কা ও জেদ্দায় দেখলাম, নিয়ম মত পানি দিলে মরুভূমিতে ছায়াদার গাছ বেশ জন্মায়। আরফাতের ময়দানে অমন ছায়াদার গাছের যথেষ্ট ব্যবস্থা হতে পারে। টাকা খরচ হবে সত্য, কিন্তু যে যাত্রীদের দৌলতে ছউদী সরকারের তহবিলে এত টাকার আমদানী হয়, তাদের জন্য এ কাজ করা তো সর্বাংশেই সঙ্গত।

ছায়াদার গাছের আবাদ হলে যাত্রীরা গরম হতে বাঁচে, তাদের বসে সভা করার একটা পথ হয় ঃ বিশ্ব-মুছলিম কনফারেন্সের অধিবেশন সম্ভব হয়ে ওঠে।

বাদ মগরেব অন্যান্য যাত্রীদের সাথে মজদালফায় চলে এলাম। এখানেও ছউদী সরকারের মেহমান রইলাম; কিন্তু রাত্রিতে ঘুমাতে হল বালির তোষকের উপর, এক রাত্রির জন্য এখানে খাটিয়ার ব্যবস্থা সম্ভব হয় নাই। রাত্রিতে আমাদের তাঁবুর বাইরে বের হলাম ঃ আরফাতের ময়দানের মত এখানে অত তাঁবু নাই; বেশীর ভাগ যাত্রীই আছমানের নীল সামিয়ানার তলে শুয়ে পড়েছে। কয়েকজন মিসরী মহিলাকে দেখলাম ঃ নিঃসন্দেহ লক্ষপতির ঘরের বৌ, গায়ের রং শুভ্র, আরাম আয়াস ও অফুরন্ত পুষ্টিকর খাদ্যের চিহ্ন সর্বাঙ্গে পরিস্ফুট ঃ হাত দেড়েক উঁচু হয়ে বালির উপর শুয়ে আছেন। সাথে যাঁরা পুরুষ, তাঁরাও দেড় হতে দুই হাত উঁচু হয়েই শায়িত। বয়স সবারই পঞ্চাশের উপর।

এঁদের মনের ছবি যেন আমার চিত্ত-তলে ফুটে উঠল। আজন্ম এরা ঐশ্বর্যের কোলে গড়াগড়ি দিয়ে এসেছে। চাওয়ার আগেই এরা পেয়েছে অপর্যাপ্ত ভোগের উপকরণ; আর কৈশোর যৌবনের সমস্ত শক্তি দিয়ে এরা ভোগও করেছে নিরুদ্বেগে—অবিশ্রান্ত ভাবে। তারপর এদের ভোগের শক্তিতে শুরু হয়েছে অনিবার্য ভাটা। ক্রমে দাঁত জব দিয়ে ধসছে, চোখের আলো নিভে আসছে, পেট আগের মত খাদ্যের বোঝা বইতে

নারাজ, পা দেহের বোঝা বয়ে বয়ে হয়রাণ। ব্যথার সঙ্গে এদের মনে হয়েছে—তবে কি এ ভবের খেলা সাঙ্গ হয়ে এল? সামনে কি বিদায়ের আয়োজন? ওপারে যাওয়ার খেয়া নৌকা কি কিনারে এসে পড়ল? তবে তো আর দেরী করা চলে না। বিদায় পথের সম্বলের আয়োজন কর ঃ জলদী, অজানা পথের যাত্রী, জলদী!

এরা মক্কা মদীনায়, মীনা মুজদালফায়, আরফাত বায়তুল মোকাদ্দেছে সেই সম্বল কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। উদ্দেশ্য এদের মহৎ, ঈমান এদের মজবুত—এদেরে ছালাম।

একটি পশ্চিম পাকিস্তানী মহিলার সঙ্গে দেখা। পাগলিনীর মত কেঁদে ফিরছে ঃ পাঞ্জাবী ভাষায় বলছে—ওগো! কে আমার বোনকে এনে দিবে?—কে?—ওগো কে? চৌধুরী আলী আকবর খাঁ পাঞ্জাবী—তিনি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। স্ত্রীলোকটি যা বল্ল তার মর্ম এই ঃ 'আমরা দুই বোন হজে এসেছিলাম। আরফাত হতে মুজদালফা আসার পথে আমার বোনটি সর্দিগরমিতে পথে পড়ে গেল। অনেক শুশ্রূষা করলাম, কিন্তু সে উঠে দাঁড়াতে পারল না। এরই মধ্যে যাত্রীর কাফেলা শেষ হয়ে এল ঃ আমি সেই বিজন মরুপথে বোনের পাশে একা থাকতে সাহস পেলাম না; ভয়ে চলে এলাম। কিন্তু এখন যে তার মায়ায় আমি আর থাকতে পারি না!' তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, তোমার বোন কোথায় আছে চিনতে পারবে? সে বল্ল—নিশ্চয় পারব, নিশ্চয়।

আমাদের মোটর নিয়ে আলী আকবর খাঁ ও খোন্দকার আলী আফজাল তখনি মেয়েলোকটিকে সাথে করে ছুট দিলেন। অনেকক্ষণ পর এসে বল্লেন—আফছোছ, রোগিনীর কোনও খোঁজ করতে পারলাম না!

১৩ই সেপ্টেম্বর আমরা মুজদালফা ছেড়ে বের হলাম; পথে পাথর ছুড়লাম, তারপর মক্কার হোটেলে চলে এলাম। সেখানে তৃপ্তির সঙ্গে গোছল করে ময়লা কাপড় বদলিয়ে বৈকালের দিকে মীনা ময়দানে এসে হাজির হলাম।

১৪ই সেপ্টেম্বর আমরা মীনায় কোরবানী দিলাম। মনে পড়ল কাজী নজরুল ইসলামের কথা ঃ

এই দিনই মীনা ময়দানে
পুত্র স্নেহের গরদানে
ছুরি হেনে খুন ক্ষরিয়েনে
রেখেছে আব্বা ইব্রাহীম সে আপনা রুদ্রপণ
ছি! ছি!! কেঁপনা ক্ষুদ্র মন!

মীনায় কোরবানী করার যে ব্যবস্থা তা সন্তোষ জনক নয়। আমি, চৌধুরী আলী আকবর খাঁ ও খোন্দকার আলী আফজাল সকালের দিকেই দুম্বার বাজারে চল্লাম; মৌলভী তমিজুদ্দীন খাঁ সাহেব তাঁবুতে রইলেন, তাঁর জন্য কোরবানীর পশু খরিদের ভার আমরা নিলাম।

আমরা বাজারের পথে চলেছি। বেলা মাত্র সাড়ে আটটা; তবু গরমে পথ চলা ভার; সূর্য্যিমামা ইতিমধ্যেই উপর হতে আগুনের পিচকারী ছুড়তে শুরু করেছেন। রাস্তা কাঁচা—বালি, কঙ্কর আর ধুলোয় ভরা। মানুষের অসম্ভব ভীড়। আরো বিপদ, হজের মৌছুমে মক্কা মদীনা মীনা আরফাত—কোন খানেই মানুষ একা একা চলেনা, ঝাঁকে ঝাঁকে চলে। এক একজন মুয়াল্লিম বা ছফীর পেছনে চলে ছয় হতে দশ পনর জন যাত্রী। এ যাত্রীরা অনেকেই আরবী ভাষা জানেনা, হয়তো বিদেশে বের হয়েছে এই প্রথম, এদের কেউ কাফেলা হারালে তার বিপদের অন্ত নাই। কাজেই এরা যখন মুয়াল্লিম, ছফী বা অমন কোন চালকের পেছনে ঝাঁক বেঁধে চলে, তখন তাদের গতি দুর্বার হয়ে ওঠে। কেউ একটু পেছনে পড়ে গেলে সে ঝাঁকে যোগ দেওয়ার জন্য যে দৌড় দেয়, সে যেন বাঘ-তাড়ানো মানুষের দৌড়; সামনের মানুষের পা মাড়াবে, নাক ভাঙবে, কাপড় ছিঁড়বে, না ধাক্কা দিয়ে তাকে মাটিতে ফেলে দেবে, তার কিছু ঠায়ঠিকানা থাকে না। সুতরাং নিতান্ত হুশীয়ার হয়ে না চল্লে বিপদ।

কিন্তু বিপদের আশঙ্কার এখানেই শেষ নয়। পথে মানুষ ছাড়া

আরো জীব চলে। যেতে যেতে হঠাৎ চেয়ে দেখি—ওরে বাপরে! উষ্ট্রনামক সেই মহাপ্রাণীদের একজন তাঁর বঙ্কিম গ্রীবা আমার মাথার উপর লীলায়িত করে দিয়ে ভাবছেন, তাঁর কদম মোবারক আমার দেহের কোন্ স্থানে তিনি স্থাপন করবেন। ভয়ে এক পাশে সরে যাই, হয়তো কাউকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেই। এহ্রাম-বাঁধা হজযাত্রী—মাছিটির উপর পর্যন্ত হাত তুলতে নাই, নইলে এই অকারণ ধাক্কার বদলায় যে একটা সকারণ মুষ্ট্যাঘাত অবিলম্বে বর্ষিত হত, এতে আমার দিলে বিন্দুমাত্র শক-শোবা নাই। সরে গিয়ে মুখ তুলে ভাল করে চেয়ে দেখি—একটি উট নয়, উটের বহর—হয়তো পনর কুড়িটি একটির পেছনে একটি সারি বেঁধে চলেছে। আরবেরা সৌখীন মেজাজের মানুষ। তারা নিজেরা সাজ গোজ ভালবাসে, তাদের পালিত পশুকেও তারা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে। উটের পিঠের গদিটি সুন্দর; হয়তো ইরানী কার্পেটে ঢাকা, চারজামা বিচিত্র—তার হাশিয়ায় ঝুলানো ঝালর—হিজল ফুলের মত সুন্দর; তার গলায় পুঁতির মালা, তার গায় আঁকা নানা রং-এর লতাপাতা, তার পায় ঘুংঘুর, তার মাথায় টিকলী। সবই তার সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য; কেবল তার নাক বিঁধানোটা নোলক পরনোর জন্য নয়, একটা অকাব্যিক আনশিভালরাস কাজের জন্য।

আরবেরা উটকে সত্যি ভালবাসে। কিন্তু উট তাদের এত কাজে লাগে বলেই যে তারা তাকে ভালবাসে, এমন নয়, উটকে তারা নিতান্ত সুন্দর জীব বলেও মনে করে।

কিন্তু মীনাবাজারের এই ভীড়ের মধ্যে চলতে চলতে যে এত কথা ভাবতে শুরু করে দিলাম, এই সুযোগে আবার আর একটা কিছু তো ঘাড়ে এসে পড়বেনা?

ঐ যা! যা আশঙ্কা করেছিলাম, আখেরে তাই হল! ছওয়ার সমেত একটা গাধা এসে ঘাড়ের উপর চড়ে বসে আর কি! লাফ দিয়ে সরে দাঁড়াতে গিয়ে একজন সহযাত্রীর পা ভীষণ ভাবে মাড়িয়ে দিলাম।

ভদ্রলোক সহিংস ভাবে কটমট কটাক্ষ করে অহিংস ভাবে চলে গেলেন; রাগের মাথায় 'ইন্না লিল্লাহে----' টুকুও পড়লেন না। আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে শুকোর-গুজারী করতে করতে যাঁরা হজের মৌছুমে এহ্‌রাম বেঁধে অহিংস জীবন যাপনের নিয়ম প্রবর্তন করেছিলেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে ছালাম জানালাম।

হ্যাঁ, বলছিলাম গাধার কথা। গাধার গলায় ঘন্টা থাকে, তা ছাড়া গাধার ছওয়ারও হেই-হেই করতে করতে পথ চলে; পথিকেরা শুনে সরে দাঁড়ায়; কেবল আমার মত পথিকের বিপদ। এত বার গাধার পায়ের তলে পড়ি পড়ি করে যে বেঁচে গেলাম, এতে মাঝে মাঝে আমার মনের গোপন কোণে প্রশ্ন জেগেছে ঃ ওরা যে আমাকে এত খাতির করে তার মানেটা কি? আমাকে স্বজাতীয় বলে সন্দেহ করে না তো?

ছোট বেলা হতে শুনে আসছি ঃ মক্কাতেও গাধা আছে। মক্কা শরীফে এসে নিজ চোখে যা দেখলাম, তাতে বলতে হয়—মক্কাতেই গাধা আছে। এত গাধা তো আমি আর কোন শহরে দেখি নাই। আরব ভাইরা ক্ষেপবেন না—আমি কেবল চতুষ্পদশ্রেণীর কথাই বলছি, দ্বিপদ-দের কথা নয়। ঘোড়া তো আরবে দেখলাম না বল্লেই চলে। দুলদুলের বংশধরেরা হঠাৎ কোথায় গেল, জানিনা, তবে চোখে দেখলাম—কেবল গাধা আর গাধা। তাদের স্বাস্থ্য ভাল, চলন ভাল, বোঝা বহনের শক্তি অসাধারণ। খাদ্য খাওয়া সম্বন্ধে কোন কবিরাজ হাকিমের হুকুম মানে না; রাস্তায়-পড়া বিলাতী দুধের টিন পর্যন্ত কুড়িয়ে খায়। গাধার লীভারের আরক দিয়ে অগ্নিমান্দ্যের ভাল ঔষধ হওয়ার কথা। এক বন্ধুকে বল্লাম, গাধার এত নিন্দা শুনি, কিন্তু নিন্দার তো কিছুই চোখে পড়ল না। তিনি বল্লেন, চোখে পড়ল না, কিন্তু কানে পড়বে—উনি মেহেরবাণী করে একটু ডাকা শুরু করলেই হয়। আমি বল্লাম, 'কিন্তু আমার মত সংগীত-বিশারদেরা যখন ভাবের আবেগের অনিবার্য আতিশয্যে এদিক ওদিক চেয়ে হঠাৎ গেয়ে ওঠে, তখন তো তাদেরে (মনে মনে

যিনি যাই বলুন না কেন,) প্রকাশ্যে কেউ গাধা বলেন না।' বন্ধু আমার সাথে একমত হয়ে বল্লেন—হাঁ, এ ডিসক্রিমিনেশন সত্যি নিন্দার্হ। তবে ওদের যে আর একটি খাছিয়ত আছে তার কি? ওদেরে একখানে ছেড়ে দিয়ে গেলে সে জায়গা কিছুতেই ছাড়ে না, মনিবের বাড়ীও যায় না, কারো ক্ষেত খোলাতেও নামে না; ঐ খানেই থাকে। আমি বল্লাম, এ তো মহৎ গুণ। এগুণের জন্য ক্যাসাবিয়াঙ্কাকে যদি প্রশংসা করতে পার, তবে তোমার এ আপন জনকে প্রশংসা করতে পার না কেন?

বন্ধু রেগে বল্লেন—গাধা সম্বন্ধে যত কিছু বল, সব স্বীকার করে নিতে রাজী, কিন্তু গাধারা আমার আপন জন, এ অপবাদ আমি কিছুতেই বরদাশ্‌ত করতে পারব না। ভাবলাম, বন্ধু সত্য কথাই বলেছেন। মানুষের সমাজে তো আমরা এই কাজই বরাবর করে আসছি। গাধাদেরে গাধার মত খাটাই, কিন্তু আপন বলে পরিচয় দিতে ঘোরতর আপত্তি করি।

ইতিমধ্যে আমরা দুম্বার বাজারের দুয়ারে গিয়ে হাজির হলাম। প্রাচীর দিয়ে ঘেরা বাজার, দুয়ারে অসম্ভব ভীড়। ভীড় ঠেলে ভিতরে ঢুকে দেখি, সেখানেও ভীড়ের অন্ত নাই।

ভেবেছিলাম, কোরবানীর এমন মহান স্মৃতি বিজড়িত পবিত্র স্থান—এখানে হজরত ইব্রাহীমের মত নিজ হাতেই কোরবানীর ছুরি ধরব। তাই তাঁবু হতে ওজু করে গিয়েছিলাম। কিন্তু বাজারের ভিতরে গিয়ে অবস্থা দেখে সে সংকল্প টুটে গেল। লোকের ভীড়ে দাঁড়িয়ে থাকা কঠিন; তারই মধ্যে ছুরি হাতে হাঁড়ানো মানুষ—এরা প্রধানতঃ হাবশী। কেউ কোরবানীর পশু কিনলে এরা কাছে এসে দাঁড়ায়, দুম্বা সেই ভীড়ের মধ্যেই মাটিতে পেড়ে ফেলে, তারপর দুম্বার দুই পা নিজ পায়ে দাবিয়ে ধরে বাঁ হাতে ধরে তার মাথা, ডান হাতে বিছমিল্লাহে আল্লাহু আকবর বলে গলায় চালিয়ে দেয় ছুরি। এর পর দুই হাতে দুম্বাটা ধরে দূরে ফেলে দেয়—যেখানে আগে-কোরবানী-করা দুম্বা স্তূপ গড়ে পড়ে আছে।

মনে হল, ওখানকার লোকদের কাছে কোরবানী জিনিষটা একটা

প্রাণহীন বাঁধাধরা গৎ হয়ে পড়েছে। ঐ ভীড়ের মধ্যে অমন অবস্থায় নিজ হাতে কোরবানী করতে আমার উৎসাহ রইল না। একজনকে দুই রিয়াল নজর দিয়ে কোরবানী করিয়ে নিলাম।

হজ উপলক্ষে মীনাতে যত পশু কেরবানী হয়, হাজী আর স্থানীয় লোকে মিলে তার গোশত খেয়ে কাবার করতে পারে না। বিপুল পরিমাণ গোশ্‌ত নষ্ট হয়; চামড়ার অবস্থাও হয় তো তাই-ই হয়ে থাকে।

ঐ দিন অপরাহ্ন। আমাদের তাঁবুর অদূরে একটি সুন্দর দালান—চারিদিকে দেয়াল। দেখতে গেলাম। অনুমতি ছাড়া ভিতরে যাওয়ার হুকুম নাই; কিন্তু আমাদের দেখে কি জানি কেন দুয়ারী দুয়ার খুলে দিল। ভিতরের দালানের বারান্দায় গিয়ে উঠলাম। একটি পাতলা ছিপ-ছিপে অত্যন্ত সুন্দর চেহারার লোকের সঙ্গে দেখা হল। পরিচয়ে জানলাম—সমস্ত জিনিষটি পানি সরবরাহের একটি প্রতিষ্ঠান; মিসর অধিপতি মুহম্মদ আলী পাশা দ্বারা স্থাপিত—এর জন্য আলাদা ওয়াকফ সম্পত্তি আছে—ছিপছিপে ভদ্রলোক এই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার—নাম আলী আল-গাজ্জালী—বিলাত ফেরত—মাঝে মাঝে ইছলামিক রিভিউয়ে লেখেন—অত্যন্ত ভদ্র—আমাকে নামে চিনলেন—কমলা লেবুর শরবত দিলেন—বিদায় কালে পরম বিনয়ের সঙ্গে বল্লেন—কখনো কোন অসুবিধা হলে আমাকে বলবেন, আমাকে দিয়ে যে কোন খেদমত হয় আনন্দের সঙ্গে করব।

এঁর কাছে শুনলাম, মক্কা শরীফে মুহম্মদ আলী পাশা স্থাপিত একটি এতিম-বিদ্যালয়ও আছে, আলী আল-গাজ্জালী তারো তত্ত্বাবধায়ক।

সন্ধ্যায় তাঁবুতে ফিরে দেখি, দুয়ারে একটি বুড়া মানুষ বসা। জিজ্ঞাসা করলাম, কে? উত্তর দিল—'আমি একজন বাঙ্গালী হজযাত্রী—বাড়ী ত্রিপুরা জিলার কছবা থানায়—মালুম হারিয়ে ফেলেছি, এখন নিরুপায়।' জিজ্ঞাসা করলাম, এ তাঁবু দেখিয়ে দিল কে? বল্ল—একটি

লোক আমাকে এ পর্যন্ত নিয়ে এসে বল্ল—এইখানেই বসে থাক, আমি একটু পরেই আসছি। সে লোক আর এল না। বুঝলাম, লোকটি ভেবেছে —এইখানে রেখে যাই—একটা হিল্লা এরা করবেই। ফিরে আসার কথাটা ফাঁকি—বুড়ার হাত এড়ানোর জন্য।

তবু লোকটির কথা ভেবে মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠল। ভাবলাম, কত যাত্রী কাফেলার রুগ্ন মানুষকে নির্মমভাবে পথে ফেলে চলে যায়, আর ফিরেও চায় না; এ তো তবু অসহায় লোকটিকে পথ হতে কুড়িয়ে এনে একটা নিরাপদ জায়গায় রেখে গেছে।

মগরেব বাদ আমি আর চৌধুরী আলী আকবর খাঁ হাজীটিকে নিয়ে তাঁর মুয়াল্লিম খোঁজ করতে বেরিয়ে পড়লাম। একটু দূর গিয়ে হাজী সাব বল্লেন, আমি যে রাতে চোখে দেখিনা—আমাকে তো হাত ধরে নিতে হবে। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল্লাম, বেশ, ধরে ধরে আসুন। ভাবলাম এর পর হাজী সাব না বলে বসেন—আমি তো হাটতে পারিনা, অতএব----। কিন্তু তেমন কোন প্রস্তাব তিনি করলেন না; হেটেই চল্লেন। বুড়া হলেও মানুষটি শক্ত—পাতলা বাইন মাছের মত। কিন্তু জিব বড় জিয়াদা চলে ঃ কেবল কথা আর কথা। কথায় রসকস যত, ঝাল তার চেয়ে অনেক বেশী। হঠাৎ মনে হল, এঁর গিন্নী এই জন্যই এঁকে বলে কয়ে হজে পাঠান নাই তো?

ছউদী সরকারের তরফ হতে হজের মৌছুমে মীনা ময়দানে একটি অনুসন্ধান আফিস বসে। আমরা সেইখানে গেলাম। কর্মচারীরা মুয়াল্লিম-রেজিষ্টার বের করে বসলেন। হাজী সাব যে মুয়াল্লিমের নাম বল্লেন, মুয়াল্লিমের লিষ্টে তাঁর নামই নাই। আমি বল্লাম—এর মানে? কর্মচারীরা বল্লেন—মানে সহজ; হজের মৌছুমে মুয়াল্লিমদের অনেক দালাল হাজীদের কাছে নিজেদেরকে মুয়াল্লিম বলে চালিয়ে দেয়। আর ঐ নাম না নিলে তাঁদের উপর হাজীদেরো ভক্তি হয় না।

দেখে শুনে হাজী সাব নিজেই প্রস্তাব করলেন ঃ আমাকে আপনারা

কেবল মক্কা শরীফে পৌঁছিয়ে দিন; সেখানে আমার চেনা হোটেল আছে, আর সে হোটেলে আমার ভাইপো ও আর আর দেশী মানুষ পাব। আমরা হাজী সাবের জন্য সেই ব্যবস্থাই করলাম।

এর চার দিন পর মৌলভী তমিজুদ্দীন খাঁ সাব মক্কার মছজিদ হতে নামাজ পড়ে ফিরে এসে বল্লেন ঃ 'সেই হাজীটির সাথে আজ মছজিদে দেখা—সে তার দেশী মানুষ পেয়েছে—ভাল আছে। এ হজ উপলক্ষে যত কাজ করেছেন, তার মধ্যে এটি নিঃসন্দেহে আলা দরজার।' আমি বল্লাম, 'সেবা ধর্মের ইজ্জত সম্বন্ধে আপনার সাথে আমি সম্পূর্ণ এক মত।'

১৫ই সেপ্টেম্বর আমরা মীনা হতে মক্কা শরীফ রওনা হলাম। পথে আসতে আসতে নানা কথাই মনে হল। ভাবলাম ঃ মক্কা মীনা আরফাত মুজদালফা—প্রত্যেক জায়গাতেই এ অবস্থা কেন?

প্রতি জায়গাতেই যথেষ্ট পানি সরবরাহের অভাব। আরফাতের ময়দানে দেখেছি, পানি নিয়ে হাজীদের মধ্যে দস্তুর মত ধাক্কাধাক্কি। উপরে আগুন-ঝরা আকাশ, নীচে আগুনের স্ফুলিঙ্গের মত তপ্ত বালির পাথার, বুকে পিয়াসের আগুন—আর আসলে এসব তো আকস্মিক ব্যাপার নয়, আগে হতে জানা কথা—তা সত্ত্বেও পানি সরবরাহের এ অব্যবস্থা কেন? পানির অভাব মীনা মুজদালফাতেও একই রকম। স্বয়ং মক্কার মছজিদেও ওজুর পানির নিদারুণ অব্যবস্থা। একদিন বাজারে গিয়েছিলাম; মগরেবের ওয়াক্তে গিয়ে মক্কার মছজিদে হাজির হলাম। ওজুর পানির খোঁজে মছজিদের এক পাশে এক কলের পারে গেলাম। পাইপ লাগানো পানির চৌবাচ্চা; বসবার জায়গাও আছে। কিন্তু যাত্রীর পায়ে পায়ে চার পাশে এত কাদা জমেছে যে তার উপর দিয়ে জুতা পায়ে যাওয়াও সুকঠিন। বসবার জায়গায় কাদা, বসা চলে না। দুই পাশে পেশাবখানা পায়খানা—সেখানে প্রার্থীর অভাব নাই; কিন্তু ঘন ঘন ছাফ করার কোন ব্যবস্থা চোখে পড়ল না; সেখান হতে নিদারুণ গন্ধ এসে বার বার নাসিকার দরজায় হানা দিতে লাগল। এ পরিবেশে সেখানে আমার

RAMNOGOR ELEVEN BULLET CLUB
Estd. 1967
DATE ...
P.O. BAHIAKANDI
DIST. BOGRA

ওজু করার আকাঙ্খা উবে গেল; আমি হোটেলে ফিরে এসে সেখানে একা নামাজ পড়ে নিলাম।

মুয়াল্লিম হারিয়ে বহু লোক ভয় ও কষ্ট পায়; কতক লোক সেই ভয় ও কষ্টে মরেই যায়। অথচ অতি সহজেই তো এর মীমাংসা হতে পারে। মুয়াল্লিমদের রেজিষ্টার আছে। এমন আইন অনায়াসে করা চলে যে তাদের প্রত্যেককে নিজ নাম ও ঠিকানাযুক্ত পিতলের চাকতি তৈয়ার করতে হবে, আর সেই চাকতির এক একটি নিজ নিজ হেফাজতের প্রত্যেক হজযাত্রীর কোমরে বেঁধে দিতে হবে। এর পর কোন হাজী হারিয়ে গেলে সহজেই তাঁকে তাঁর মুয়াল্লিমের কাছে পেঁছান সম্ভব হবে।

মীনা, মক্কা ও মদীনাতে পাকিস্তান মেডিকেল মিশন নামে একটি পদার্থ ছিল। কিন্তু তাকে খুঁজে আবিষ্কার করার কাজটি সহজ ছিল না। মীনাতে মৌলভী তমিজুদ্দীন খাঁ ও খোন্দকার আলী আফজাল সাহেবান একদিন খুঁজে হয়রান হয়ে তাঁবুতে ফিরলেন, মিশন পেলেন না। ইতিমধ্যে হঠাৎ একটি খবর পেলাম। সেই খবর মোতাবেক আমি ও চৌধুরী আলী আকবর খাঁ গিয়ে ঘুরে ঘুরে সে মেডিকেল মিশন আবিষ্কার করে ফেল্লাম। আমাদের মত লোকের পক্ষে মেডিকেল মিশন খুঁজে পেতে যদি দুইদিন লাগে, তবে পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত অর্ধ-শিক্ষিতেরা তা খুঁজে পাবে কেন? আর সে অবস্থায় মেডিকেল মিশনের আসল কাজই বা কি থাকে?

তারপর মেডিকেল মিশনের ষ্টাফ যা দেখলাম, তা নিতান্ত কম; তাঁরা দিন রাত খাটলেও এ সময় আসল সমস্যার সমাধান দূরের কথা, তার কাছেও ঘেসতে পারবেন না। মিশনে রোগীর জন্য একটি বিছানাও নাই। আমাদের মতে মেডিকেল মিশনের ষ্টাফে হজের মৌসুমের জন্য কমপক্ষে দশ জন ডাক্তার ও পঞ্চাশটি বেড-এর একটি ভ্রাম্যমান হাসপাতাল থাকা দরকার। এবার পাকিস্তান হতে ৩২ হাজার যাত্রী হজ করতে গিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই বার্ধক্যপীড়িত। এঁদের

চিকিৎসার জন্য প্রস্তাবিত একটি হাসপাতাল অপরিহার্য রকমে প্রয়োজন।

মক্কা মদীনা উভয় স্থানে মাদ্রাছা আছে। হজের মৌছুমে মাদ্রাছার ছাত্রদেরকে স্বেচ্ছাসেবক রূপে ডাকলে তারা যে আসতে অস্বীকার করবে, তা মনে করবার কোন সংগত কারণ নাই। এরা পানি সরবরাহে সাহায্য করতে পারে, মুয়াল্লিম হারানোদেরে পথ দেখাতে পারে, রোগীদেরে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারে, কোন্ মিশন কোথায় আছে, তা রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে, বিজ্ঞাপন দিয়ে দশজনকে বুঝিয়ে দিতে পারে।

আমরা এসব অব্যবস্থার জন্য ছউদী সরকারকে দায়ী করতে রাজী নই। যে সব দেশ হতে প্রতি বছর হজযাত্রী যায়, সে সবের প্রত্যেক দেশের কর্তব্য তার নাগরিকদের জন্য সুব্যবস্থা করা।

আমরা মক্কা শরীফে ফিরলাম; বয়তুল্লার চার দিকে ফের তওফ করলাম; ছাফা মারওয়ার পথে ফের চল্লাম।

কয়েকটি করুণ দৃশ্য চোখে পড়ল। প্রায় নব্বই বছরের বুড়া—হাটবার শক্তি নাই—চৌদলে চড়ে তওফ করছেন—তাঁর সামনে বসা সাত বছরের নাতনি—তারই কাঁধের উপর হাত রেখে দাদা তওফ করছেন। হয় তো ঘরে বিবি নাই, হয় তো বা ছেলের বয়স সত্তুরের কাছাকাছি—বাপের খেদমত করে করে হয়রান—তখন এগিয়ে এসেছে এই কচি শিশু তার তাজা দিল নিয়ে—বলেছে, দাদা ভাই, ভয় নাই, আমি তোমার সাথে আছি—দাদা ভাই তাকেই সম্বল করে তাঁর পরম পাথেয় সংগ্রহে এখানে চলে এসেছেন। দেখলাম একটি মা—দুধের বাচ্চাকে বুকে জড়িয়ে ধরে একাকী নীরবে তওফ করছেন। কোন অভিভাবক তাঁর সাথে নাই; কোন ছফী তাঁকে দোওয়া-দরুদ শিখাচ্ছেনা, তাঁর ঠোটে কোন শব্দ আওড়ানের চিহ্ন নাই। বুঝলাম, জননীর আবেদনের ভাষা তার আবেগের গহীন তলে শব্দ হারিয়ে ফেলেছে; তাই শুধু বুকের বাকাহীন ভাষায় অন্তর্যামীর দরবারে তাঁর দিলের আরজী পেশ করে যাচ্ছেন। এর পেছনেই আর এক দৃশ্য—যেন এরই দ্বিতীয় পর্যায় ঃ

বৃদ্ধা মা—বয়সের বোঝায় তাঁর পিঠ একদম বাঁকা হয়ে গেছে ঃ হাটতে কষ্ট হয়, তবু হেটেই চলেছে—চৌদলে উঠবেন না—আল্লার ঘর তওফ করবেন, তা আবার পরের ঘাড়ে চড়ে?—ছেলের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি—মায়ের পাশে পাশে চলেছে—নিতান্ত হুশীয়ারীর সঙ্গে, নিতান্ত উদ্বিগ্ন ভাবে মা-কে পাহারা দিয়ে—পাছে কোন অসাবধান যাত্রী মায়ের গায়ের উপর এসে পড়ে! সন্তানের পক্ষে মায়ের দুধের ঋণ শোধের মহান প্রয়াস! আরো একটি দৃশ্য ঃ নারী—কারো কন্যা নন, স্ত্রী নন, জননী নন, মাতামহী পিতামহীও নন—শুধু একটি নারী—বয়সে হয়তো সওয়াশ-র কাছাকাছি—ছেলে বুড়া প্রৌঢ় কেউ সাথে নাই—দুনিয়ায় একান্ত একাকিনী—কাপড়ের যে রকম দোলনায় শিশুকে শুইয়ে দোল দেওয়া হয় তারই মত একটা চটের দোলনা একটা কাঠের দুই পাশে বাঁধা—মাঝখানে দোলনায় শুইয়ে এই নারী—দুটি লোক কাঁধে করে নিয়ে তওফ ফিরছে—ডিম ফেটে বের হওয়ার আগে ভিতরে বাচ্চা যেমন গোলাকার মাংস-পিন্ড হয়ে থাকে, দেখা যায় শুধু তার ঠোঁট, এ নারীও দোলনার খোলসের ভিতরে তেমনই গোলাকার মাংস-পিন্ড হয়ে আছেন—দেখা যায় শুধু দুটি ঠোঁট—নীরবে দোওয়া পড়তে পড়তে কাঁপছে আর কাঁপছে!

আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

চোখ গিয়ে পড়ল ফের আর এক দৃশ্যের উপর। জমজমের এক পাশে দাঁড়ানো একটি হাজী, বয়স আশি নব্বইর মাঝামাঝি ঃ দাড়ি, গোঁফ, চুল, কানের পশম, চোখের ভ্রূ সমস্তই ধব ধবে শাদা—সুন্দর সুবিন্যস্ত দাড়ি শ্বেত রেশম গুচ্ছের মত বুক ঢেকে নাভি পর্যন্ত নেমে এসেছে—বয়তুল্লার দিকে মুখ করে দুই হাত তুলে কি বলছেন—দুই চোখে আঁছুর ছয়লাব—গাল, দাড়ি, বুক ভাসিয়ে কাবার বুকে ঝরে পড়ছে!

চোখের পানিতে কাবা ধোওয়ার দৃশ্য—এ আর কখনো দেখি নাই,

হয়তো আর কখনো দেখব না।

হজ হয়ে গেল। হাজীরা কেউ মদীনা শরীফ, কেউ বাড়ী যাওয়ার যোগাড়ে ব্যস্ত হলেন।

এক বন্ধু বল্লেন—এই যে এত হজ-যাত্রী আসে—এদের বেশীর ভাগেরই বয়স নাই, বল নাই, স্বাস্থ্য নাই, অর্থ নাই, তবু আসে—দেশে ভিখ মাগে, হয়তো এখানেও এদের তাই করতে হয়, তবু আসে। কষ্ট পায়, রোগে ভোগে, হয়তো আরবের বালুতেই তাদের শেষ শয্যা রচিত হয়, তবু এরা আসে কেন? এ বাড়াবাড়ির কি হেতু? কেন এদের এ বোকামী?

আমি বল্লাম—অমন প্রশ্ন যে আমারো মনে মাঝে মাঝে ওঠে নাই এমন নয়; কিন্তু ধর্মের জন্য এদের এই অন্তহীন আকুতি, এই অকাতর দুঃখ বরণের দৃশ্য আমার সমস্ত যুক্তি, সমস্ত সন্দেহকে ভাসিয়ে নিয়েছে। ভেবে দেখ, আমাদের পরিচিতের মধ্যেই কত হাজারী, কত লাখী ধনী আছে, হজ তো প্রধানতঃ তাদেরই জন্য; কিন্তু তাদের কয়জনকে এখানে দেখতে পাচ্ছ?

কেনই বা মোর জন্ম নেওয়া এই যে বিপুল বিশ্ব মাঝ?
আসছি ভেসে কিসের স্রোতে, হেথায় বা মোর কিসের কাজ?
যাত্রা পুনঃ কোন্ লোকেতে?

এই যে জিজ্ঞাসা, এ তো শ্রেষ্ঠতম মানব মনেরই পরিচয়। যুগে যুগে সত্যসন্ধিৎসু কবি, ঋষি, দার্শনিক—এরাই তো এ প্রশ্ন করে আসছেন। সেই প্রশ্ন জেগেছে এই দুঃস্থ দরিদ্র দুর্বল হাজীদের মনে। যে উত্তর তারা পেয়েছে মনীষীদের কাছে, তারই জবাব দিতে মরণ পণ করে তারা এসেছে এই দুস্তর মরুপথে। ঐশ্বর্য স্তূপের তলে যাদের এ প্রশ্ন চাপা পড়ে আছে, অথবা এ পরম প্রশ্নের কথা জেনেও যারা তার জওয়াবে কিছু করা সম্বন্ধে উদাসীন, মানুষের সত্যিকার মূল্যের নিক্তিতে কি তাদেরই ওজন ভারী প্রমাণিত হবে?

কাজেই হাজীদের ভিখ মাগা, দুঃখ ভোগ, কিংবা মৃত্যু বরণ দেখে আমার চিত্তে যে ভাবের উদয় হয়, তা বিরাগ নয়, তা শান্তিময় অনন্ত জীবনের মহান আকুতির প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা।

১৫ই সেপ্টেম্বর জান্নাতুল-মালা দেখতে গেলাম। জান্নাতুল-মালা মক্কার অদূরে অবস্থিত এক বিখ্যাত কবরস্তান। কবরখানাটি আকারে বিরাট। কোন এক কালে এর চারিদিকে প্রাচীর ছিল; এখন তার ভগ্নাবশেষ আছে মাত্র। অনেক কবরের উপরই পাকা ছাদ বা অমন কিছু ছিল; এখন সে সব কিছুই নাই, তার ভাঙা টুকরা এখানে সেখানে কিছু ছড়িয়ে আছে। কবর খানার স্থানে স্থানে মলের দুর্গন্ধ পাওয়া গেল; মানুষকে পেশাব করতে নিজ চোখে দেখলাম।

আগে কবরখানা অটুট ছিল; বহু লোক জিয়ারত করতে আসত। তাদের অনেকে নাকি কবরে ছেজদা করত। তাই পরে এসব ভেঙ্গে-চুরে একাকার করে দেওয়া হয়েছে, যাতে কবর কেউ চিনতে বা তার পারে ছেজদা করতে না পারে।

কবরখানার ভিতরে অনেক পথ গেলাম—মাঝে মাঝেই নাকে রুমাল দিতে হল। একজন বল্ল, কবরখানার শেষ মাথায় ঐ পাহাড়ের পাশে হজরত খাদিজার কবর। বড়ই লোভ হল, একবার কাছে যাই, জিয়ারত করি। ইছলামের সুদীর্ঘ ইতিহাসে অমন মহীয়ষী মহিলা আর কয়জন আছেন? সমস্ত দুনিয়ায় মহানবীর প্রচারিত ধর্মে যখন কেউ বিশ্বাস করে নাই, তখন হজরত খাদিজা বিশ্বাস করেছেন। তিনি হজরতকে ধন দিয়েছেন, আনুগত্য দিয়েছেন, উৎসাহ দিয়েছেন, সব দিয়েছেন। তাঁরই মাজার আমার সামনে—ঐ পাহাড়ের কাছে। কিন্তু আমি গেলাম না। ভাবলাম, দূর হতেই তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে যাই; কারণ কাছে গিয়ে যদি দেখি, সে কবরের পাশেও-----? কাজেই থাক।

২০শে সেপ্টেম্বর বেলা সকাল আট-টা পর্যন্ত আমরা মক্কাশরীফে রইলাম। খানা পিনা কোনটিরই অভাব ছিল না—সঙ্গে সঙ্গে গরমেরও

অভাব ছিল না। দিনে তো গরম আছেই, রাত্রিতেও ঘরের ভিতরে গরমের জুলুম অব্যাহত; অথচ বাইরে তখন ঠাণ্ডা হাওয়া। এজন্য মক্কার বেশীর ভাগ লোকই এ মৌছুমে রাত্রিতে ছাদের উপর, বারান্দার অথবা রাস্তার পাশে কিম্বা খোলা ময়দানে ঘুমায়।

ছউদী আরবের শিক্ষা ব্যবস্থার কোন স্পষ্ট ধারণা গঠন করতে পারলাম না। এ সম্বন্ধে সরকারী কোন রিপোর্টের খোঁজ পাওয়া গেল না। বেসরকারী কেউ আরবী বা ইংরেজীতে এ সম্বন্ধে কোন বই লিখেছেন কি না, বহুজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, মক্কার বহু লাইব্রেরীতে তালাস করলাম, কিনারা করতে পারলাম না। এক মিসরী বন্ধু বল্লেন—আরব সম্বন্ধে তুমি যার তার কাছে এত খোঁজ খবর জিজ্ঞাসা করো না, পেছনে টিকটিকি লাগবে। তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম; নিজের মনে একটু---; না, মিছে কথা, নিজের মনে একটুও ভয় পাই নাই। ছউদী আরবে ইরাক সরকারের দূত ঃ তাঁর সাথে দেখা; জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বল্লেন, ছউদী আরবে য়ুরোপ আমেরিকার তরফ হতে কোন স্কুল কলেজ নাই; ছউদী সরকারের তরফ হতে আছে গুটি পাঁচ-ছয় মাধ্যমিক স্কুল, আর গুটি পঁচিশ-ত্রিশ প্রাথমিক স্কুল। অন্যজন বল্লেন—না, উভয় শ্রেণীর স্কুলের সংখ্যাই এর চেয়ে বেশী। এক মিসরী ভদ্রলোক তাঁর দেশের সৈন্যদলে ইংরেজী শিক্ষক ছিলেন; ইদানিং একজন ছউদী শাহ্জাদার প্রাইভেট মাষ্টার। চেহারা ভাল; সেকেলে বড় ঘরের ছেলে, আর সেকেলে বড় ঘরের উপযোগী দৃষ্টিভঙ্গী। শিক্ষা বিভাগের লোক, আশা করে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ বেদুঈনদের শিক্ষার জন্য মিসরে ও আরবে আপনারা কি করছেন? নির্বিকারে উত্তর দিলেন ঃ ওরা নিজেদের জীবনে সম্পূর্ণ তৃপ্ত; কেন ওদের সে তৃপ্তির বেহেস্তে আমরা হানা দিব?

তায়েব ভাই জরীফ একজন বোরা সদাগরঃ কলকাতা বোম্বাই উভয় স্থানে তাঁর করবার—হজ করতে এসেছেন। মৌলভী তমিজুদ্দীন

খাঁ সাবের সাথে আগের পরিচয়। সেই খাতিরে আমাদের চারজনকেই দাওয়াত করলেন। মক্কা শরীফের মছজিদ হতে মিনিট তিনেকের রাস্তায় এক পাঁচতলা সুন্দর বিরাট বাড়ী—বোরা সমাজের হজ্‌যাত্রীদের জন্য তৈরী—থাকা খাওয়া সম্পূর্ণ ফ্রি। সেই বাড়ীর ছাদে বসে রাত্রির খানা খেলাম। খানা অত্যন্ত ভাল, বাড়ীটি আরো ভাল, আর যে দরাজদিলের দানে এ ইমারত তৈরী, সেটি সবচেয়ে ভাল।

বাংলা দেশে কত লক্ষপতি, কোটিপতি মুছলমান আছে ও ছিল; তাদের মধ্যে অনেকে হজেও গিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের একটি প্রাণীও এখানে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন নাই।

১৭ই সেপ্টেম্বর সুলতান ইবনে ছউদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার দাওয়াত এল। আমরা চারজনই চল্লাম।

সুলতানের বিরাট সুন্দর প্রাসাদ। প্রথমে আমাদেরকে একটি ছোট কামরায় বসান হল। কামরায় খান চারি গদি-আটা চেয়ার আর দুটি গদি-অটা হেলনা বেঞ্চ।

কিছুক্ষণ পর আমাদেরকে দোতলার একটি কামরায় বসান হল। এটি এক মস্ত হল কামরা—বোধ হয় আম্‌ দরবার ঘর। হলে প্রায় চারশ চেয়ার ঃ বেশ দামী—সমস্তই পুরু গদি-আটা, সমস্তের উপরই রূপার কারুকাজ।

এরপর আমাদের ডাক পড়ল তৃতীয় আর এক ঘরে যেতে। গেলাম। এও এক বড় হল কামরা। তবে এতে ঘরময় চেয়ার পাতা নয়; দেয়ালের কাছ দিয়ে সারিবদ্ধ চেয়ার, মাঝখানে ফাঁকা—দামী গালিচায় ঢাকা। চেয়ারগুলি অত্যন্ত দামী আর তার উপর প্রচুর সোনার শিল্প কাজ। মনে হল এইটি সুলতানের দিওয়ানে খাছ। একটি চেয়ারে ইব্‌নে ছউদ আসীন। তিনি অসুস্থ, তাই বসে বসেই আমাদেরে গ্রহণ করলেন। আমরা 'আচ্ছালামু আলায়কুম' বলে মোছাফেহা করলাম; তিনিও 'আলায়কুম আচ্ছালাম' বলে মোছাফেহা করলেন। দোভাষীর মারফত

জিজ্ঞাসা করলাম—আলা হজরত, কেমন আছেন? তিনি দোভাষীর মারফতই উত্তর দিলেন—ভাল আছি, শুকরীয়া। তারপর আমরা গিয়ে দেয়ালের পাশের চেয়ারে বসলাম। আমাদেরে ছোট্ট এক পেয়ালা করে কফি দেওয়া হল। অত্যন্ত কড়া কফি—আমাদের কাছে একান্ত বিস্বাদ মনে হল, ওতে দুধ চিনি কিছুই দেওয়া হয় নাই। তবু একটু খেলাম। কিছু না খেলে খেলাফে তহজীব হয়। তারপর আবার সুলতানের কাছে গিয়ে করমর্দন করে বিদায় হলাম।

ইব্‌নে ছউদের দাড়ি গোঁফ চুল শাদা বলে মনে হল না। বয়েস তাঁর সত্তরের উপর। অমন বয়সে কারো কারো দাড়ি চুল কাঁচা থাকে; কাজেই তিনি 'খেজাব মাখেন'—এ কথা জোর করে বলা চলে না।

এ ঘরের ভিতরে বারান্দায় বাইরে বেয়নেট বাঁধা রাইফেল, ছোরাধারী সৈন্য—কেউ কেউ দাঁড়িয়ে আছে, কেউ কেউ বসে আছে। আমাদের যাতায়াত কালে অত্যন্ত তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তারা আমাদেরে লক্ষ্য করল। আমরা যখন ভিতরে কুরছীতে বসা, তখনো আমাদের উপর তাদের তীব্র দৃষ্টি নিবন্ধ; ইব্‌নে ছউদকে তারা আবদুল্লার দশা পেতে দিবে না, এ তাদের মরণপণ। শুনলাম, এই সৈন্যরা সবাই ইব্‌নে ছউদের কওমের লোক। ইব্‌নে ছউদের উপর কেউ হাত তুল্লে এরা তাকে তখনই এমন টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেলবে যে, চিল কাকেরাও তা খুঁজে পাবে না।

১৮ই সেপ্টেম্বর সকাল বেলায় আমরা মোছফেলা মহল্লা দেখতে চল্লাম। মক্কার মছজিদ হতে মাইল দেড়েক দূরে এই মহল্লা। শুনেছিলাম, এটি মক্কার বাঙ্গালী পাড়া; ওখানে নাকি প্রায় ৬০০ বাঙ্গালী থাকে, কাজেই বাঙ্গালীদের সাথে একটু পরিচয় করতে লোভ হল। তা ছাড়া, দুদিন আগে বাংলায় ছাপা একটা বিজ্ঞাপন পেয়েছিলাম যে, এই অঞ্চলে মাদ্রাছার জন্য একটা বড় ঘর তৈরী হচ্ছে, তার জন্য চাঁদা চাই। ঘরটার জন্য কিছু দিব মনন করেই চল্লাম। কিন্তু মহল্লায় গিয়ে আমরা পরিচয়ের কোন সুবিধা করে উঠতে পারলাম না। শুনলাম, পাড়ায় কিছু বাঙ্গালী

আছে, কিন্তু কি জানি কেন, তারা কাছে ভিড়ল না। মোটর গাড়িতে চড়া ছাফ কাপড় পরা মানুষ দেখে ভয় পেল কি না বলতে পারি না। একজন মুয়াল্লিমকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বাংগালীদেরই মুয়াল্লিম; কথাও খাস বাংলায় বল্লেন; কিন্তু খবরের বেলায় চেপে গেলেন। খোদা জানে, তাঁর মোয়াক্কেল ভাগিয়ে আনব বলে তিনি সন্দেহ করলেন, না, তার মুয়াল্লিমগিরিতে কোন চোরাবাজারী আছে। মাদ্রাছা ঘরের কোন খোঁজ মিল্ল না, তখন মনে হল, বিজ্ঞাপনটা ছাপা হয়েছিল চাটগাঁর কোন এক প্রেসে, মক্কায় নয়।

মোছফেলা হতে ফিরবার পথে আমরা হাবশী পাড়ার ভিতর দিয়ে এলাম। এরা সবাই খাস হাবশী, দোনছলা নয়। মানুষ যে এত কাল হতে পারে, এ আমি আগে ভাবতে পারি নাই। তা ছাড়া মোটা ঠোঁট, অনুচ্চ নাক, ছেঁড়া কাপড়, ময়লা শরীর, ভাংগা ঘর, সমস্ত মিলে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করে আছে, যেখানে আমাদের পক্ষে একদিন বাস করা কল্পনার অতীত।

কিন্তু তখনি মনে হল, এদেরে কুরূপ বলবার কি অধিকার আমাদের আছে? কায়রোর সেই তরুণীটির কথা মনে পড়ল ঃ সে বলেছিল, মানুষ উটকে মনে করে অদ্ভুত, উট আবার মানুষকে মনে করে অদ্ভুত। আমরা চিকচিকে কাল না হয়ে ধামায় ঢাকা ঘাসের মত ফ্যাকাসে শাদা, এই বলে যদি হাবশীরা আমাদেরে কুরূপ বলে, তবে আমাদের পক্ষে সত্যি জবাব দেওয়ার কি থাকতে পারে? অনেক বছর আগে খবরের কাগজে পড়েছিলাম যে, কোন এক জাপানী ম্যাগাজীনে নিম্নরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল ঃ "ভারতবর্ষ হতে কয়েকটি লোক ইদানিং জাপানে এসেছিল। লোকগুলি সব দিক দিয়েই ভাল, কেবল তাদের দেহে দুটি ত্রুটী লক্ষ্য করা গেছে ঃ তাদের নাকগুলি যথেষ্ট রকমে চ্যাপটা ও নীচু নয়, আর তাদের চোখগুলি ট্যারা নয়।"

এই যে মোটা ঠোঁট, কোঁকড়া চুল, কালো রং—আমাদের চোখে

একান্ত অসুন্দর, এদের সমাজে এদেরই মধ্যে কত লায়লী মজনু, কত শিরী ফরহাদ, কত ইউছুফ জোলায়খা আছে, কে জানে? এদের কবিরা তো এদেরই রূপ বর্ণনার জন্য ভাষা খুঁজে হয়রান!

মক্কার কাপড়ের বাজারে গেলাম। এত রেশম পশম, এত বিলাতী ফরাসী মার্কিন ফ্যাসন—কাপড়ের আমদানী দেখে অবাক হলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, এত দামী আর বিলাস বসন খরিদ করে কে? উত্তর হল—এসব কতক কিনে নিয়ে যায় নানান দেশের হাজীরা, বাকি সব মক্কার লোকেরাই পরে। বল্লাম, তবে এদের বেশ সৌখিনতা আছে? উত্তর হল ঃ ঐ যে বোরকা পরা মক্কী মহিলা যাচ্ছেন, বাইরে দেখে মনে হয় এক কিম্ভূতকিমাকার জীব—ওঁর বোরকাটা যদি একটু তুলতে পারতে তবে দেখতে ভিতরে এক অপরূপ প্যারিসীয় লেডী। জান নিয়ে ছহীছালামতে দেশে ফিরব, এ নিয়ত আমার হামেশাই ছিল, তাই বন্ধুর সুপরামর্শ সত্ত্বেও মক্কী মহিলার বোরকার নীচে কি প্যারিসীয় লেডী, না আবিসিনীয় নারী, তা পরখ করার মহৎ উদ্দেশ্যে ও-জায়গার কোন জীবের বোরকার আঁচল ছুইতে কোশেশ করি নাই।

মক্কার বাজারে কিছুক্ষণ ঘুরলে মনে হয়, এখানে বুঝি দুনিয়ার প্রায় সব দেশের লোকই আছে, প্রায় সব দেশের ভাষাও আছে। দিন তিনেকের মধ্যেই আমরা বেশ কয়েকটি পুরানা প্রতিবেশী আবিষ্কার করে ফেল্লাম। মক্কার মছজিদের রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে টুপি ও তছবীহ্ বিক্রি করছেন—চেহারা বাঙ্গালী বাঙ্গালী। জিজ্ঞাসা করলাম। বল্লেন-- আমার সাবেক বাড়ী ছিল আরাকানে। আরাকান যখন মগের মুল্লুক হয়ে পড়ল, তখন বুঝলাম, এখানে আর ঈমান আমান নিয়ে বসবাস চলবে না; তাই এই খাস দারুল-ইছলামে চলে এলাম। 'কেমন চলছে ভাই?' 'আলহামদুলিল্লাহ্—গরীবানা হালে বেশ আছি।' 'ভাষা?' 'আমি এক রকম শিখে নিয়েছি, কাজ চালাতে পারি, বাড়ীর ছোট ছেলেরা তো পাক্কা আহলে-জবান হয়ে গেছে।' মৌলভী তমিজুদ্দীন

খাঁ সাবের সঙ্গে কাপড়ের বাজারে গিয়েছি। তিনি কেবলই একটা দোকানের দিকে টেনে নিয়ে যান। বল্লাম, ব্যাপার কি? বল্লেন—দেশী লোক আছে। গিয়ে দেখি, সত্যি তাই; কেবল দেশী নয়, খাস ফরিদপুরী। এরা তিন ভাই; বড়জন বাংলা ভাল বলে, বাকি দুইজন বাংলা বোঝে, বলতে পারে না। বিশেষ রকম এক প্রস্থ কাপড় খুঁজতে খুঁজতে একটা ছোট্ট সুন্দর দোকানে গিয়ে বসলাম। দোকানীদের বড় জনের বয়স বছর আঠারো, বাকি দুই জনের আট আর দশ। অত্যন্ত সুশ্রী চেহারা। দশ বছরের ছেলেটাকে কাছে ডেকে তার কান মলে দিলাম; সে খুশী হয়ে উঠে গিয়ে এক গেলাস বরফের শরবত এনে দিল। বড় জন বল্ল, আমরা আদতে পেশোয়ারী—আমার দাদা এখানে এসে থেকে যান। বল্লাম—ইংরেজী কোথায় শিখলে? উত্তর দিল—কায়রোর মিশনারী স্কুলে পড়েছিলাম। ছোট ভাইয়েরা কিন্তু মক্কার মাদ্রাছাতেই পড়ে। হজের মৌসুম বলে ওরা এসে দোকানে বসেছে। এক ঘড়ির দোকানে গেলাম। সাথে আমাদের পাঞ্জাবী বন্ধু চৌধুরী আলী আকবর খাঁ। তাঁকে বল্লাম, দেখতো রে ভাই, লোকটার চেহারায় ছাতু ছাতু ভাব কেন? তিনি তখনি চোস্ত উর্দুতে বাতচিত শুরু করে দিলেন। দেখা গেল, দোকানীটি সিন্ধুর বাসিন্দা, করাচীতেও দোকান আছে।

দুনিয়ার যত দেশের লোক হজ করতে যায়, মক্কার দোকানদার আর মুয়াল্লিমরা বোধ হয় তার সব দেশের ভাষাই জানে। এক টাকা-ভাঙ্গানীর দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছি। দোকানদার খাস মক্কী। এক বাঙ্গালী হাজীকে বলছে ঃ না গো, এখন আর সাবেক দরে টাকাটুকার ভাঙ্গতি দেওয়া চলবে না। এই 'গো' আর 'টুকা' শুনে আমি সত্যি বিস্ময় বোধ করলাম ঃ এরা তা হলে এমন একটা বিদেশী ভাষার তুকতাক সব আয়ত্ত করে ফেলেছে! মুয়াল্লিমদের মধ্যেও লক্ষ্য করলাম, যাঁরা নোয়াখালী চাটগাঁর মক্কেল নিয়ে ব্যবসা করেন, তাঁরা খাস নোয়াখালী চাটগাঁর বাসিন্দাদের মতই কথা বলেন; আবার বরিশাল, সিলেট জেলার

লোকদের মুয়াল্লিমরা ঐ দুই জেলার লোকের ভাষায় বিশেষ উচ্চারণ ভঙ্গী ঠিক রেখেই কথা বলে থাকেন।

১৯শে সেপ্টেম্বর। হোটেল মিসরে ছৈয়দ রমজানের সঙ্গে পরিচয় হল। ছৈয়দ রমজান কায়রোর একজন নব্য-শিক্ষিত নব্য যুবক—এম-এ, কিন্তু মিষ্টার না বলে মওলানা বল্লেই খুশী—বয়স সাতাশ-আটাশের কাছাকাছি; দাড়ি রাখেন এবং সে জন্য কোন সমাজে সংকোচ বোধ করেন না—আরবীতে নিতান্ত ভাল বক্তা—ইখওয়ানুল মুছলিমীনের পরিচালকদের মধ্যে একজন—টিকটিকি নাকি পাছে লেগেই আছে—কিন্তু তাতে বেপরোয়া।

ইখওয়ানুল মুছলিমীন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি যা বল্লেন, তার মর্ম এই ঃ

ইছমাইলীয়া মিসরের একটি ছোট শহর। এই শহরের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন শেখ হাছানুল বান্না। ছোট স্কুলের শিক্ষক হলেও তিনি কেবল ছোট বিষয় নিয়ে থাকতেন না, বড় বিষয়ের কথাও ভাবতেন। বিশেষ করে ভাবতেন তিনি ইছলামের কথা, মুছলিম রাজ্যগুলির কথা। প্রথম মহাযুদ্ধের পর যখন য়ুরোপ আমেরিকার বিজয়ী খৃষ্টান শক্তিপুঞ্জ মুছলিম রাজ্যগুলিকে ভাগ বাটারা করে নিতে লেগে গেল, তখন শেখ হাছানুল বান্নার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল ঃ তিনি রাত দিন ভাবতে লাগলেন, মুছলিম রাজ্যগুলিকে বাঁচানের জন্য কোন্ পথ অবলম্বন করা সম্ভব? অবশেষে তিনি স্থির করলেন, যে পথে চলে মুছলমান এক দিন বড় হয়েছিল, মুছলমানকে আবার সেই পথে চলতে হবে এবং সে পথ ইছলামের পথ। ইছলামই একদিন মরুচর আরবের মাথায় শাহীতাজ তুলে দিয়েছিল; ইছলামই একদিন অজ্ঞ বেদুঈনকে দুনিয়ার ওস্তাদ করে তুলেছিল।

কিন্তু মুছলমানকে আবার সেই পথে চালাতে হলে চাই অক্লান্ত সাধনা বলে তাদের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার, আর সেজন্য চাই নিঃস্বার্থ

সেবক দল।

কাজেই ১৯২৭ সালে তিনি ইছমাইলীয়া শহরে এই সেবক-সংঘের পত্তন করেন—এরই নাম ইখওয়ানুল মুছলিমীন—মুছলিম ভ্রাতৃসংঘ।

অল্পকাল মধ্যেই এই ইখওয়ান আন্দোলন চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। বর্তমানে মিসর, সুদান, সিরীয়া, জর্দান, ইরাক, মরক্কো, মালয়া, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে ইখওয়ানের শাখা সমিতি আছে। তুর্কী ও ছউদী আরবে ইখওয়ান আন্দোলন নিষিদ্ধ, তবু নাকি গোপনে গোপনে সেখানেও কাজ চলছে।

ইখওয়ানুল মুছলিমীন বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত ঃ

মুয়াছ্ছেছীন—স্থাপয়িতা ও পরিচালক সংঘ	এদের সংখ্যা দেড়শ।
আমেলীন—কর্মী সংঘ—	" " পাঁচ লাখ।
মুশতারিকীন—সহানুভূতিকারী—	" " দশ লাখের উপর।

কায়রো হাইকোর্টের পরামর্শ দাতা হাছান এখন ইখওয়ানের সভাপতি আর ফউদী বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীর ডিরেক্টর শেখ আবেদীন এর সেক্রেটারী।

অনেকে মনে করেন, ইখওয়ানুল মুছলিমীনই ইছলামের ভবিষ্যতের আশার দীপ।

ঐ দিনই বাদ-মগরেব হোটেল মিসরে ইখওয়ানুল মুছলেমীনের এক সভা হল। আমাদের তমিজুদ্দীন খাঁ সাব এতে বক্তৃতা করলেন। উপস্থিত সবাই খুশী হল। মিসরের এক তরুণ বক্তা—কি বল্লেন বুঝলাম না, কিন্তু আগুনের ভাষায় যে বল্লেন তা স্পষ্ট টের পাওয়া গেল। উপস্থিত শ্রোতারা আজীম—আজীম, আল্লাহু আকবর, ইত্যাদি বলে ঘন ঘন বাহবা ধ্বনি করল। অবশেযে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে ছৈয়দ রমজান বক্তৃতা করলেন। তাঁর বক্তৃতাতেও ধন্য ধন্য পড়ে গেল।

মক্কা ইছলামের লালন ভূমি। অতন্দ্র সাধনা দিয়ে যারা একে বড়

করে তুলেছিলেন, এ পবিত্র নগর তাঁদের স্মৃতি বহন করে ধন্য। কিন্তু সে স্মৃতির বাহন স্বরূপ কোন বাস্তব চিহ্ন মক্কার বুকে চোখে পড়ল না।

কোন্ কুটিরে শিশু মুহম্মদ (দঃ) প্রথম চোখ মেলেছিলেন, হীরা পর্বত কোথায় ও কেমন, আবু বকর, ওমর, ওছমান, আলী—ইছলামের এই অবিস্মরণীয় মহান সেবকদল,—কোন্ উপবনের বাবলা শাখার দোলায় এ'রা দোল খেয়েছিলেন, কোন্ আছমানের বুকে শিক্ষানবীশ কিশোর খালেদের ঝকমক তলোয়ার বিজলী পয়দা করত, এ সবের কোন অনুসন্ধানই করে উঠতে পারলাম না। মক্কার বাসিন্দাদের সবাই এ সম্বন্ধে চুপচাপ; বড় জোর ফিসফিস করে তারা বলে—ওগুলির চিহ্ন নাই; যা আছে তাও দেখতে মানা। কারণ? সেই যুক্তি, যেহেতু মানুষ এসব জায়গা দেখেই তাতে চুমা খায়, তার ধূলা গায় মাখে, তার পায়ে ছেজদা করে, অতএব এই শেরেকী বন্ধ করার জন্য যথাসম্ভব এসবের খোঁজ দেওয়া বন্ধ কর। মক্কার খানিক দূরে অবস্থিত জবলন্নুর—আলোর পাহাড় ঃ যে পাহাড়ের স্বর্গীয় গুহায় বসে ধ্যান করে করে আমাদের প্রিয়নবী সেই মহাবাণী লাভ করেছিলেন যার প্রাণময়ী প্রভাবে দুনিয়ার রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম ও সভ্যতার ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়েছিল বিস্ময়কর বিপ্লব —সেখানেও যাওয়া নিষিদ্ধ। আমাদের ড্রাইভারকে বল্লাম—একবার আমাদেরে জবলন্নুরে নিয়ে চল। সে প্রথমে বল্ল— পাহাড়টা বড় উঁচু। বল্লাম, কুছ পরোয়া নাই। তারপর সে বল্ল—উপরে ওঠার পথ বড় খারাপ। বল্লাম, সে ভাবনা আমাদের। তখন বল্ল—আচ্ছা, কাল চেষ্টা করে দেখব। সে 'কাল' যখন এল, তখন বল্ল—পারব না, ধরে নিয়ে দোররা মারবে।

জমজম জারী আছে। কত মানুষ কত কলস ঠিলা ভরে নিয়ে যায়, তাদের পানির পিয়াস মিটায়। কিন্তু আত্মারও তো পিয়াস আছে। হীরার গুহার প্রেরণাময় পরিবেশের পরশে হয়তো জমজমের পানির চেয়ে প্রিয়তর, স্নিগ্ধতর কিছু দর্শকেরা লাভ করত। মাঠে মেষ পাল চরতে দিয়ে যেখানে বাবলার ছায়ায় বসে বসে বালক মুহম্মদ

আরবের দুর্গতির কথা ভাবতেন আর তার প্রতিকারের সংকল্প করতেন, আজ সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে আমাদেরো বুক কি মুহূর্তের জন্য দুলে উঠত না? সে প্রেরণা লাভের দুয়ার এ ভীড়ের মধ্যে খুঁজে বের করার সময় পেলাম না।

মদীনা
২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫১

ভাই খোন্দকার সাহেব,

ছোট বেলায় একটা গজল শুনেছিলাম ঃ একান্ত পাড়াগেঁয়ে গজল ঃ কিন্তু লেগেছিল বড় ভাল। তাই আজো তার দুচরাটি লাইন স্মৃতির আনাচে কানাচে উঁকি দিয়ে ফিরে ঃ অস্ফুট কন্ঠে বলে যায় ঃ

আজীজো ইয়ারো
মোহেব্বো পিয়ারো
চলো মদীনা—
চলো মদীনা।
ইঁহাছে ওট্ঠো
কামার কো বাঁধো
চলো মদীনা—
চলো মদীনা।

আমাদের বন্ধু খোন্দকার আলী আফজাল সাহেব সেদিন তাই-ই বলেছিলেন। ২০শে সেপ্টেম্বর ফজরের নামাজের পরই তিনি এসে আমাদের কামরার সামনে দাঁড়িয়ে তাকাদা করছিলেন—তৈয়ার, জলদী তৈয়ার। চৌধুরী আলী আকবর খাঁ তার আগের দিন বাড়ীর পত্র পেয়েছিলেন ঃ তাড়াতাড়ি বাঁধছাদ করতে গিয়ে তিনি তাঁর আয়নাটি

ভেঙ্গে ফেল্লেন। ছাফাই গাইতে গিয়ে বল্লেন, বেশ হয়েছে, দিন নাই, রাত নাই, কেবল নিজের মুখ আর নিজের মুখ। আমি বল্লাম, নিজের মুখের সামনে ধরলে আয়নায় নিজের মুখ দেখা যাবেনা তো ঐ যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে লম্বা কান নাড়ছে, ওরই মুখ দেখা যাবে? তুমি একদম উল্লুকা-দোম-ফাখতা! নইলে, নিজের ঘটে যদি নাই থাকে, তবে অন্যের কাছ থেকে একটু বুদ্ধি ধার করে যদি আয়না নিয়ে তোমার ছিনার সামনে ধরতে, তবে দেখতে বুকের তল হতে কার মুখ এসে আয়নায় ভেসে ওঠে। আলী আকবর সোল্লাসে বলে উঠল ঃ তাই তো রে ভাই, আয়নাটা ভেঙ্গে না গেলে তো তাই করে দেখতাম। তমিজুদ্দীন খাঁ সাহেবকে বিশেষ গম্ভীর দেখা গেল। আলী আফজাল সাহেব ফিস-ফিস করে বলে গেলেন—'আজ হফতাকাল হতে নোয়াখালীর ডাক বন্ধ।' আলী আকবর বল্ল—কিন্তু তুমি যে ভাই এত লাফালাফি করছ, হফতাকাল যাবত তোমার কাছেও তো কোন পত্র আসে নাই। আলী আফজাল সাহেব নিম্নস্বরে বল্লেন—'আমি স্বপনে দেখেছি।' আলী আকবর আমাকেও ছাড়ল না; বল্ল, তুমি ভাই এমন বেগুন-বেচা মুখ করে বসে আছ কেন? আমি দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বল্লাম, আমি চান্স মিস্ করে ফেলেছি ঃ

সে যে কাছে এসে বসেছিল তবু জাগিনি!
কি ঘুম মোরে পেয়েছিল কেমনে জানি!

কিন্তু থাক। এখন আমার মদীনার অভিজ্ঞতার দুচারটি কথা শোন।

হ্যাঁ, ২০শে সেপ্টেম্বর; সকাল বেলা—ছউদী গাড়ী, ছউদী ড্রাইভার হোটেলের সামনে হাজির—আজ আমরা মক্কা শরীফ ছেড়ে মদীনা শরীফের পথে জেদ্দায় যাব।

মনটা কেমন কেমন লাগতে শুরু করল। এত গরম, এত ভীড়, তবু এরই মধ্যে মক্কার উপর মায়া হয়ে গেছে। হায়রে মন! যেখানে যাও সেখানেই অলক্ষ্যে শিকড় গেড়ে বস!

বিদায় কালে হোটেলের চাকরেরা এল ঃ আর কেউ নয়, শুধু চাকর—তাও হাবশী, অমাবস্যার সমস্ত অন্ধকার জমিয়ে মুখে মেখে বসে আছে। বখশীশ তাদেরে আগেই দিয়েছিলাম—তবু তারা এল। তাদের চোখের তারায় তারায় মায়ার চিকিমিকি। আশ্চর্য! সমস্ত বছর ভরে আমাদেরই মত কত পথিক আসে, দুদিনের জন্য এখানে বাসা বেঁধে বাস করে, তারপর পথের পাখীর মত উড়ে চলে যায়; তবু তাদের জন্য এদের এত দরদ! ভাবলাম ঃ মানুষের এমনই মহান মন ঃ ক্ষণিকের অতিথির জন্যও তা দুলে ওঠে, দরদ বিলিয়ে বিলিয়ে তবে তৃপ্তি লাভ করে। নইলে এই হাবশী নওকরদের বুকের তল কোন্ কালে শুকিয়ে সেখানে জেগে উঠত তাদের দেশের সাহারার চেয়েও নির্মমতর মরুভূমি। ওদের দরদী দিলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলাম।

মোটরে চেপে মক্কার মছজিদের পাশের রাস্তা বেয়ে চল্লাম। মোটর থামিয়ে আলী আকবর সাহেব জমজমের পানির খোঁজে গেলেন। আলী আফজাল সাহেবও নেমে পড়লেন, বল্লেন, একটু আসি।

আলী আকবর খাঁ ফিরে এলেন; কিন্তু আফজাল সাহেব আর আসেন না। চেয়ে দেখি, তিনি আল্লার ঘর সামনে রেখে ফটকের ফাঁক দিয়ে তারই দিকে অনিমেষ চেয়ে আছেন। মুখে দোওয়া নাই, হাত তুলে মোনাজাত নাই, শুধু টলমল চোখের আবেদনে বিদায় ভিক্ষা মেগে যেন উত্তরের প্রতীক্ষায় নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছেন। বেলা বেড়ে যায়: রোদ চড়া হয়ে উঠছে; তমিজুদ্দীন খাঁ সাহেব বল্লেন, ড্রাইভার, ওঁকে ডেকে আন। ড্রাইভার গিয়ে বল্ল। নিতান্ত প্রিয়জনকে ইহজনমের জন্য শেষ দেখা দেখে আসার সময় মানুষ যেমন করে ফিরে চেয়ে চেয়ে চলে আসে, তেমনই ভাবে আফজাল সাহেব এসে মোটরে বসলেন।

এসেম্বলীর আফজালকে পছন্দ করেছি, ভদ্র বিনয়ী আফজালকে ভালবেসেছি, আশিক আফজালকে শ্রদ্ধার আসন পেতে দিলাম।

মোটর চল্ল। যেখানে রছুলুল্লা তাঁর প্রথম প্রভাতে দুনিয়ার

আলো দেখেছিলেন, যার ধুলায় ধুলায় তাঁর পায়ের রেণু মিশে আছে, যার ময়দানে ময়দানে তার মেষ চরানোর স্মৃতি মেশ্কের বুকের গন্ধের মত জড়িয়ে আছে, যার পথে ঘাটে, বাবলা বনের ছায়ায়, খেজুর বাগের আঙিনায়, পাহাড়-পর্বতের গুহায় ইছলাম প্রচারের প্রথম যুগের ইতিহাস অদৃশ্য অক্ষরে লেখা আছে, প্রিয় পয়গম্বরের সেই প্রিয় ভূমি ছেড়ে কলের মোটর নির্বিকার চিত্তে এগিয়ে চল্ল।

জেদ্দায় পৌঁছে আমরা স্থান নিলাম গার্ডেন হোটেলে। হোটেলের মালিকের রুচি আছে। ভাল দূর্বা ও ফুলের আবাদ তিনি শুরু করে দিয়েছেন; তার চেহারাও ভাল। সর্বত্রই দেখলাম, পানি সরবরাহ করলে আরবের বালিতে সোনা ফলে। দুইদিন গার্ডেন হোটেলে রইলাম। দুইদিনই দিন রাত গরমে ইয়া নাফ্ছী ইয়া নাফ্ছী করতে হল।

জেদ্দা হতে মদীনা শরীফে উটে, মোটরে কিংবা হাওয়াই জাহাজে যাওয়া চলে। বেশীর ভাগ লোক এখন মোটরেই যায়। আমরা হাওয়াই জাহাজে গেলাম—২২শে সেপ্টেম্বর বেলা ১১টায়।

হাওয়াই ষ্টেশন হতে মোটরে চল্লাম হোটেল তাছীরে। মদীনার এইটিই সব চেয়ে ভাল হোটেল। এখানেও খানার ঘরে টেবিল চেয়ার, কাটা চামিচের ব্যবস্থা—তবে আসল খানায় প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয় রীতি চালিত আছে।

হাওয়াই ষ্টেশন হতে হোটেলে আসছি। আমি জানালায় মুখ বাড়িয়ে দিয়ে কেবল দেখছি আর দেখছি। রাস্তার পাশে পাশে খেজুর গাছ, কুঁড়ে ঘর, ছোট্ট দালান, ক্বচিৎ বড় ইমারত। ছেলেমেয়েরা খেলা করছে। বেশীর ভাগেরই পরনের কাপড় ময়লা, ছেঁড়া, তালি দেওয়া। কিন্তু সেজন্য তাদের খেলার আনন্দ একটুও কম জমে নাই। আমাদের গাড়ী দেখে হঠাৎ চার-পাঁচটি মেয়ে নিতান্ত মিষ্টি গলায় একটি কবিতা গেয়ে উঠল। এ আমাদের আগমনী গান! আমার চিত্ত তোলপাড় করে উঠল : চোখে ঝাপসা দেখতে লাগলাম। মনে হল, এ কি! আজ হতে

আলো দেখেছিলেন, যার ধূলায় ধূলায় তাঁর পায়ের রেণু মিশে আছে, যার ময়দানে ময়দানে তার মেষ চরানোর স্মৃতি মেশ্কের বুকের গন্ধের মত জড়িয়ে আছে, যার পথে ঘাটে, বাবলা বনের ছায়ায়, খেজুর বাগের আঙিনায়, পাহাড়-পর্বতের গুহায় ইছলাম প্রচারের প্রথম যুগের ইতিহাস অদৃশ্য অক্ষরে লেখা আছে, প্রিয় পয়গম্বরের সেই প্রিয় ভূমি ছেড়ে কলের মোটর নির্বিকার চিত্তে এগিয়ে চল্ল।

জেদ্দায় পৌঁছে আমরা স্থান নিলাম গার্ডেন হোটেলে। হোটেলের মালিকের রুচি আছে। ভাল দূর্বা ও ফুলের আবাদ তিনি শুরু করে দিয়েছেন; তার চেহারাও ভাল। সর্বত্রই দেখলাম, পানি সরবরাহ করলে আরবের বালিতে সোনা ফলে। দুইদিন গার্ডেন হোটেলে রইলাম। দুই-দিনই দিন রাত গরমে ইয়া নাফছী ইয়া নাফছী করতে হল।

জেদ্দা হতে মদীনা শরীফে উটে, মোটরে কিংবা হাওয়াই জাহাজে যাওয়া চলে। বেশীর ভাগ লোক এখন মোটরেই যায়। আমরা হাওয়াই জাহাজে গেলাম—২২শে সেপ্টেম্বর বেলা ১১টায়।

হাওয়াই ষ্টেশন হতে মোটরে চল্লাম হোটেল তাছীরে। মদীনায় এইটিই সব চেয়ে ভাল হোটেল। এখানেও খানার ঘরে টেবিল চেয়ার, কাটা চামিচের ব্যবস্থা—তবে আসল খানায় প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয় রীতি চলিত আছে।

হাওয়াই ষ্টেশন হতে হোটেলে আসছি। আমি জানালায় মুখ বাড়িয়ে দিয়ে কেবল দেখছি আর দেখছি। রাস্তার পাশে পাশে খেজুর গাছ, কুড়ে ঘর, ছোট্ট দালান, ক্বচিৎ বড় ইমারত। ছেলেমেয়েরা খেলা করছে। বেশীর ভাগেরই পরনের কাপড় ময়লা, ছেঁড়া, তালি দেওয়া। কিন্তু সেজন্য তাদের খেলার আনন্দ একটুও কম জমে নাই। আমাদের গাড়ী দেখে হঠাৎ চার-পাঁচটি মেয়ে নিতান্ত মিষ্টি গলায় একটি কবিতা গেয়ে উঠল। এ আমাদের আগমনী গান! আমার চিত্ত তোলপাড় করে উঠল ঃ চোখে ঝাপসা দেখতে লাগলাম। মনে হল, এ কি! আজ হতে

গোনাগাথা ১৩৩০ বছর আগে এরা উৎপীড়িত, নির্বাসিত মহানবীকে এমনই ভাবে গান গেয়ে অভ্যর্থনা করেছিল ঃ

তালা-আল বাদরো আলায়না
মিন ছানিয়াতিল বাদায়ী
ওয়া জাবাশ্-শোকরু আলায়না
মা দা-আ লিল্লাহে দা'য়ী।
(মোদের আকাশে উদিত আজিকে পূর্ণ চাঁদ
উদিত হের অই আল-বেদায়ের টিলার পার;
লাখো শুকরিয়া কণ্ঠে তাই আজ করিছে নাদ,
নাদিবে যতদিন মানুষ ডাকিবে খোদারে তার)।

আবার আজো সেই গান! আমরা তো এদের কেউ নই; কোন পরিচয়ই তো এদের সাথে আমাদের নাই। আমাদের চেহারা, আমাদের পোশাক—সমস্ত মিলে তাদের কাছে আমাদের এই পরিচয়ই দিয়েছে যে আমরা তাদের নিতান্ত অপরিচিত—বিদেশী মুছাফির। তবে কি অচেনা বিদেশীদের জন্য এই অভ্যর্থনা এদের চিরন্তর উদার আতিথেয়তার অন্যতম প্রমাণ?

হোটেল তাছীরের কর্ম-কর্তারা ভাল লোক। তাঁরা প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাজের সময় কামরার সামনে দিয়ে হেঁকে যান—ছালাত—ছালাত। আবার ফজরের ওয়াক্তে ডাকেন—আচ্ছালাতো খায়রুম্ মিনান্নউম। পাকিস্তানে ছালাত নামাজ হয়ে গেছে, একথা তাঁরা জানেন—তাই আমাদের ঘরের কাছে এসেই বলেন—নামাজ,—নামাজ। রছুলুল্লা ছাল্লালাহু আলায়হেচ্ছালামের মছজিদে নেওয়ার জন্য এঁদের একটি বড় মোটরবাস আছে।

আমরা ঐ মছজিদে গিয়েই নামাজ আদায় শুরু করলাম। মক্কার চেয়ে মদীনার হাওয়া অপেক্ষাকৃত কম গরম। এখানকার লোকের মেজাজও স্নিগ্ধতর। আতিথেয়তায়ও নাকি মদনীদের যথেষ্ট সুনাম আছে।

হজের মৌছুমে নামাজের সময় মছজিদে অসম্ভব ভীড়। এই ভীড়ের মধ্যেই আবার ভদ্রলোক মিছকীনেরা সুযোগ পেলেই হাত পাতে। প্রথম দুইদিন কিছু সংখ্যক মুয়াল্লিমও আমাদের পাছে পাছে ঘুরল। তারা অনেকগুলি দোওয়া দরুদ মুখস্থ করে রেখেছে; তাই জোরে জোরে উচ্চারণ করে আগে আগে যায়, হাজীরা সাথে সাথে পড়ে। আমি এ ব্যবস্থায় রাজী হলাম না। বল্লাম—'আমার আল্লা রছুল বাংলা ভাষা জানেন, আর আমার যা কিছু প্রার্থনা করবার আছে, তা আমার নিজ ভাষাতেই সে দরবারে পেশ করব।' এসময়ে মক্কেলের অভাব থাকে না; কাজেই মুয়াল্লিমরা সহজেই আমাদের আশা ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র মনোনিবেশ করলেন।

আমরা যেদিন হোটেল তাছীরে গিয়ে উঠলাম, সেই দিনই রাত্রিতে দেখলাম—খানা ও এশার নামাজের পর হোটেলের নীচ তলায় খোলা জায়গায় কি একটা বিশেষ মজলিসের আয়োজন চলছে। গেলাম। দেখলাম, কেরায়াতের জলছা।

হোটেল দালানের একটি বড় কামরা—সামনে খোলা—তার সামনে পানি-ভরা একটি মস্ত চৌবাচ্চা। চৌবাচ্চার পানির উপর ভাসছে গোলাবের পাপড়ি; তার উপর তারে টানানো অবস্থায় জ্বলছে লাল, নীল, হলদে বিজলী বাতি। কামরাটি বেশ সাজানো—পুরু গালিচা—ধব ধবে সাফ চাদর—উঁচু উঁচু তকেয়া—ফুলদানী—আগর বাতি। সেখানে আসীন চারজন কারী—তাঁদের মাঝখানে বসা তাঁদের ওস্তাদ শেখ হাছান শায়ের। ওস্তাদের বয়স পঞ্চাশের উপর; কারীদের বয়স পঁচিশ হতে পঁয়ত্রিশের মধ্যে। ওস্তাদের চেহারায় আত্মিক নির্মলতার একটা উজ্জ্বল আভা, একটা স্নিগ্ধ কমনীয়তা, একটা মনোরম মর্যাদা ফুটে আছে। কারীদের কামরার সামনে চৌবাচ্চার এপাশে ওপাশে সেপাশে অনেক ভাল কুরছী—তাতে আসীন শ্রোতার দল—এঁরা প্রধানতঃ মিসর দেশীয়; ওস্তাদ ও কারীরা মদীনার বাসিন্দা। একজন মিসরী ধনী হাজী এই

মজলিসের আয়োজন করেছেন। তিনি আতর দানী হাতে মাঝে মাঝে শ্রোতাদের মধ্যে সুগন্ধ বিতরণ করছেন।

কারীদের কণ্ঠ নিতান্ত মধুর; তাঁদের আবৃত্তির কায়দাও আমার কাছে মনে হল একান্ত নতুন। কারী এক কানে আঙুল দিয়ে বা কান ছাপিয়ে ধরে একসঙ্গে উচ্চ কণ্ঠে দুই তিনটি আয়াত আবৃত্তি করেন। অমনি শ্রোতাদের মধ্যে আনন্দধ্বনি জেগে ওঠে; তাঁরা একসঙ্গে অনেকে বলে ওঠেন—আজীম—আজীম! কারী বেশ খানিকক্ষণ চুপ থাকেন; হয়তো ওস্তাদের সাথে দুটো কথা বলে নেন, নয় তো মুখে একটা এলাচীর দানা ফেলে দেন। তারপর আবার কান ছাপিয়ে ধরে পূর্ববৎ আবৃত্তি করেন। আবার তিনি থামেন। আবার শ্রোতারা বাহবা ধ্বনি করে ওঠেন—আল্লাহু আকবর আল্লাহ্। ওস্তাদ মাঝে মাঝে চোখের ইশারায় বলেন—বেশ, শাগরিদ কারী অমনি হাত তুলে শুকরীয়ার ছালাম জানান। কখনো কারীর কন্ঠ উঁচু হতে আরো উঁচুতে উঠে—পাশের আগর বাতির সৌরভময় ধূম যেমন বিচিত্র তরঙ্গে লীলায়িত হয়ে উপরে উঠতে থাকে, ওস্তাদের হাতও কম্পমান আঙুলের তরঙ্গসহ উপরে উঠতে থাকে। কারী আবৃত্তি শেষ করে আবার জানান তাঁকে ছালাম। আবার শ্রোতারা উল্লসিত হয়ে বলে ওঠেন—আজীম—আজীম!

২৩শে সেপ্টেম্বর। রছুলুল্লার রওজা মোবারক জিয়ারত করতে গেলাম। মনে হল, তাঁর রওজা মোবারক ঘিরে একটা অনির্বচনীয় প্রশান্তি ছেয়ে আছে। তাঁর পাশে শুয়ে আছেন তাঁর চির ও প্রিয় সহচর হজরত আবু বকর। হজরত ওমর যখন ঘাতকের ছুরিকাঘাতের ফলে ক্রমে মউতের দিকে এগিয়ে চল্লেন, তখন তিনি নাকি হজরত আয়শা রাজী আল্লাহু আনহার কাছে লোক পাঠিয়ে বলেন—রছুলুল্লার পাশে শেষ শয্যায় শয়ন করতে আমার একান্ত আকাঙ্খা—যদি আপনি অনুমতি দেন। হজরত আয়শা কেঁদে ফেলেছিলেন; ওড়নার আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বলেছিলেন—ওমর চাচ্ছেন, 'না' করার উপায় নাই; নইলে

ও-জায়গাটুকু আমার নিজের জন্যই এতদিন আলাদা করে রেখেছিলাম। পাশাপাশি এই তিন জনেরই মাজার পিতলের জাফরী দিয়ে ঘেরা। কাছে দাঁড়িয়ে আছে ছউদী পুলিশ—কেউ যাতে ছেজদা না করে, তাই দেখার জন্য। ছউদী আমলের আগে নাকি বহু লোকে রওজা মোবারকের বেড়ার গোড়ে ছিজদায় পড়ত।

মদীনার বিরাট মছজিদের ভিতরে এক পাশে এই রওজা। রওজার কাছেই রেলিংএ ঘেরা প্রায় চৌকোন খানিক জায়গা—এই খানে রছুলুল্লার আমলে থাকতেন আছহাবুছ-ছোফ্‌ফা—নিতান্ত দীন দরিদ্র—কখনো দিনে একবার এঁরা খেতে পেতেন, কখনো বা তাও পেতেন না—তবু মহানবীর ধর্মোপদেশ শ্রবণ ও তাঁর সাহচর্যের গৌরব লাভের জন্য এই একান্ত বিশ্বাসী সত্য-পিয়াসীরা এখানে পড়ে থাকতেন; আর মাঝে মাঝে বাইরে গিয়ে প্রচার করতেন।

মছজিদের কাছেই হজরত ওছমানের বাড়ী—যে বাড়ীতে তিনি শাহাদতের দরজা লাভ করেন। আর একটু দূরে বিখ্যাত ছাহাবী আবু আয়ুব আনছারীর বাড়ী। ইনি পরে ইছলাম প্রচার করতে করতে বসফরাসের তীরে গিয়ে হাজির হন ও সেখানেই শাহাদত লাভ করেন। ইস্তাম্বুলের উপকণ্ঠে তাঁর মাজার আজো মহা ইজ্জতের সঙ্গে রক্ষিত; আজো হাজার হাজার লোক সেখানে গিয়ে এই সত্যের সৈনিকের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। হজরত আবু আয়ুব আনছারীর বাড়ীর অদূরেই একটি কুতুবখানা—তুর্কী শাসন কালে এটি শায়খুল ইছলামের কুতুবখানা ছিল। ভিতরে গেলাম। অত্যন্ত সুন্দর চেহারা, পাতলা, লম্বা, বয়স আশির কাছাকাছি—শাদা পাগড়ী, শাদা চুল, শাদা দাড়ি, শাদা পোশাক—বার্ধক্যের ভারে দেহ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে—ইনিই লাইব্রেরীয়ান। তাঁর ফরমাস করার জন্য একটি ছোকরা সহকারী—কুতুবখানার এক কোণে বসে গভীর পাঠরত একটি যুবক, জিজ্ঞাসা করে জানলাম, ইনি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ঃ গবেষণা উপলক্ষে এখানে এসে

কয়েকটি বই পড়ছেন।

মনে হল, সমস্ত ঘরটির মধ্যে একটি বিদায়িত গৌরবের শেষ মহিমা-ছায়া যেন আজো কেঁপে কেঁপে বলছে—যাই—এখন যাই। লাইব্রেরীয়ানের দিকে চেয়ে শ্রদ্ধায়, আনন্দে, বেদনায় বুক ভরে উঠল। স্পষ্টই বুঝলাম, ইনি সে গৌরবের দিন দেখেছেন যেদিন শায়খুল ইছলাম ইস্তাম্বুল হতে মদীনায় পদার্পণ করলে সমস্ত নগর উৎসবে আনন্দে হেসে উঠত, কুতুবখানা অপূর্ব সাজে সজ্জিত হয়ে তাঁকে করত অভিনন্দন। আজ সেদিন নাই। কোন সুলতান, কোন পাশা, কোন শরীফ, কোন শায়খুল ইছলাম এ নগরে পদার্পণ করেন না। ইবনে ছউদ নাকি তার সমগ্র রাজত্ব কাল মধ্যে মাত্র একবার মদীনায় এসেছেন।

ছোট বেলায় শুনেছি, জীনেরা গুপ্তধন পাহারা দেয়। লাইব্রেরীয়ানকে দেখে মনে হল, ইনি একা আজো এইখানে পড়ে থেকে জ্ঞানের এই দুর্লভ ঐশ্বর্যকে পাহারা দিয়ে চলছেন। যেদিন ইনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বেন, সেদিন এ ঘরে বাতি দেওয়ার লোকও হয়তো আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

জিজ্ঞাসা করলাম—কুতুবখানায় ফারছী বই আছে? উত্তর দিলেন—না। তবে তোমাদের দেশের কাছের লোকের লেখা বই আছে। এই বলে তিনি একখানি বই নামিয়ে এনে সামনে ধরলেন। দেখলাম, ইমাম গাজ্জালীর ইয়াহীয়া-উল-উলুম।

বল্লেন—এক পেয়ালা চা খেয়ে যেতে হবে যে পাকিস্তানী দোস্ত্! আমি ছালাম জানিয়ে বল্লাম—নিশ্চয় খাব, ওস্তাদ। আপনার হাতে ছোঁওয়া চায়ের স্মৃতি যে আমার মনের কোঠায় অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে।

তাই আছে।

একটা এতিমখানা দেখতে গেলাম। একজন বাঙ্গালী—বাড়ী যতদূর মনে পড়ে চট্টগ্রামে—এতিমখানার অধ্যক্ষ্য। এঁরা কারো কাছে কিছু চেয়ে হাত পাতেন না। প্রতি বছর হাজীদের কেউ কেউ কিছু দিয়ে

যান। সওদাগর হাজীদের মধ্যে কেউ কেউ বাড়ী হতেও জাকাতের টাকা পাঠিয়ে দেন। আমরা কিছু দিলাম। কিন্তু অধ্যক্ষ সাহেব সেজন্য কোন ধন্যবাদ দিলেন না। আমার কাছে জিনিষটা বলিষ্ঠ মনের পরিচায়ক বলে মনে হল। তিনি এতিমদের জন্য সারাবছর এত খাটছেন, তার জন্য তাঁকে আমরা ধন্যবাদ দিলাম না, সামান্য কয়েকটি টাকা এতিমখানার তহবিলে দিয়ে আমরা ধন্যবাদের দাবী করি কেন? হায় রে ভিখারী মন, চিরদিন তুমি মানুষের প্রশংসার ভিখ মেগে বেড়াতে চাও!

এতিমখানায় কিছু পড়াশুনা আর কিছু কুটীর শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। শ্রেণীতে শ্রেণীতে গেলাম। ছেলেগুলি চটপটে, পড়াশুনাতে কেউ কেউ বেশ ভাল। কিন্তু দেহময় দারিদ্র্যের নিদারুণ চিহ্ন পরিস্ফুট। এরা খেজুরের আঁটি দিয়ে তছবী তৈয়ার করে। তার কয়েকটি কিনে আনলাম।

২৪শে সেপ্টেম্বর। ওহোদের লড়াইর ময়দান দেখতে চল্লাম। প্রাথমিক যুগের মুছলমানদের সেই জীবনমরণ সংগ্রাম মনের চোখে ভেসে উঠল। একদিকে মহানবী আর তাঁর মুষ্টিমেয় সহচর দল আত্মরক্ষায় যুদ্ধরত, অন্যদিকে কাফিরেরা আবু ছুফিয়ানের সৈনাপত্যে মহানবীকে সদলে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর; আর সে কাফির সৈন্যদলকে উত্তেজনাময় সমর সঙ্গীতে উন্মত্ত করে তুলছেন আবু ছুফিয়ান-পত্নী হেন্দা আর তাঁর সহচরীরা ঃ

আগে চল আগে চল ভাই,
তুফান-তনয় ভয় নাই, ভয় নাই।

কাফির-যোদ্ধাদের দিল উৎসাহের জোয়ারে দুলে উঠছে। হেন্দার দল তাদেরে হুশীয়ার করে আবার তান ধরেছে ঃ

প্রভাতী তারার কন্যা আমরা সবে
মখমল পরে করি মোরা বিচরণ
বরি লই যারা জয়ী হয় আহবে
লাথিতে তাড়াই হেরে আসে যারা রণ।

সংগ্রাম চলছে ঃ আহতদের চীৎকারে আকাশ বাতাস ভরে উঠছে। হজরত আয়শা ও হজরত ফাতেমা পানি নিয়ে আহতদের মুখে দিচ্ছেন, তাদের শুশ্রূষা কচ্ছেন। হজরত হামজা শহীদ হয়েছেন, রছুলুল্লা নিজে ভীষণ ভাবে আহত, আলী ও ওমরের তলোয়ার চলছে বোঁ—বোঁ—বোঁ-----।

সেদিনের সে মুজাহীদদের স্মৃতির উদ্দেশে জানালাম সশ্রদ্ধ ছালাম।

হজরত হামজা ও অন্যান্য শহীদানকে ওহোদের ময়দানেই দফন করা হয় ঃ তাদের মাজার জিয়ারত করলাম। এক কালে এসব মাজারের উপর ইমারত ছিল। দর্শকরা নাকি সে ইমারতকে ছিজদা করত। ইবনে ছউদ সে ইমারত ভেঙ্গে ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন; কেবল ফুট খানেক উঁচু পাথর দিয়ে কবরের চিহ্ন ঠিক রেখেছেন। এর পরও সেখানে একজন পুলিস মোতায়েন। কেউ কেউ এর মধ্যেও কবরের ধূলায় চুমা দিতে যায়, পুলিস তাড়া করে; পুলিসের পেছনে দাঁড়িয়ে সেই সুযোগে আর একজন একমুঠা ধূলা নিয়ে রুমালে বাঁধে।

ওহোদের ময়দান হতে গেলাম পরিখা লড়াইর ময়দানে। এই লড়াইয়েই নাকি আরবে সর্বপ্রথম পরিখা কেটে লড়াই করা হয়, আর এ বিদ্যা শিখিয়েছিলেন পারস্যদেশীয় ছাহাবী হজরত ছালমান ফারছী। এ যুদ্ধকালে রছুলুল্লা ও তাঁর ছাহাবী হজরত আবু বকর, ওমর, আলী, ও ছালমান ফারছী ময়দানের বিভিন্ন স্থানে আলাদা আলাদা তাঁবু গেঁড়েছিলেন। তুর্কী শাসন আমলে সুলতানের আদেশে প্রত্যেক তাঁবুর স্থানে এক একটি ছোট মছজিদ তৈয়ার করে দেওয়া হয়েছে।

২৫শে সেপ্টেম্বর। জান্নাতুল বাকী জিয়ারত করতে গেলাম। মদীনার মছজীদের অদূরেই অবস্থিত এই বিখ্যাত গোরস্তান। জান্নাতুল বাকীর শব্দগত মানে অক্ষয় উদ্যান। এ নাম কেন হল, মুয়াল্লিমরা কেউ বলতে পারলেন না। আমি কিন্তু একটা অর্থ পেয়ে গেলাম। এ গোরস্তানের লক্ত আছে একটি বিরাট বাগান। আরবের বাগান প্রাকৃতিক

পানি সরবরাহের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং এদেশের বাগান দীর্ঘজীবী। কোন ফোয়ারার পাশে হাজার হাজার বছর ধরে বাগান থাকতে পারে। আমার মনে হয়, এ বিরাট বাগানের খানিকটা ভেঙ্গে করা হয় গোরস্তান আর সে গোরস্তানের নাম করা হয় জান্নাতুল বাকী—অমর উদ্যান। মূল বাগানে গাছ মরবে, ফুল শুকাবে, কিন্তু যে পুণ্যাত্মা মানুষের ফুলে এ বাগান শোভিত, সে ফুল কখনো শুকাবে না। এ উদ্যানের মাটিতে আছেন হজরত আব্বাছ, হজরত ফাতেমা, হজরত হাছান, হজরত জয়নুল আবেদীন, আরো হাজারো মহিমান্বিত মৃত। এঁদের কীর্তির ফুল যে কালের পটে অমর হয়ে ফুটে আছে!

এখানকার কবরগুলির অবস্থাও ওহোদের কবরের মত—ধূলিসাৎ। কবরের চিহ্ন আছে, কিন্তু লিখিত কোন পরিচয় নাই। মুয়াল্লিমরা কবরগুলির নাম যথা সম্ভব মনে রেখেছে—তাই হাজীদেরকে শুনান হয়।

জান্নাতুল বাকী ও ওহোদের কবর দেখে একটা কথা মনে পড়ল। আমরা ছোট বেলায় শুনতাম, আগেকার জামানার পীর পয়গম্বরেরা বিরাট বিরাট জোয়ান ছিলেন, এখনো দেখা যায়, তাদের এক এক জনের কবর চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট হাত লম্বা। ওহোদে দেখলাম হজরত হামজার কবর, মনে হয় দৈর্ঘ্যে পাশে ত্রিশ হাত কুড়ি হাতের কম নয়। আসলে কিন্তু হজরত হামজার সঙ্গে বাকী শহীদানও ঐ স্থানে সমাহিত হন। ইতিহাসের হিসাবে ওহোদের লড়াই সেদিনের কথা। তাই লোকেরা এখনো মনে রেখেছে যে কবরটি হামজার কবর বলে মশহুর হলেও ওখানে আরো অনেকে আছেন। তেমনি জান্নাতুল বাকীতে একটি বিরাট কবর দেখলাম;—শুনলাম, সেখানে আছেন হজরত আব্বাছ, ফাতেমা, হাছান ও জয়নুল আবেদীন। অথচ কবরটি সাধারণতঃ হজরত ফাতেমার কবর বলেই পরিচিত। আমার মনে হয়, আগের জামানার পীর পয়গম্বরদের সঙ্গেও তাঁদের ভক্ত সহচরগণকে সমাহিত করা হত; কালক্রমে লোকে সে সহচরদের কথা ভুলে গেছে; সুতরাং ক্রমে সাধারণের মধ্যে এই বিশ্বাস

জন্মেছে যে সাকুল্য কবরটি মাত্র একজনেরই। অতএব ষাট হাত লম্বা যার কবর, তিনি কমছে-কম পঞ্চাশ হাত লম্বা জোয়ান তো ছিলেনই বটে!

মদীনা শরীফের বর্তমান অবস্থা পরম বেদনাদায়ক। মুছলিম রাষ্ট্রের সর্বপ্রথম রাজধানী এই মদীনা—এইখানে বসে শাসন শক্তি পরিচালন করেছেন মহানবী নিজে, তারপর হজরত আবুবকর, তারপর মহাবাহু ওমর, তারপর হজরত ওছমান। প্রবল-প্রতাপ রোমক সম্রাটের দূত এইখানে এসে আমীরুল মুমেনীন ওমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। জাকাতের পয়সা গ্রহণের মত গরীব মদীনায় খুঁজে না পেয়ে খলীফা একবার বাইরে জাকাতের মাল পাঠাতে বাধ্য হয়েছিলেন।

আর আজ?

আজ মদীনাময় ফকীর মিছকীন। পথে ঘাটে চলতে ফিরতে ছেলেরা এসে হাত পাতে, মেয়েরা এসে হাত পাতে। মছজিদে ঢুকতে, মছজিদ হতে বের হতে দেখি রাস্তার দুইপাশে দাঁড়িয়ে ফকীর মিছকীনের সুদীর্ঘ কাতার। একটা মহল্লার ভিতরে গেলাম। বাড়ীঘর সবই পাকা; এক একটা দুয়ারের পাল্লা বিরাট—তার উপর ফুলের কাজ—কালো হয়ে গেছে—কতদিনের পুরানো কে জানে? এখানে বৃষ্টি নাই, বর্ষা নাই, শিশিরপাত নাই; কাজেই এখানকার শক্ত কাঠের জিনিস পুরান হতে জানে না। মনে হয়, এসব বাড়ীর মালিকেরা এক কালে ধনে জনে সুখী ছিল। আর আজকের বাসিন্দা? দুনিয়ায় এদের মত দুঃখী বুঝি আর কোথাও নাই। পথ দিয়ে আমরা চলেছি—পায়ের আওয়াজ শুনে এরা বুঝেছে, হাজীরা যাচ্ছে। অমনি পাঠিয়ে দিয়েছে ছোট ছেলে মেয়ে—কিছু চাইতে। সুন্দর ফুটফুটে রং, পিয়ারা চেহারা—নিঃসন্দেহে ভাল ঘরের সন্তান। যে বাড়ীতে ছেলেমেয়ে নাই, সে বাড়ীর বাইরের দুয়ারের মধ্যে এক মস্তবড় গোলাকার ছিদ্র। সেই ছিদ্র পথে বেরিয়ে এসেছে একটি তরুণীর হাত-পাতা হাত—চিকন, সুডৌল গৌরকান্তি, অলঙ্কারহীন—সুন্দর।

আহা!

পথে ঘাটে পেয়ে সামনে হাত পাতলে আমি সাধারণতঃ তাকে একটা উপদ্রব মনে করি। এখানে তেমন কিছু মনে হল না। ভাবলাম, হয় হিজরত, না হয় হাত পাতা—এ ছাড়া আপাততঃ এদের উপায় কি? তুর্কী আমলে মদীনার সাথে রেল লাইন মারফত বাইরের জগতের সাথে যে যোগাযোগ ছিল, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় শরীফ হোছেনের লোকেরা তা তুলে ফেলেছিল, ইবনে ছউদ আর সে রেল লাইন নতুন করে পাতেন নাই। তুর্কী আমলে শহরে লোক ছিল এক লাখের উপর, এখন লোক সংখ্যা চল্লিশ হাজার। মক্কায় জেদ্দায় নতুন নতুন দালান উঠছে, মদীনায় আগের দালানগুলিই ভেঙে পড়ছে। ব্যবসা বাণিজ্য উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই। দুইটি মাদ্রাছা দেখলাম—তাও পুরানা ধরনের—নব জীবনের আয়োজন তাতে নাই। বড় শেখ, বড় আমীর, বড় সওদাগর, বড় ছিপাছালার, বড় কেউ নজরে পড়ল না। মক্কার বাজারে যে-সব দামী কাপড়-চোপড়, আছবাব-পত্র দেখেছি, মদীনার বাজারে তার সিকিও নাই।

মদীনা অবহেলিত।

হারানো দিনের শেষ চিহ্ন মদীনায় যে-সব থাকার কথা ছিল, তার বেশীর ভাগই চোখে পড়ল না। হজরত আবু বকর যে স্থানে দাঁড়িয়ে তাঁর অপূর্ব নির্বাচনী বক্তৃতায় বলেছিলেন—'বন্ধুগণ, যতদিন আমি আল্লা ও রছুলের হুকুম পালন করে চলব, ততদিন আপনারাও আমার হুকুম পালন করে চলবেন; আর যখন আমি সে আদেশ লঙ্ঘন করব, তখন আপনারাও আমার আদেশ লঙ্ঘন করবেন'—সে পুণ্যস্থান কোথায়? যে খেজুর পাতার কুটির দুয়ারে দাঁড়িয়ে হজরত ওমর ইয়ারমুক ও কাদেছীয়ার লড়াইর হুকুম দিয়েছিলেন, কোথায় সে ঐতিহাসিক স্থান? তাঁদের ঢাল তলোয়ার, তাঁদের পোষাক পরিচ্ছদ, তাঁদের কেতাব কোরান মক্কা মদীনার কোথাও দেখলাম না; সত্যি কোথাও আছে কিনা তারো কোন খবর পেলাম না।

এ পত্র খতম করার আগে ছউদী আরব সম্বন্ধে আরো দুটি কথা বলি; নইলে তোমার খুঁতখুঁতে মন শান্ত হবে না। সম্পর্কে তুমি আমার সম্বন্ধীর ছোট ছেলের ছোট মায়ের ছোট ভাই। কিন্তু এতগুলি ছোট একত্র হয়েই তো আমার বিপদ বাড়িয়েছে। এ জাতীয় কুটুম্বিতার ঐ তো খছুছিয়ত ঃ এরা সম্পর্কে যত ছোট হয়, এদের প্রতাপ আর উপদ্রব ঠিক সেই পরিমাণেই বেড়ে যায়। তা ছাড়া আরো বিপদ আছে ঃ এদেরে কম খাতির করলে অলক্ষ্যে অন্যত্র কল বিগড়ে বসে থাকে। সে কল ঠিক করতে আবার বে-এন্তেহা তেল খরচ।

ছউদী আরবের আয়তন দশ লক্ষ বর্গমাইল; লোক সংখ্যা কিন্তু মাত্র ৭০ লাখ ঃ আমাদের এক মোমেনশাহী জিলার বাসিন্দাই প্রায় ৭০ লাখ। সমগ্র ছউদী আরবের কাগজের সংখ্যা চারটি—তিনটি মক্কায় (আল-বিলাদ, আল-মনহল, উম্মুল কারী), একটি মদীনায় (আল-মদীনা)।

জেদ্দা ছউদী আরবের একমাত্র বন্দর। বিদেশী দূতেরাও এখানেই বাস করেন; কারণ অমুছলমানদের পক্ষে মক্কা, মদীনা বা আরো ভিতরের দিকে যাওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করা হয় না।

তেলের দৌলতে ছউদী আরব দ্রুত ঐশ্বর্যের পথে চলেছে। আরব-আমেরিকা মিলে যে তেলের কোম্পানী খুলেছে, তারাই ছউদী আরবের তেলের কারবার করছে। ১৯৩৫ সালে তেলের খনি তালাস শুরু হয়। বর্তমানে রোজ ৫ লাখ পিপা তেল বিক্রির জন্য তৈয়ার হয়। পৃথিবীর তেল উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে ছউদী আরবের স্থান এখন পঞ্চম। তেল হতে এক্ষণে ইবনে ছউদের দৈনিক আয় পোনে দুই লাখ টাকা।

ধন-প্রাণের নিরাপত্তা ছউদী আরবে যা আছে, তা বোধ হয় বর্তমানে দুনিয়ার কোথাও নাই। চুরি, রাহাজানী—এসব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের পুলিসের যেমন বাহাদুরী, সে দেশের চোর বাটপারেরো তো তেমনি বাহাদুরী। কাজেই সে দেশের শাসন দক্ষতার

প্রশংসা চলে না। ছউদী আরব আজ গর্ব করে বলতে পারে—রাত্রিতে দুয়ার খোলা রেখে নাগরিকেরা ঘুমিয়ে পড়ুক, কেউ তাদের ধনমালের দিকে ফিরেও চাবে না।

তোমার বিবির গয়না তো এ পর্যন্ত তিন তিন বার চুরি গেছে; কাজেই এ সংবাদটা তাঁকে না হয় নাই দিলে; কি জানি গয়নার হেফাজতের লোভে যদি তিনি তোমার গোয়াল শূন্য করে এদেশে হিজরত করে আসার পণ করে বসেন।

ছউদী আরবের পথঘাট খুব ভাল হয়েছে, এখনো এমন বলা চলে না। মাত্র জেদ্দা-মক্কা রাস্তাটি পাকা ঃ বাকি পথ বালি কঙ্করের উপর দিয়ে। লোকে গাধায় চড়ে, ঘোড়া হাকায়, উটে ছওয়ার হয়; ইদানিং তারা মোটর, হাওয়াই জাহাজেও চলাচল করে দেখলাম ছোহবতের কি অদ্ভুত প্রভাব ঃ আরবের মোটরগুলি ইতিমধ্যেই উটের অভ্যাস অনেকটা আয়ত্ত করে ফেলেছে,—পথ নাই, অপথ নাই, দিন নাই, রাত নাই, বালির উপর দিয়ে বেপরোয়া চলে যায়।

ইবনে ছউদ লম্বায় মাত্র ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি; তাঁর দেহের বেড় ও ওজন সেই অনুপাত মোতাবেকই আছে। বয়স এখন তাঁর সত্তুরের উপর; বাতে অনেকটা পঙ্গু হয়ে পড়েছেন। কিন্তু এই মরু-সিংহ তাঁর রোগশয্যা হতে হুঙ্কার ছাড়লে আজো আরব কেঁপে ওঠে।

আজ ২৬শে সেপ্টেম্বর। মহানবী, তাঁর ছাহাবী ও ছাহাবীয়াদের উদ্দেশে ছালাম জানিয়ে আমরা মদীনা ছেড়ে বৈরুত চল্লাম।

দামেশ্ক
২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫১

খালেদা,

মদীনা হতে যে খেজুর পাঠিয়েছি, তা হয়তো ইতিমধ্যে পেয়ে গেছ। বছরাই খেজুরের নাম আছে, কিন্তু মদীনার খেজুরের কাছে নাকি কিছু নয়। কবি কায়কোবাদের কাব্যে ছোটবেলায় পড়েছিলাম যে আরবদের বিজয়ের দিনে তাদের আসল সম্বল ছিল তাদের ঈমান, তাই তারা ভুবন জয় করতে পেরেছিল শুধু—

করে অসি
কটিদেশে
খর্জুর বাঁধিয়া।

খাদ্য হিসাবে খেজুরের মূল্য নাকি অত্যধিক। গাছের শুকনা খেজুর, আর মরুর শুকনা হাওয়া, এই দুইটি মিলে আরবদের দেহে যে অফুরন্ত সহনশক্তি দেয় তা নাকি অন্যত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন।

আমরা অবশেষে খেজুরের দেশ ছেড়ে সিরীয়ায় চল্লাম। তারই সম্বন্ধে আজ দু-চারটি কথা তোমাকে লিখব।

সিরীয়াকে আরবীতে বলা হয় শাম। ছোটবেলা হতে বাংলা পুঁথিপত্রে এই শাম দেশের কথাই তোমরা পড়েছ।

পৃথিবীতে এমন বিক্রান্ত জাতি কমই আছে, যাদের বিজয় বাহিনীর উদ্ধত অশ্বারোহীরা সিরীয়ার শ্যামল বুকে তাদের পদচিহ্ন এঁকে দিয়ে যায় নাই।

খৃষ্টের জন্মের দুই হাজার বছর আগে থেকে মিসরীয়, আসিরীয়, হিতাইতীয়, পারসীক, গ্রীক—এরা প্রত্যেকেই কোন না কোন সময়ে তাদের আধিপত্য বিস্তার করে এ দেশের উপর তাদের সংস্কৃতি ও জীবনের চিহ্ন রেখে গেছে। মহাবীর আলেকজান্দার সিরীয়া আক্রমণ ও অধিকার

করেন। বহু গ্রীক মনীষী সিরীয়ার শহরে শহরে বাস করতেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে সিরীয়া গ্রীকদের হাত হতে রোমকদের হাতে চলে যায়। প্রায় ৭০০ বছর কাল পর্যন্ত রোমকরা এখানে দোর্দণ্ড প্রতাপে তাদের শাসন দন্ড পরিচালন করে। ইতিমধ্যে পারসীকেরা মাঝে মাঝে সিরীয়ার উপর হামলা করতে থাকে এবং স্থানে স্থানে তাদের আধিপত্যও বিস্তার করে ফেলে। ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে সমগ্র সিরীয়া ও ফিলিস্তিন আরবদের হাতে আসে। মহাবীর খালেদের অস্ত্রের ঝঙ্কার আজো মাঝে মাঝে দূর-শ্রুত বজ্রধ্বনির মত আরবদের কানে ভেসে আসে; আজো এ দেশের উটেরা সে বিজয় অভিযানের কথা ভাবে আর বর্তমানের সাথে তুলনা করে কাতর কণ্ঠে কেঁদে বলে—

খুন দেখিয়াছি, তূন বহিয়াছি, নুন বহি নাই কভু,
খালেদ, তোমার শোতর বাহিনী! (আজি) সদাগর তার প্রভু!

দামেশ্ক বহুকাল পর্যন্ত উমাইয়া খলীফাদের রাজধানী ছিল। তার পর আব্বাছীয়া খলীফারা রাজধানী বাগদাদে সরিয়ে নেন। একাদশ শতাব্দীতে সেলজুকীয় তুর্করা মধ্য এসিয়া হতে এসে আস্তে আস্তে সিরীয়া জুড়ে বসে। তারপর আসে য়ুরোপের ক্রুসেড-বাহিনী; তারা জেরুজালেম পর্যন্ত গিয়ে পেঁছে ও একটি রাজ্যও স্থাপন করে। ইতিমধ্যে আবির্ভূত হন মহাবাহু ছালাহুদ্দীন। তাঁর প্রতাপে ইংল্যাণ্ডের রাজা সিংহ-হৃদয় রিচার্ড ও অন্যান্য য়ুরোপীয় যোদ্ধারা পরাজয় মেনে ফিরে আসে। তারপর সিরীয়ায় উপস্থিত হয় হালাকু খাঁর বর্বর বাহিনী। ভুবন বিজয়ী তৈমুর লং—তিনিও সিরীয়াকে তাঁর দুর্বার অভিযানের বাইরে ফেলেন নাই। পঞ্চদশ শতাব্দীতে তুর্ক সম্রাট দোর্দণ্ড-প্রতাপ ছলীম সমগ্র সিরীয়া অধিকার করে ওছমানীয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। ১৭৯৯ সালে মহাবীর নেপোলিয়ন বোনাপার্টী এসে গাজা ও জাফ্‌ফা দখল করার পর একর অবরোধ করেন, কিন্তু পরাভব মেনে ফিরে যেতে বাধ্য হন। ১৮৩১ সালে মিসর-অধিপতি মুহম্মদ আলী

পাশার পুত্র ইব্রাহীম পাশা সমগ্র সিরীয়া অধিকার করে বসেন; কিন্তু উদীয়মান মিসরীয় শক্তির এই শৌর্যবীর্যে ভীত হয়ে ইংরেজ সরকার মাঝখানে এসে পড়ে; ফলে তুর্করা আবার সিরীয়া ফিরে পায়। ইতিমধ্যে সিরীয়ায় জাতীয় আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে ঃ দেশের কেন্দ্রে কেন্দ্রে গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হয়; তারা অক্লান্ত ভাবে প্রচার করতে থাকে আরব জাতীয়তার মহিমা গাথা। ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের দুন্দুভি বেজে ওঠে। মিত্রপক্ষ আরব ও সিরীয়ার কানে কানে বলে এইবার তোমরা আমাদের সাথে মিলে তুর্কদের বিরুদ্ধে লেগে যাও; যুদ্ধশেষে আমরা তোমাদেরে আজাদ করে দিব। আরব-সিরীয়া তাই করে। কিন্তু যুদ্ধশেষে মিত্রপক্ষ মিলে সব ভাগ বাটোয়ারা করে নেয়। সিরীয়া পড়ে ফরাসীর ভাগে। বঞ্চিত সিরীয়া আবার আজাদী আন্দোলনে মেতে ওঠে। ১৯২৫ সালে দ্রুজ-নেতা সুলতান আল-আতরাশ ফরাসীদের এক প্রবল বাহিনীতে বিধ্বস্ত করে ফেলেন; প্রতিশোধ-উন্মত্ত ফরাসীরা দামেস্কে আগুন লাগিয়ে দেয়। অবশেষে ১৯৪১ সালে ফরাসীরা সিরীয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়। বিদায়কালে শেষ অভিবাদন স্বরূপ ফরাসীরা উড়োজাহাজ হতে দামেস্কের উপর কতকগুলি আগ্নেয় বোমা ফেলে যায়।

আজ সিরীয়া স্বাধীন—পার্লামেন্টারী রিপাবলিক। সিরীয়ার বাইরের দুশমন গিয়েছে; কিন্তু তার অন্তর্দ্বন্দ্ব এখনো শেষ হয় নাই। তবে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ফছাদ যাই থাক, রাজনৈতিক দলনির্বিশেষে সমগ্র সিরীয়া আজ প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর।

কিন্তু পত্র বড় দীর্ঘ হয়ে পড়ছে, না? উপায় কি? যে দেশে এলাম, তার অতীত সম্বন্ধে তুমি সত্যি তো কিছু জানতে চাবে।

আচ্ছা, এবার তা হলে ইতিহাসী কথা থাক। সিরীয়ায় আমি কি কি দেখলাম, তারই দুচারটি কথা তোমায় বলি।

২৬শে সেপ্টেম্বর মদীনা মনোওয়ারা হতে ছউদী আরব হাওয়াই

জাহাজে বৈরুত এলাম। পথে জাহাজ কোম্পানী আমাদের নাশ্তার ব্যবস্থা করলেন। আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিলাম; হঠাৎ মনে হল, কে যেন আমাকে ঢিল মারল। চেয়ে দেখি, ঢিল তো নয়, নাশ্তার ঠোঙা—আমার কোলে ফেলে দিয়েছে। মনে পড়ল—বেদুঈনের দেশ দিয়ে চলেছি। খুলে দেখি—মুরগীর রান, আণ্ডা, ছেব, আঙুর, খেজুর আর কাগজের বাকসের এক বাকস প্রথম শ্রেণীর বিস্কুট। মন খুশী হয়ে উঠল; ভাবলাম—যে গরু দুধ দেয় তার লাথিও ভাল, এ মিথ্যা নয়।

বৈরুতে নামার পর আমাদের নিয়ে চল্ল কোয়ারেনটাইনে। শুনলাম, সেখানে ৫ দিন থেকে প্রমাণ করতে হবে যে আমাদের গায় কোন ব্যারামের বীজ নাই। আমি শ্বশুরবাড়ী ছাড়া আর কোন আত্মীয় বাড়ী পাঁচ দিন কখনো থেকেছি বলে মনে হয় না। এখানে পাঁচ দিনের নাম শুনে ভয় হল ঃ শ্বশুরবাড়ীতে শালা-শালীদের যেমম কান মলা আছে, আবার খানা পিনারো তেমনি ভয়াবহ সুন্দর ব্যবস্থা আছে। এখানে কেবল্ কান মলাই সার হবে।

হঠাৎ আমাদের মাথায় একটা বুদ্ধি এল—বল্লাম, আমরা এক্ষণি দামেশ্ক যাচ্ছি; এখানে দেরী করে রোগবীজাণু ছড়ানোর কোন দুরভিসন্ধি আমাদের নাই। কর্তারা আমাদের পরিচয় নিলেন। বল্লেন, আচ্ছা, মাফ।

আমরা তখনই মোটরে দামেশ্ক চল্লাম। ৬০ মাইল পথ—পাহাড়-পর্বত-উপত্যকা, অধিত্যকা, বাগ বাগিচা, বন উপবন—পরিষ্কার নীল আকাশ—দিগন্ত প্রসারিত দৃষ্টি—সমস্ত মিলে ড্রাইভটিকে অদ্ভুত উপভোগ্য করে তুল্ল। বল্লাম, দামেশ্ক যাওয়াটা আমাদের ফাও, কেবল পথের এই আনন্দের জন্যই যদি আমরা গাড়ী আর নাশ্তায় আরো ব্যয় করতাম, তবে আমাদের আফছোছের কিছু থাকত না।

বৈরুত-দামেশ্কের পথে আবার মিল্ল সেই ফলের বাহার। মাঠের ভিতর দিয়ে চলেছি। আবাদী মাঠ—দুইশ তিনশ হাত দূরে দূরে একটি

করে কুঁড়ে ঘর—সে ঘর ভর্তি কেবল ফল আর ফল—তরমুজ বাঙির কাড়ি ঃ ফুলদার কাপড়-পরা বালক বালিকা—ফল সামনে নিয়ে পথিকের জন্য প্রতীক্ষমান। আলী আকবর খাঁ বল্লেন—এখানে নেমে বাড়ী ঘর করে বসে পড়লে হয় না?

দামেশ্কে গিয়ে উঠলাম ওরিয়েণ্ট প্যালেস হোটেলে। দামেশ্কে এটিই সবচেয়ে বড় আর সবচেয়ে ভাল হোটেল। মালিক বিলাতী সাহেব; ব্যবস্থা চমৎকার।

২৭শে সেপ্টেম্বর সকালের দিকে বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে গেলাম। প্রথমে দেখা হল মেডিকেল কলেজের ডিরেক্টর কামাল বে রুমানী-র সঙ্গে। মেডিকেল হাসপাতালের ব্যবস্থা ভাল, ঢাকা হাসপাতালের মত হবে মনে হল। তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্চ্যান্সেলারের সঙ্গে। ভাইস্চ্যান্সেলার পন্ডিত ব্যক্তি—দেশে বিদেশে সুনাম আছে—ধর্মে খৃষ্টান ঃ জ্ঞান বিতরণ ব্যাপারে কে কোন্ ধর্মের লোক, দামেশ্কীরা তার বিচার করে না। উচ্চতর শিক্ষার ডিরেক্টর জামিল সালীবা—ইনিও খৃষ্টান—ফরাসী ভাষায় এঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ আছে। ইনি ঐ ভাষায় দার্শনিক আবু আলী ছীনার জীবনী লিখেছেন। ডক্টর ফাখের আকিল দামেশ্কী মুছলমান—দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক—পরম উৎসাহী—সব বিভাগে ঘুরে ঘুরে দেখালেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার্থী সংখ্যা ২৫০০, তার মধ্যে প্রায় ৫০০ মহিলা। ট্রেনিং কলেজে ছাত্রীর সংখ্যা বেশ। প্রাথমিক স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষা, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজে ছেলে মেয়েরা আলাদা আলাদা পড়ে। সমস্ত সিরীয়ায় আঠার বছর বয়স পার হলেই যুবকদের জন্য সামরিক শিক্ষা বাধ্যকরী। এ শিক্ষার জন্য যুবকদের আগ্রহের অন্ত নাই ঃ ইছরাইলের ইহুদীদের উপদ্রব কখন কিরূপ ধারণ করে কে জানে? যুবকদের এ আগ্রহ থাকা সত্বেও যথেষ্ট সংখ্যক সামরিক শিক্ষকের অভাব হেতু প্রত্যেক যুবককে ট্রেনিং দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠছে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স মাত্র পাঁচ বছর ঃ ফরাসীরা চলে গেলে শুরু করা হয়েছে। কাজেই শিক্ষার আয়োজন সব বিভাগে সন্তোষজনক নয়; তবে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে এসব অভাব দূর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হচ্ছে। শিক্ষার মাধ্যম আরবী। আরবীতে বিজ্ঞান দর্শনের বই যথেষ্ট না থাকায় এঁরা অনেক বই লিখিয়ে নিচ্ছেন।

পাকিস্তান সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় মহলে ব্যাপক জ্ঞানের সন্ধান মিল্ল না। পাকিস্তান লিগেশন হতে বিশ্ববিদ্যালয়ে কতকগুলি বই দেওয়ার ব্যবস্থা করলাম। কাজী নজরুল ইসলামের কোন কোন কবিতা দামেশ্কের আরবী মাসিকে প্রকাশ করার চেষ্টা করা গেল।

দামেশ্ক পার্লামেন্ট দেখতে গেলাম। কাজ আরবী ভাষায় পরিচালিত হয়। মগরেবের ওয়াক্ত হল। পার্লামেন্ট চলতেই লাগল। মেম্বরদের মধ্যে যাঁর যাঁর ইচ্ছা উঠে নামাজ পড়ে এলেন। নামাজের ঘরটি ছোট—সভ্যদের সবাই গেলে স্থান হওয়ার কথা নয়। সভ্যদের মধ্যে খাঁটি আরবী পোশাক পরা, কোটের উপর ফেজ পরা, খাঁটি বিলাতী পোশাক পরা—তিন রকমই দেখা গেল। নতুন পার্লামেন্ট ঘর তৈরী হচ্ছে—৫ লাখ টাকা খরচের বরাদ্দ—যেটুকু হয়েছে, তা অত্যন্ত সুন্দর—করাচী-কলকাতা উভয় স্থানের চেয়ে ভাল। বাসিন্দাদের সৌন্দর্যজ্ঞান ও সৌন্দর্যপ্রীতি উভয়ই আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত।

সিরীয় রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট আমাদেরে এক প্রীতি ভোজে দাওয়াত করলেন। তের চৌদ্দ পদ খানা—শব্জী, মাছ, গোশ্‌ত—ভাজী, সিদ্ধ, রান্না হরেক রকমের। মন্ত্রীদের অনেকে খানার শরীক ছিলেন। পাকিস্তান সম্রন্ধে তাঁরা অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

উমাইয়া খলীফাদের মছজিদ দেখতে গেলাম। বিরাট। অত বড় লম্বা কাতারওয়ালা মছজিদ নাকি দুনিয়ায় আর নাই। মছজিদ নয় তো—এক মিউজিয়াম। প্রথমে ছিল প্রতিমা পূজার মন্দির, তারপর ছিল ইহুদীদের ধর্ম মন্দির, তারপর ছিল খৃষ্টানদের গীর্জা, তারপর হয়েছে

মুছলমানদের মছজিদ। বিশ বছর আগে মছজিদটির অনেকাংশ পড়ে যায়। ফরাসী শাসন আমলে কোন মেরামত হয় নাই। এত দিনে মেরামত শুরু হয়েছে। মছজিদের মধ্যে কয়েকটি ঐতিহাসিক জিনিস দেখান হয়। প্রথম—হজরত ইয়াহীয়া পয়গম্বরের মাজার; দ্বিতীয়—কারবালার শহীদ হজরত হোছেনের মস্তকের মাজার; তৃতীয়—রছুলুল্লার একটি দাড়ি। সমস্তই অতি সযত্নে রক্ষিত। জুমার নামাজ আমরা এই মছজিদে পড়লাম। ইমাম আরবী পোশাক করা—তবে চোগার নীচে কোটের গলায় নেকটাই। কোন বই পড়লেন না—সত্যিকার খোতবা দিলেন। অত্যন্ত ওজস্বিনী ভাষায় ইছলামের প্রচার ও গৌরবযুগের কাহিনী বর্ণনা করলেন। অমন ইমামের পেছনে নামাজ পড়ে তৃপ্তি আছে।

আরব, ইরান, তুরস্ক, মিসর, সিরীয়া সবখানেই দেখলাম—ইমামেরা কেরায়াত লম্বা করেন না। বড় জামাত হলে সেখানে রোগী থাকতে পারে, তাড়াতাড়ি কোন জরুরী কাজে যেতে হবে এমন লোক থাকতে পারে, কাজেই যাতে কারো তকলীফ বা কাজের অসুবিধা না হয় সেজন্য ছুরা ও মোনাজাত ছোট হওয়া উচিত। ইছলামের এই নিতান্ত সুবিবেচনা সম্মত সুপারিশ তাঁরা মেনে চলেন।

দামেশ্‌ক

২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫১

ভাই ইবনে-খালদুন,

গতকাল খালেদাকে যে পত্র লিখেছি, তাতে সিরীয়ার কথা কিছু কিছু বলেছি। কিন্তু তুমি কেতাবকীট গোছের মানুষ তো, তাতে তুষ্ট হবে না। বলবে, ঐতিহাসিক জিনিস চোখে কি দেখলে, তা তো লিখলে না।

তোমার এবারের খুঁতখুঁতিটি আমি স্বীকার করে নিচ্ছি। তুমি চিতলের বড় পেটীখানা না পেলে যখন খুঁতখুঁত শুরু কর, আমি তখন বেজার হলেও ভাবি, যাক, হাজার হলেও পরমাত্মীয় তো, তার খাতিরে আমি না হয় ছোট পেটীটাই খেলাম। কিন্তু আইড় মাছের আস্ত পিছাটি তোমার বাসনের বুকে এসে আসন না পাতা পর্যন্ত তুমি যখন খুঁতখুঁত করতে থাক তখন—কোন ব্যক্তির ভয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলতে সাহস না পেলেও—আমি মনে মনে তার ভয়ানক প্রটেস্ট্ করি। বুঝি, তুমি তোমার বোনের উপস্থিতির সুযোগ নিয়ে আমাকে অন্যায় ভাবে একস্‌প্লয়েট করছ। দুর্নিবার রাগে নিঃশব্দে গড় গড় করতে করতে অবশেষে চরম ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা চিন্তা করে ফেলি; ভাবি, তোমাকে আমার অবস্থায় আর আমাকে তোমার অবস্থায় ফেলে একবার তোমাকে আচ্ছা রকম জব্দ করে ছাড়ব না কি!

কিন্তু আজ তোমার খুঁতখুঁতিকে অভিনন্দন করছি এই জন্য যে সিরীয়াতে সত্যি অমূল্য ঐতিহাসিক সম্পদ আছে; আর তার যে সামান্য কিছু আমার দেখবার সুযোগ হয়েছে, তাতেই আমার সিরীয়ায় আসাকে সার্থক মনে করছি।

তোমাদেরে আগে এক পত্রে বলেছি, বৈরুত হতে আলেপ্পো যাওয়ার পথে কি করে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে আমরা হেমস্‌ শহরে নেমে মহাবাহু খালেদ-বিন-ওলীদের মাজার জিয়ারতের সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। দামেশ্কে এসে বারবার মনে হচ্ছিল, এত বড় শহর—এত মানুষের মাজার এখানে নিরাপদে আছে, সিরীয়া বিজয়ী খালেদের মাজার এত দূরে রইল কেন? আবার ভাবছিলাম, তাঁর গৌরবময় বিজয়ের পরম মুহূর্তে পদচ্যুত হয়ে দেশের দূর প্রান্তের একটি ছোট্ট শহরের কোণে তাঁর শেষ শয়নস্থান নির্বাচন করে তিনি ভুল করেন নাই। শোনা যায়, সেখানেও তিনি সুখে মরতে পারেন নাই; মৃত্যুশয্যায় অস্থিরভাবে এপাশ ওপাশ করতে করতে আফছোছ করে বলেছেন ঃ তলোয়ার হাতে শহীদের

গৌরবময় শয্যায় শয়ন করার জন্য যার চিরদিনের আরজু, সে আজ তুচ্ছ পীড়ায় গৃহের কারায় ধুকে মরছে! উহ্!

দামেশ্কে প্রথম দেখতে গেলাম ইমামুদ্দীন জঙ্গীর মাজার। আমার কৈশোর হতে জঙ্গী আমার হৃদয়ে এক বিপুল ইজ্জতের আসন অধিকার করে আছেন। কি দুর্জ্ঞেয় আকর্ষণ ঐ ছোট্ট নামটিতে আছে, আমি তার মোহ কোন দিনই কাটিয়ে উঠতে পারলাম না। এখনো মনে পড়ে সেই সাড়ে আট শ বছর আগের কথা। সন্ন্যাসী পিটারের উন্মাদনাময় বক্তৃতায় আত্মহারা খৃষ্টান ধর্মযোদ্ধারা প্রথম ক্রুসেড ঘোষণা করতঃ দলে দলে জেরুজালেমে ভেঙ্গে পড়ে, করে নিরীহ মুছলিম অধিবাসীদেরে নির্বিচারে হত্যা, হাজার হাজার জনকে জীবন্ত দগ্ধ করে মারে জ্বলন্ত অগ্নিকুডে। ইছলামের সেই দুর্দিনে তার ঘনঘটাচ্ছন্ন আছমানে আবির্ভূত হয় এক নব জ্যোতিষ্ক; সে দিনের সে ঘনায়মান অন্ধকার অচিরে অদৃশ্য হয়ে যায়। এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হলেন ইমাদুদ্দীন আতাবেগ জঙ্গী। ইনি ১১২৮ সালে ক্রুসেড যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন; ধীরে ধীরে মুছলিম জাহান খৃষ্টানদের হাত হতে অব্যাহতি লাভ করে। এত শক্তিশালী, সেই সঙ্গে এত হকবিচারী এঁরা ছিলেন। একবার তাঁর কোন এক অভিযানকালে তাঁর এক সেনাপতি নগরের এক ইহুদী পরিবারকে তাদের বাড়ী হতে বের করে দিয়ে নিজে সেই বাড়ী দখল করে বসেন। খবর পেয়ে জঙ্গী তাঁকে ডেকে এনে কেবল তাঁর দিকে তাঁর সেই অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিক্ষেপ করলেন; কোন কথা বলতে হল না; সেনাপতি কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে ইহুদীর বাড়ী তখনি ছেড়ে বাইরের ময়দানে বৃষ্টি কাদার মধ্যে তাঁবু খাটিয়ে রাত্রি কাটিয়ে দিলেন।

এর পর দেখতে গেলাম নুরুদ্দীন মাহ্মুদের মাজার। ইনি ছিলেন যশস্বী পিতা জঙ্গীর যশস্বী পুত্র। খৃষ্টান জগতের একচ্ছত্র ধর্মাধিনায়ক সন্ন্যাসী বারনার্ড আবার য়ুরোপের রাজ দরবারে দরবারে ঘুরে দ্বিতীয় ক্রুসেডের আয়োজন পূর্ণ করে তুল্লেন। ১১৪৭ সালে জার্মান

সম্রাট ৩য় কনরেড, ৭ম লুই ও তাঁর রাণী ইলিনর ৯ লক্ষ সৈন্যসহ ইদেছার দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু নুরুদ্দীনের হাতে পরাজয় বরণ করে এ'রা ফিরে গেলেন। ১১৭৪ সালে নুরুদ্দীন মহাপ্রয়াণ করেন। হক বিচারের জন্য বাপের মত তাঁরো খ্যাতি ছিল। তাঁর ব্যক্তিগত আয় হতে তিনি নিজ সংসারের সমস্ত খরচ চালাতেন, রাজকোষ হতে এ জন্য টাকাপয়সা নিতেন না।

জঙ্গী ও নুরুদ্দীন উভয়ের মাজার-স্থানেই খাবার পানি বিতরণের জন্য সুন্দর ব্যবস্থা আছে। ভাবলাম, ভালই হয়েছে, বেঁচে থাকতে এ'রা মজলুমের প্রাণে বিতরণ করেছেন শান্তি-বারি; মরেও এ'রা পিপাসার্তদের মধ্যে সেই মহান সেবাব্রতই পালন করে যাচ্ছেন।

এবার দেখতে গেলাম সুলতান ছালাহুদ্দীনের মাজার। উমাইয়া মছজিদের অদূরে একটি ছোট্ট দালান—তার সিঁড়ি ভাঙ্গা, সামনের চৌবাচ্চায় পানি নাই; ফুলের টবে গাছ মরে গেছে—সেই দালানের মধ্যে মর্মর-পাথরে বাঁধা সুন্দর কবর। অযত্নে রক্ষিত মাজারের অবস্থা দেখে খুশী হতে পারলাম না। এখানে আজ যিনি ঘুমিয়ে আছেন এককালে তাঁর প্রতাপের সামনে সমগ্র য়ুরোপ মেনেছে পরাভব, তাঁর মহত্বের সামনে তাঁর জানের দুশমন বিধর্মীরা সম্ভ্রমে মস্তক করেছে অবনত।

প্রদীপ্ত প্রতিভা, অক্লান্ত সাধনা ও অনন্যসাধারণ অধ্যবসায় বলে সামান্য অবস্থা হতে ছালাহুদ্দীন ফোরাত হতে নীলনদ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে হয়ে উঠেছিলেন সবচেয়ে পরাক্রান্ত শাসনকর্তা; তিনিই চেষ্টা করে মুছলিম-শাসক-সংঘ স্থাপন করেন, আর তাঁরই সভাপতিত্বে এ জাতীয় মহাসমিতির প্রথম অধিবেশন হয় ১১৮০ সালে—সানজা নদীর তীরে।

ছালাহুদ্দীনের আমলে পোপের প্ররোচনায় য়ুরোপে আবার ক্রুসেডের রণভেরী বেজে উঠল। আবার ধর্মোন্মত্ত খৃষ্টান যোদ্ধারা সাগর তরঙ্গের মত অবিরাম গর্জনে এসিয়ার উপকূলে ভেঙ্গে পড়ল; এবার

সে উন্মত্ত জলতরঙ্গের সামনে বুক পেতে দাঁড়ালেন মহাবাহু সুলতান ছালাহুদ্দীন। সে পাষাণ প্রাচীরে ব্যাহত হয়ে আক্রমণ-তরঙ্গ সহস্র চূর্ণিকায় ছড়িয়ে পড়ল। পোপের আহ্বানে সমস্ত খৃষ্টান জগৎ অস্ত্র ধারণ করেছিল। জার্মানীর সম্রাট, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও সিসিলীর রাজা, অষ্ট্রিয়ার লিউপোল্ড, বারগান্ডীর ডিউক, ফ্ল্যান্ডার্সের কাউণ্ট, সর্ব জাতির শত শত বিখ্যাত লর্ড ও নাইট যোদ্ধা, ফিলিস্তিনের রাজা, সামন্ত, দুরন্ত টেম্পল ও হস্পিটাল নাইটরা যোগ দিয়ে জেরুজালেম উদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন; জার্মান সম্রাটের মৃত্যু হল, রাজারা দেশে ফিরে গেলেন, তাঁদের অগণ্য বিখ্যাত যোদ্ধা 'পবিত্র ভূমিতেই' শায়িত রইল। কিন্তু জেরুজালেম ছালাহুদ্দীনের হাতেই রয়ে গেল (১১৯২ সাল)। এত বড় বীরপুরুষ, তবু তাঁর রসনা ছিল অসম্ভব সংযত; অতি রাগেও তিনি কাউকে গাল দিতেন না; কোরান শুনতে শুনতে তাঁর চোখ ফেটে অশ্রু ঝরত, তাঁর চির-শত্রু খৃষ্টান দলে পুত্রহারা মায়ের বিলাপ শুনে তিনি নিজে গিয়ে খুঁজে তাঁর পুত্র উদ্ধার করে দিয়েছেন; তাঁর জানের দুশমন রাজা রিচার্ড, তাঁরো জ্বরের কথা শুনে তিনি পর্বত হতে বরফ সংগ্রহ করে পাঠিয়েছেন। এই মহামনীষীর সমাধির পারে দাঁড়িয়ে আমি মুহূর্তের জন্য দেশ-কাল-পাত্র ভুলে গেলাম; মনে হল, আমি কোথায়? কোন বিশাল বারিধির বেলাভূমিতে, কোন গগনচুম্বী হিমাচলের পাদদেশে, না মহাকালের পরম তীরে!

মাজার হতে ফিরতে ফিরতে ভাবলাম—আজ কোথায় ছালাহুদ্দীনের উত্তরাধিকারীরা, আর কোথায় খৃষ্টান ক্রুসেডারদের উত্তরাধিকারীরা, আর কোথায়ই বা সে পবিত্র বয়তুল মোকাদ্দেচ্ছ? হে সমাধি-বাসী বীর, তোমায় ছালাম; কিন্তু তোমার প্রাণের সে অফুরন্ত আগুনের একটি ফুলকি কি আর এ দুনিয়ায় পাঠাবে না? করবে না এদেরে আবার ইছলামের সে মহামন্ত্রে সঞ্জীবিত?

মহীউদ্দীন-ইবনুল-আরাবী-র মাজার জিয়ারত করতে গেলাম।

দামেশ্কের এক প্রান্তে নিতান্ত সুন্দর একটি মছজিদের লক্ত একটি ততোধিক সুন্দর কামরায় তাঁর সমাধি অপার ইজ্জতের সঙ্গে রক্ষিত। বহু ধর্ম-পিপাসু মুছলমান এই সুবিখ্যাত ছুফির জীবনকালের সাধনা-ভূমির সান্নিধ্য-পরশে আত্মিক শক্তি ও প্রেরণা লাভের ভরসায় এখানে এসে থাকেন।

নেপোলিয়ন বলতেন—এ দুনিয়ায় দুটি শক্তিই সবচেয়ে বড়—তলোয়ারের শক্তি আর আত্মার শক্তি; কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মার শক্তির কাছে তলোয়ারের শক্তিকে পরাভব মানতে হয়। মহীউদ্দীন-ইবনুল-আরাবী-র সমাধিপারে এসে তাই মনে হল। ভাবলাম, তলোয়ারের শক্তি সসীম পানির উৎস ধারার মত—উদ্বেলিত হয়ে ওঠে; কিন্তু কিছুদিন পর মন্দীভূত হতে হতে অবশেষে শুকিয়ে যায়; আর আত্মার শক্তি পর্বত-নির্গত ঝর্ণাধারার মত—কম বেশী হতে পারে, কিন্তু শুকিয়ে যায়না—বইতে থাকে।

দামেশ্কের দুইটি বাজার সব চেয়ে বিখ্যাত—একটি হামিদীয়া—সুলতান আবদুল হামিদের তৈরী, আর একটি মেদহাতীয়া—উজীর মেদহাত পাশার তৈরী। দেখলাম, অদ্ভুত সুন্দর—উপরে বাঁকানো টিনের ছাউনী—বহু উঁচু—চাইলে মাথার পাগড়ী পড়ে যেতে চায়। জিনিস-পাতির পরিমাণ ও বৈচিত্র বিপুল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছেই দামেশ্ক-বিজয়ী সুলতান ছলীমের মছজিদ—আকারে মাঝারি, গাথনী মজবুত, দেখতে সুন্দর। মছজিদের লক্ত একটি গোরস্তান ও একটি মুছাফির খানা। মুছাফির খানায় এখন আছে আলবেনীয়া, জুগোস্লাবিয়া ও ফিলিস্তিন হতে আগত মুহাজিরের দল। নব্যতুর্কদের অভ্যুদয়ের ফলে সুলতান আবদুল হামিদ ইস্তাম্বুল হতে সপরিবারে পালিয়ে যান। তাঁর একটি ছেলে, একটি মেয়ে ও একটি নাতি এই গোরস্তানে ঘুমিয়ে আছেন।

সুলতান ছলীমের মছজিদের অদূরেই দামেশ্কের যাদুঘর। বাইরে

পাথরের কয়েকটি সিংহমূর্তি; ভিতরে সে-কালের বহু দর্শনীয় জিনিস আছে।

কিন্তু ইবনে-খালদুন ভাই, কেবল অতীতের কথা শুনে শুনে বোধ হয় তুমি ফাঁপরে পড়ে গেছ; হয়তো বা বোনের সাথে বসে ষড়যন্ত্র ফাঁদছ যে এবার ফিরে গেলে আমার শুঁটকি মাছের ভর্তায় কিছুতেই রশুন দিতে দিবে না; বুঝিয়ে দিবে যে নতুনের ফোঁড়ন ছাড়া কেবল পুরান ঘটনার শুঁটকি খবর দিলে তা মানুষের কাছে কেমন বিস্বাদ লাগে।

আচ্ছা, ভাই, এখন সিরীয়া সম্বন্ধে কয়েকটি নতুন খবর বলে আজকের মত খতম করি।

সিরীয়ার আয়তন ৫৮ হাজার বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ৪০ লাখ। আমাদের এক ময়মনসিংহ জিলার লোক সংখ্যাই এর দেড় গুণের বেশী। বাসিন্দাদের মধ্যে ৪ লাখ খৃষ্টান, বাকি সবাই মুছলমান। সিরীয়ায় দৈনিক কাগজ আছে তিন খানা—আল-আলম, আল-আহরার ও আল-আখবার। রাস্তাঘাট মোটের উপর ভাল। দামেস্কে একটি রেডিও ষ্টেশনে আছে। দেশে রাজনৈতিক দল কমছে-কম দশটি ঃ সমাজতন্ত্রী দল, নিয়মতন্ত্রী দল, গণ-দল, ইছলামিক সমাজতন্ত্রী দল, জাতীয় দল ইত্যাদি। সিরীয়া কৃষিপ্রধান দেশ; তবে দেশের কৃষিযোগ্য ভূমির মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ এ পর্যন্ত আবাদে এসেছে। সুতরাং সিরীয়ার কৃষি ও শিল্পের ভবিষ্যৎ ভাল; তবে এর জন্য চাই দীর্ঘকাল স্থায়ী শান্তি। সে শান্তি দেশে এখনো আসে নাই।

তেহরাণ
৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৫

ভাই কাজী,

বাড়ী হতে রওনার সময় তুমি বলেছিলে, আর কোন দেশের কথা তোমাকে লিখি আর না লিখি, ইরানের কথাটা যেন তোমাকে জানাই। তাই ইরানের মাটিতে পা দিয়ে তোমার কথাটাই আগে মনে পড়ল।

তুমি ভালবাস ইরানের গুল, ভালবাস তার গজল, আর ভালবাস তার ছুফীদের দরাজদিল। তোমার মত আমিও ও-সব ভালবাসতাম। কারণ ছোট বেলায় যে পারিবারিক আবাহাওয়ায় বড় হয়েছিলাম, তাতে বছরাই গোলাবের গন্ধ ছিল যতখানি, ইরানী গুলের সুবাস ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী। আমাদের দিলের দরবারে ফরীদ-উদ্দীন-আত্তার অনেকদিন বিরাজ করার পর সেখানে এসে হাজির হন রাবেয়া-আল-বছরী। আমাদের কল্পনার রাজ্যে জমশেদ কায়কাউছ, ছোহরাব রোস্তম বহুকাল বাদশাহী করার পর তার দুয়ারে এসে হানা দেন হামজা ও হানীফা, খালেদ ও হারুণ-আর-রশীদ।

বছরের পর বছর নিছক গদ্যময় কাজে বন্ধ থাকার ফলে ইরানের কল্পকাহিনীগুলি আজ আমার বিস্মৃতির দরিয়ায় অসহায়ের মত হাবুডুবু খাচ্ছে। তুমি ভাগ্যবান, বরাবর কাব্যিক পরিবেশেই দিনগুলি কাটিয়ে গেলে। সকালে ওঠ, কেরায়াত পড়, নাশ্তা খাও, চোখে ছুরমা লাগাও, দাড়িতে আতর মাখ, তারপর অফিসে এসে বস। তোমার ডান পাশে থাকে চায়ের পেয়ালা—তার বুকের উপর হাওয়ার সাথে খেলা জুড়ে দেয় বাষ্পের মউজ, তোমার বাম পাশে থাকে ফরসী হুক্কা—তার শিরে বসে চিলিম ওপাশের পেয়ালার সাথে পাল্লা দিয়ে উদ্‌গীরণ করতে থাকে সুগন্ধি ধূম, তোমার সামনে থাকে কাশীর-জরদা-ওয়ালা পানের ডিবা, সর্বোপরি তোমার টেবিলের কমছেকম অর্ধেকখানি জুড়ে থাকে

ছাদীর গুলিস্তাঁ বুস্তাঁ, হাফিজের দিওয়ান, মওলানা রুমের মছনভী, ওমর খাইয়ামের রুবাইয়াত; এমন কি ডাক্তার ইছহাকের ছোখন-ওয়ারান-এ-ইরান খানিও সে দরবারের ছোহবত হতে মহরুম নয়। কিন্তু কেবল কি তা? তোমার কাছে কাজ নিয়ে যারা আসে—তারা সবাই বিয়ের বরযাত্রী— তাদের পোশাকে কাব্য, চোখে কাব্য, দিলে কাব্য। তুমি বসে বসে তাদেরে দেখ, কান পেতে তাদের আসন্ন মিলনের কথা শোন, তারপর ঝনঝন কতকগুলি তাজা টাকা নিয়ে তাদের বিয়ে রেজেষ্ট্রি কর। কাজেই তোমার কাব্যময় জীবনটিকে তুমি অটুট রাখতে পেরেছ। তোমাকে আমি হিংসা করি।

কিন্তু এই যাঃ! ইরানের গুলের কথা বলতে বলতে আসল ইরানের কথাই ভুলে গেছি।

২৮শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ছয়টায় আমরা দামেশ্ক ছেড়ে মোটরযোগে বৈরুত রওনা হলাম। ৬০ মাইল পথ—আড়াই ঘন্টায় পাড়ি দিলাম। পথে বৈরুত হতে আগত অসংখ্য মোটরের সাথে দেখা হল ঃ এঁরা একদিনের ছুটি পেয়ে বৈরুতে হাওয়া খেতে গিয়েছিলেন।

সমুদ্রের উপর একটি হোটেল—সেইখানে আমরা রাত কাটিয়ে দিলাম। পাহাড়ের গায় ঝিলিমিলি বিজলীর ফুল, আকাশের নীলিমায় শুভ্র তারার বাতি, সাগরের বুকে অবিরাম সঙ্গীত, সমস্ত মিলে বৈরুতের বাতাসকে উতলা করে তুলেছিল। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বাইরে চেয়ে রইলাম ঃ অর্ধেক রাত সেখানেই কেটে গেল। বিছানায় যেতে যেতে ভাবলাম প্রকৃতির এই যে অতুল ঐশ্বর্য—এতে তো দুনিয়ার ধনী গরীব সবাই সমান শরীক; তবে সিন্দুকে কয়েকটি টাকা হিসাবে বেশী পেয়েই কারো কারো মাথা বিগড়ায় কেন? এ বিপুল সম্পদের তুলনায় সে কয়েকটি রুপার চাকতির স্থান কোথায়?

২৯শে সেপ্টেম্বর হাওয়াই জাহাজে বৈরুত হতে বেলা আটটায় তেহরাণ যাত্রা করলাম। তেহরাণে পোঁছলাম বেলা সাড়ে এগারোটায়।

হাওয়াই বন্দরে ছিলেন পাকিস্তানী দূত রাজা গজনফর আলী খাঁ আর তাঁর দফতরের অন্যান্যরা। আমাদের সমস্ত ছফরের মধ্যে একমাত্র এই ব্যক্তিকে পেলাম যিনি আমাদের জন্য কোন হোটেলে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন নাই। অন্যান্য স্থানের দূতাবাসের বন্ধুরা তাঁদের এলাকার শ্রেষ্ঠতম হোটেলে আমাদের জন্য ব্যবস্থা করে পাকিস্তানের মর্যাদা রক্ষার চেষ্টা করেছেন। রাজা গজনফর আলী খাঁ তাঁর নিজ বাড়িতে আমাদেরে নিয়ে গিয়ে সোজা বল্লেন—'এ আপনাদের নিজের বাড়ী মনে করে খাবেন, দাবেন, চাবেন, কোন তাকাল্লোফ করবেন না।'

রাজার বাড়ীতে আমরা ঠিক নিজের বাড়ীর মতই রইলাম, খাওয়ায় দাওয়ায়, চলনে ফিরনে বড় আরাম বোধ করলাম।

ঐ দিনই বিকালে দূতাবাসে একটা পুরস্কার বিতরণী মজলিস আর পাকিস্তানী ফিল্‌ম শো ছিল। বাছা বাছা প্রায় সোয়া শ খানিক ভদ্র মহল ও মহিলা এলেন ঃ এঁরা সবাই পাশ্চাত্য পোশাকে সজ্জিত ও সজ্জিতা—সুন্দর চেহারা, সুন্দর স্বাস্থ্য, সুন্দর পোশাক, সুন্দর ব্যবহার; সর্বদিক দিয়েই তাঁরা মজলিসটাকে সার্থক করে তুল্লেন। আগে পিংপং আর দাবা খেলা হয়েছিল, ওদিন তারই পুরস্কার বিতরণ। একটি মহিলা বেতের মাথাইল পরে এসেছিলেন; তিনিই পুরস্কার দিলেন। রাজা নিজে পিংপং খেলার জন্য একটা পুরস্কার পেলেন। সাড়ে চার হাত লম্বা জোয়ান, মাথার পাগড়ীর যুদ্ধং-দেহী-ফণা সহ পুরা ছয় হাত, পাশেও পরিমাণ মোতাবেক মানান সই, সেই ব্যক্তি যখন পিংপং-এর পুরস্কার একটি লাটিম নিতে এগিয়ে এলেন, মনে হল, হাতী এক পয়সার চানাচুর কিনে খেতে যাচ্ছে। সবার মধ্যে হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল। বিদেশী মুছাফিরদের জন্য কোন স্পেশাল প্রাইজ আছে কি না, আমি জিজ্ঞাসা করলাম। তাঁদের দয়া হল; দিবার জন্য খুঁজলেনও অনেক, কিন্তু কোন ফাও পাওয়া গেল না। তারপর ফিল্‌ম শুরু হল ঃ পূর্ব-পশ্চিম উভয় পাকিস্তানের অবস্থা—তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও

সম্পদ, তার কৃষিশিল্প, তার বাণিজ্য ব্যবসা, তার লোকজন, তার শিক্ষা সংস্কৃতি। সকলেই মন দিয়ে আনন্দের সঙ্গে দেখল।

রাজা মানুষের সাথে মিশতে জানেন, মানুষের চিত্ত জয় করার হেকমত তাঁর ব্যবহারে আর্ট হয়ে ফুটে ওঠে।

রাত্রির খানার জন্য রাজা আমাদেরকে দারবন্দ হোটেলে নিয়ে গেলেন; বল্লেন—হোটেলও তেহরাণী জীবনের একটা দিক। পাকিস্তান দূতাবাস হতে ৭ মাইল দূরে ছামীরা পাহাড়, সেই পাহাড়ের উপর এই হোটেল। তেহরাণের বড় মানুষদের অনেকে ছামীরাতে গরমের মৌছুমটা কাটিয়ে দেন। তেহরাণে এই-ই সর্বশ্রেষ্ঠ হোটেল। ফুলে, ফোয়ারায়, আছবাবপত্রে হোটেলটি সত্যি পরম সুন্দর। খানা সম্বন্ধে বলবার বিশেষ কিছু নাই। বৈরুত, আলেপ্পো, আঙ্কারা, ইস্তাম্বুল, কায়রো, দামেশ্ক, তেহরাণ—সব খানেই খানা মোটামুটি একই ধরনের—বিলাতী কেতা মোতাবেক তৈরী; এখানে ওখানে সেখানে দুই একটি নতুন পদ আছে, এই মাত্র। হোটেলে যাওয়ার রাস্তাটি অত্যন্ত সুন্দর—দুই পাশে সারিবন্ধ ছবির মত গাছ; গাছের গোড়ার পাশ দিয়ে সরু নর্দমা—সকালে বিকালে তর তর পানি বয়ে যায়; গাছকে সতেজ সবুজ রাখে। রাস্তার কথা প্রশংসা করতেই রাজা বল্লেন—ভাল হবে না? এসব যে রেজা শা পাহলভীর নিজ হেফাজতে তৈরী। শোনা যায়, একবার রেজা শা মোটরে যাচ্ছেন একটা নতুন পথ দিয়ে; এক জায়গায় দেখেন, রাস্তা একদম নষ্ট হয়ে গেছে। বল্লেন—বোলাও ইঞ্জিনিয়ারকো। ইঞ্জিনীয়ার এল। শা জিজ্ঞাসা করলেন—সেদিনের রাস্তা আজই এমন খারাপ হয় কেন? লোকটার কোন কৈফিয়ৎ ছিল না; সে নীরবে কাঁপতে লাগল। শা বল্লেন—কাঁপুনি যথেষ্ট নয়। ওকে ঐ ভাঙ্গা রাস্তার উপর শুইয়ে দাও, তারপর একজন ওর উপর দিয়ে মোটর হাঁকিয়ে যাও। এর পর সাত দিন মধ্যে চার দিক হতে খবর আসতে লাগল ঃ অমুক অমুক ইঞ্জিনীয়ার নিজ ব্যয়ে নতুন সিমেন্ট এনে নতুন রাস্তা ভেঙ্গে আবার তৈরী শুরু করেছে।

আমি বল্লাম, কোন অঞ্চল হতে এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ হয় নাই? রাজা বল্লেন, না, বরং তিনি চারদিক থেকে মোবারকবাদ পেয়েছেন। আর একজন বল্লেন, রেজা শা মিথ্যা, জুচ্চুরী, ঘুষ—এসব কিছুতেই বরদাশ্ত করতে পারতেন না। একবার অমন এক অপরাধী ধরা পড়ে গেল। শা বল্লেন—আমি তোমাকে গুলি করে মারব না, ফাঁসীতে পাঠাব না, ডাল কুত্তা দিয়েও খাওয়াব না; যাও, ঐ তেতলা দালানের ছাদ হতে লাফিয়ে পড়ে মর। সম্মোহিতের মত লোকটা গিয়ে দালানের ছাদে উঠে লাফিয়ে নীচে পড়ল—হাজার হাজার লোক নিজ চোখে দেখল ঘুষখোরের শাস্তি। এরপর শাহের আমলে ঘুষ জুচ্চুরীর খবর আর বেশী পাওয়া যায় নাই।

ফেরদৌছী তাঁর শাহ্‌নামায় যে আমলের ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তার প্রথম দিকে এ দারবন্দ পর্বতে থাকত অসংখ্য দেওদৈত্য, জীনপরী। তাদের স্থানে এখন মানুষ জীনপরীরা বসবাস শুরু করেছে। তবে পর্বতের শিখর দেশে তাদের বাদশাহী এখনো কায়েম আছে মনে হল। কারণ এর দিন দুই পর শহরে বেড়িয়ে দূতাবাসে ফিরে চলেছি, এমন সময় আমাদের ইরানী সাথী আমাদেরে ইশারা করে দেখিয়ে বল্লেন—ঐ দেখুন, দারবন্দের শিখরে হানাহানি শুরু হয়েছে। চেয়ে দেখলাম—তাই তো, দেওদৈত্যরা সেই সাবেক জামানার মতই আজো মেঘের রথে ছওয়ার হয়ে বজ্র হানাহানি করছে, আর তার সংঘর্ষে ঘন ঘন জ্বলে উঠছে বিজলীর ফুলকী।

রাত প্রায় দশটায় রাজা সাহেবের বাসায় ফিরলাম। বাসার ভিতরে গাড়ীর আওয়াজ শুনেই কল-কোলাহলে বাড়ী মুখরিত করে তিনটি ছোট মেয়ে এসে গাড়ীর কাছে দাঁড়াল, আর হারানো ছেলে বহুকাল পর ঘরে ফিরে এলে মায়ের যে আনন্দ, সেই আনন্দে তারা রাজা সাহেবকে ধরে উপরে নিয়ে গেল। অনেক বছর আগে এক পুরানা জমিদার বাড়ী গিয়েছিলাম। জমিদার সাহেবের সাথে একটা বড় দালানে গিয়ে কেবল পা

দিয়েছি এমন সময় মাথার উপর একসঙ্গে অনেকগুলি পাখী অকস্মাৎ কলস্বরে ডেকে উঠল; আমি অবাক হয়ে উপরের দিকে চাইলাম। জমিদার সাহেব বল্লেন—ওরা আমাকে দেখলেই অমন করে। আজ সেই কথা মনে পড়ল। কিন্তু রাজা সাহেবের বাড়ীর এ মানুষ-পাখী তিনটি কে?

এদের একটু ছোট্ট ইতিহাস আছে। রাজার নিজস্ব ছেলে মেয়ে নাই ঃ এঁরা 'বুড়া বুড়ী দুজনাতে মনের সুখে থাকত'। এমন সময় আসে পাকিস্তান—শুরু হয় পাঞ্জাবময় অমানুষিক সাম্প্রদায়িক হানাহানি। কত বাপ মরে, কত মা মরে, কত অনাথ শিশু অসহায় হয়ে পথে পথে ঘুরতে থাকে। এমনি তিনটি এতীম বালিকা রাজার চোখের সামনে পড়ে। রাজা তাদেরে কুড়িয়ে বাড়ী নিয়ে আসেন; রাণী তাদেরে সাদরে গ্রহণ করেন ও পেটের বাচ্চার মত আদরে লালন করতে থাকেন। ইতিমধ্যে রাণীর সমন আসে, তিনি চলে যান। রাজা এখন একাই এদেরে পাখের তলে রেখে পুষছেন।

তেহরাণের সব চেয়ে ভাল যে বালিকা-বিদ্যালয়, রাজা সেইখানে এদেরে ভর্তি করে দিয়েছেন। বাড়ীতে পড়ানোর জন্য একটি ভাল শিক্ষয়িত্রী ও একজন ভাল আলেম মোতায়েন করেছেন। এর উপর, রাজা এদের প্রত্যেকের নামে ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছেন ১০ হাজার টাকা, আর প্রত্যেকের নামে রেজেষ্ট্রি করে লিখে দিয়েছেন ১৫ হাজার টাকা দামের ভূ-সম্পত্তি।

লোকটা মাথার চুলের আগা হতে পায়ের তলের চামড়া পর্যন্ত ষোল আনা রাজা।

রাত ১১টায় শুতে গেলাম; কিন্তু ঘুম সহজে কাছে ভীড়ল না। পারস্য আজ আজাদ, তবু কবি হেমচন্দ্রের কথা বার বার মনে পড়ল—

আরবের পারস্যের কি দশা এখন!
সে তেজ নাহিক আর নাহি সে তর্জন।

সৌভাগ্য কিরণ বলে
উহারাই কোন কালে
করেছিল মহাতেজে পৃথিবী শাসন,
আরবের পারস্যের কি দশা এখন!

সত্যিইতো একদিন ইরানের দোর্দন্ড প্রতাপে সেকালের দুনিয়ার আকাশ বাতাস কেঁপে উঠত। ইরানের আগে অত বড় সাম্রাজ্য পৃথিবীর আর কোনও জাতি স্থাপন করতে পারে নাই। সেদিন ইরানীরা সগর্বে দাবী করত—‘একদিকে সেই আগুনের দেশ যার প্রচন্ড সূর্যের তাপে পুড়ে পুড়ে মানুষের গায়ের রং হয়ে পড়েছে আলকাতরার মত কালো, আর তার মাথার চুল গেছে ভাজা দূর্বা পাতার মত কুঁকড়িয়ে, অন্যদিকে সেই জমাট শীতের দেশ যার তুষার জাল ভেদ করে উপরে উঠতে সূর্যকে গলদঘর্ম হয়ে সাত সাতবার পানি খেতে হয়, এই দুই দেশের মাঝ খানের বিপুল ভূখন্ড জুড়ে আছে আমাদের মহান সাম্রাজ্য।’ পাঁচ হাজার বছরের পুরানা এদের ইতিহাস ঃ সে ইতিহাসের অধ্যায়ে অধ্যায়ে কত জাতি তাদের জীবন, তাদের সভ্যতা, তাদের সংস্কৃতির ছাপ রেখে গেছে, তার অন্ত নাই। এসেছে সেখানে মাসিডোনিয়াপতি আলেকজান্দার, শাসন করেছে তথায় উমাইয়া আব্বাছীয়া খলীফারা; এসেছে তুর্ক, এসেছে মোগল, হামলা করেছে তৈমুরের বিজয় বাহিনী। আজ ইরানের তখ্‌ত আবার খাছ ইরানীর হাতেই এসেছে। কে জানে, এদের শাসন শৌর্যে ইরানের প্রাচীন মহিমা-বহ্নি আবার জ্বলে উঠবে কিনা।

৩০শে সেপ্টেম্বর রাজা সহ আমরা ইরানী পার্লামেণ্ট অর্থাৎ মজলিস দেখতে গেলাম। পথে পথে দেখলাম বিপুল জনতা। শুনলাম, আজ তেহরাণে ধর্মঘট। কেন? উত্তরে জানলাম ঃ তেল নিয়ে ইংরেজদের সাথে ইরানী সরকারের যে বিতর্ক চলছে, এ তারই ফল।

বৃটিশ পক্ষ বলছে, ইরানের সব লোক ডাঃ মোচ্ছাদেকের তেল জাতীয়করণের নীতি সমর্থন করে না,—আর মজলিসে তাঁর একটা প্রবল

বিরোধী দল আছেই। আজ তেহরাণের ধর্মঘটীরা বলছে—আমরা প্রত্যেকে আমাদের উজীরে আজমের পক্ষে; আর বিরোধীদলও আজ মজলিসে গিয়ে স্পষ্ট বলে দিবেন যে, তেলের ব্যাপারে তাঁরা সকলেই উজীরে আজমকে সমর্থন করে থাকেন।

বিরোধী দল গত কয়েক অধিবেশনে মজলিসে আসেন নাই। সেদিন আমরা গিয়ে দেখলাম, মজলিসে বিরোধীদলের প্রত্যেকে হাজির হয়েছেন এবং সবাই দাঁড়িয়ে বল্লেন—তেল ব্যাপারে আমরা প্রত্যেকে ডাঃ মোচ্ছাদেককে সমর্থন করি।

মজলিসের সভাপতির তরফ হইতে আমাদেরকে চা খাইয়ে বিদায় করা হল। মজলিসের ফটক পার হয়ে দেখি, পথে ধর্মঘটীদের সংখ্যা আরো বেড়েছে, আর মজলিসের চার পাশে সশস্ত্র বাহিনী। আমরা নামতেই একজন সেনাপতি এসে বল্লেন—একটু দাঁড়ান, দুই লাখের মত লোক পথে বেরিয়ে পড়েছে, একটা ব্যবস্থা না করে আপনাদেরে এই জনতার দরিয়ায় ছেড়ে দিতে পারি না। তিনি ধর্মঘটীদের দুইজন নেতাকে ডাকিয়ে বল্লেন। তাঁরা অভয় দিয়ে কইলেন—আমরা পাহারা দিয়ে নিরাপদে এঁদেরে পৌঁছিয়ে দিব। তাই হল। একটি পুলিশ বা সিপাই আমাদের সাথে এল না; ধর্মঘটের এই নেতা দুইজন জনতা বিলি দিয়ে আমাদের গাড়ীর পথ করে দিতে লাগলেন। অসম্ভব নিয়মানুবর্তিতা এই ধর্মঘটীদের। তারা ঝুকে পড়ে গাড়ীর জানালা দিয়ে যখন রাজার চেহারা দেখতে পেল, তখন জয়ধ্বনি করে উঠল, ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’। শুনলাম, ইরানের বেশীর ভাগ লোকেই রাজা গজনফর আলী খাঁকে চিনে—কেউ নিজ চোখে দেখে, কেউ খবরের কাগজে ছবিতে দেখে। চেহারা চিনাটা এমন কোন বিস্ময়ের কথা নয়; কিন্তু তিনি ইরানী জনগণের চিত্তে যে প্রীতির আসন গেড়ে বসেছেন, তা বিস্ময়ের কথা তো বটেই, হিংসারও কথা। অন্ততঃ এক মাইল পথ পর্যন্ত ইরানীরা এমনি ভাবে আমাদের গাড়ী ঘিরে ঘন ঘন মোবারকবাদ জানাতে

লাগল—জিন্দাবাদ—জিন্দাবাদ—পাকিস্তান জিন্দাবাদ ঃ পাকিস্তানীরা আমাদের ভাই, আমরা পাকিস্তানীদের ভাই।

আবার সেই 'ভাই'। যে কথা আমি সইতে পারি না—যে কথা শুনলে আমি চোখ তুলে চাইতে পারি না—সেই 'ভাই'! পথে ঘাটে, হেথায় হোথায়, দেশে বিদেশে 'ভাই'—'আমাদের ভাই'!

আমি অসহায়ের মত পকেটে হাত দিয়ে শুধু রুমাল খুঁজতে শুরু করলাম, ওদের কথার কোন জব দিতে পারলাম না।

দুতাবাসে ফিরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলাম। তারপর বের হলাম উজীরে আজম ডাক্তার মোচ্ছাদেকের সঙ্গে দেখা করতে। আবার সেই সুন্দর মজবুত চওড়া পথ—আবার সেই চমৎকার গাছের সারি। উজীরে আজমের বাড়ীর সামনে গাড়ী হতে নামলাম। বাইরের ফটকে পাহারা—রাজমারার হত্যার ফলে নাকি এই পাহারার ব্যবস্থা—মাঝারি রকমের একটা সাধারণ বাড়ী—সরকারী আবাস নয়, ডাক্তার মোচ্ছাদেকের নিজের ঘর—তাঁর অসুখ—বিছানায় শুয়েছিলেন—আমাদেরে দেখে উঠে বসলেন—ছোট কামরা—কাঠের কুশনহীন চেয়ার—লোহার সাধারণ খাট—যে খাট আমরা হাসপাতালে সচরাচর দেখি—তকেয়া নয়, বালিশ; মামুলি পোশাক; একমাত্র বৈশিষ্ট—মেজের উপর কার্পেট। কিন্তু আসল বৈশিষ্ট হল ডাক্তার মোচ্ছাদেক নিজে—৭২ বছর বয়স, অথচ উৎসাহ উদ্যমের অন্ত নাই, ফরসা চেহারা, বাঁকা উঁচু নাক, মস্ত কপাল, অন্তরের পবিত্রতার একটা স্নিগ্ধ উজ্জ্বলতা সমস্ত মুখমণ্ডলের উপর শুভ্র জোছনার মত ছেয়ে আছে।

নানা কথাবর্তায় আধঘন্টা কেটে গেল। নিতান্ত আপন জনের মত কথা। আমাদের কাশ্মীর সমস্যার প্রতি সহানুভূতি—সঙ্গে সঙ্গে এক এক পেয়ালা সুস্বাদু চা। চা খেতে খেতে ভাবলাম, এমন নিরহঙ্কার নিরলস, নিস্বার্থ নেতা পেয়ে ইরানীরা তাঁর নির্দেশে মরণ কবুল না করবে কেন?

জাকজমকের ধমকে জনগণের চিত্তে বিভ্রম সৃষ্টি করে যে-সব সরকারী কর্মচারী প্রতিষ্ঠা অর্জনের নেশায় ঘুরে বেড়ান, তাঁদের একবার এসে এই অনাড়ম্বর সর্বজনমান্য নেতা ডাক্তার মোচ্ছাদেকের সঙ্গে দেখা করে যাওয়া উচিত।

ডাক্তার মোচ্ছাদেকের রাজনৈতিক জীবন বিচিত্র। মোচ্ছাদেক দেশের শিক্ষা সমাপ্ত করে উচ্চতর শিক্ষার জন্য য়ুরোপে যান। সেখান হতে ডক্টরেট অর্জন করে দেশে ফিরেন। ফরাসী ভাষায় তিনি অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারেন।

মোচ্ছাদেক ইরানের প্রাচীন রাজবংশ বিশেষের অধস্তন পুরুষ। তিনি এক বিরাট জমিদারী ওয়ারিসী সূত্রে পান; বর্তমানে এর বেশীর ভাগই বিক্রি করে ফেলেছেন। উজীরে আজম হিসাবে তিনি যে বেতন পান, তা এক যক্ষ্মা-নিবারণী সমিতির তহবিলে দান করে দেন।

মোচ্ছাদেক তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম দিকে ইরানের এক প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। সর্বপ্রকার লোভ, তোষামোদ ও ভয়ের অতীত সুদক্ষ সুবাদার বলে তাঁর যশ অল্পকাল মধ্যেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

তারপর শুরু হয় তাঁর জীবনে দুঃখ বরণের পালা। ইরানের বৈদেশিক নীতির বিরুদ্ধে প্রচারণার জন্য তাঁকে শ্রীঘরে যেতে হয়। তিনি রেজা শার কোন কোন কাজের বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে বাধ্য হন। এর ফলে দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাঁকে নির্জন কারাযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। এই সময় তাঁর স্বাস্থ্য একদম ভেঙে যায়; তিনি ঘন ঘন মূর্ছা যেতে শুরু করেন; কেউ কেউ বলেন তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ পর্যন্ত দেখা দেয়। কারাগার হতে বের হয়ে তিনি অনেক দিন চিকিৎসাধীন থাকেন। তারপর ফের তিনি রাজনৈতিক জীবনে ফিরে আসেন।

তিনি যখন উজীরে আজমের গদীতে বসেন, তখন কেউ কেউ মনে করেছিল, ‘এই দুর্বল, বৃদ্ধ, পাগলা পত্তনের মানুষ দিয়ে দেশের কি

ফায়দা হবে?' তাদের এ সন্দেহ অমূলক প্রতিপন্ন হয়েছে। পাশ্চাত্য জগতের নিতান্ত ধুরন্ধর রাজনীতিজ্ঞরাও মোচ্ছাদেকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন—'হাঁ, একজন অসাধারণ মেধা-সম্পন্ন লৌহসংকল্প বৃদ্ধ বটেন!'

মোচ্ছাদেকের ছেলে ডাক্তার গোলাম হোছেন হামেশা পিতার পাশে থেকে তাঁর স্বাস্থ্যের হেফাজত করেন। তাঁর মেয়ে করেন পিতার নার্সের কাজ। আর কর্মক্লান্ত বৃদ্ধের জীবনকে উত্যক্ত আনন্দে ভরে তোলে গোলাম হোছেনের দু-বছর বয়সের কন্যা মাছুমা। মাছুমা বিবি দাদুর সাথে খানাপিনা করেন; তাঁর সভা সমিতিতে কাছে থাকেন; দাদু হঠাৎ মূর্ছা গেলে তাঁর মুখে চোখে পানি দেন। মোচ্ছাদেকের যখন তখন মূর্ছা যাওয়া এখনো বন্ধ হয় নাই। কেবিনেটের কোন প্রস্তাবে যখন তাঁর নারাজ হওয়ার ইচ্ছা, তখন তিনি স্নিগ্ধ হেসে বলেন—'বেশ, এ প্রস্তাবে আমি রাজী হতে পারি যদি মাছুমা বেগম অনুমতি দেন।' মাছুমা বেগমের দিকে মুখ তুলে চাইলে তিনি দাদুর মাথার চুল নিয়ে খেলা শুরু করে দেন।

মোচ্ছাদেক ভোর পাঁচটায় ঘুম হতে ওঠেন, ছয়টায় চা খান, তারপর তার ও অন্যান্য রিপোর্ট পাঠ করতে শুরু করেন। বেলা ৮টায় উজীর নাজীর পাত্র মিত্ররা এসে তাঁর বিছানার পাশের কাঠের চেয়ারে বসেন। দিনের কাজ শুরু হয়। দুপুরে খাওয়ার পর তিনি খানিকটা ঘুমিয়ে নেন; তারপর উঠে রাত এগারোটা পর্যন্ত কাজ করেন।

ডাক্তার মোচ্ছাদেকের পোষাকের মধ্যে নাকি মাত্র দুটি সুট আর ছয়টি শার্ট। ওভারকোট তিনি পছন্দ করেন না। তবে তেহরাণে যখন ভীষণ শীত পড়ে, সেই সময়ের জন্য তাঁর দুটি ওভারকোট—একটি তিনি পরেন, একটি তাঁর শফার পরে। মাঝে কোট অদল বদল হয়ে থাকে।

উজীরে আজমের বাড়ী হতে বের হয়ে গেলাম ইরানের বৈদেশিক মন্ত্রীর বাড়ী। ইনি নাকি নিতান্ত ধড়িবাজ মানুষ। কথাবার্তায় দেখলাম

খুব তুখার। আফগান উপদ্রবের কথা উঠল। আমরা আমাদের আফগান নীতির কথা বল্লাম। তিনি বল্লেন—আমি অনেকদিন আফগানিস্তানে ছিলাম। আফগানীদের নাড়ীনক্ষত্রের খবর আমি যা জানি তাতে মনে হয় না, আফগান উপদ্রব আর বেশী দিন থাকবে। পাকিস্তানের প্রতি তাঁর গভীর দরদ, একথা জানালেন।

ইরানী পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট আমাদেরকে চা খেতে দাওয়াত করলেন। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত ছিলেন। দিলখোলাসা আলাপ আলোচনা হল। সৌজন্যে এঁদেরে পেছন ফেলে যাওয়া কঠিন।

ইরানে এখনো ধর্মাধ্যক্ষদের প্রভাব অসাধারণ। শিয়ারা বিশ্বাস করে—ধর্ম ব্যাপারে সব চেয়ে বড় গুরু হলেন ইমাম। কিন্তু ইমামের আবির্ভাব যখন তখন হয় না। ইমামের নীচেই মুজতাহিদদের স্থান। মুজতাহিদদের মধ্যে ছোট বড় আছেন। বড় মুজতাহিদদেরকে বলা হয় আয়াতুল্লা—অর্থাৎ কি না আল্লার চিহ্ন। ইরানের বর্তমান সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগুরুর নাম আয়াতুল্লা বরুজরদী। ইনি ইরানের অন্তর্গত কুম শহরে থাকেন। কুম শহরে অনেক হাজার ছাত্রের একটি মাদ্রাছা আছে; তিনি সে মাদ্রাছারও অধ্যক্ষ। তাঁর পরই আয়াতুল্লা কাশ্‌শানীর স্থান—ইনি ইদানিং তেহরাণে আছেন; তবে এঁর জীবনের অনেক বছর কেটেছে জেলে জেলে—রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব করার অপরাধে। কাশ্‌শানীর এই যে অসাধারণ প্রভাব, এর পেছনে আছে দরদময় সেবা ও দুঃখ বরণের দীর্ঘ ইতিহাস। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইনি ইরাকে ছিলেন ঃ আরবেরা তখন ইংরেজদের সাথে যোগ দিয়ে তুর্কদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইনি সে বিদ্রোহের তীব্র বিরোধিতা করেন। ফলে তাঁকে অনেক কাল কারাগারে পঁচতে হয়। তিনি জনগণের পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে জীবনে অনেকবার কারাবরণ করেছেন। ইরানের তেলের কারখানাকে জাতীয়করণের যে তুমুল আন্দোলন চলছে, তিনি

তার অন্যতম প্রধান নেতা।

ইরানের আধুনিক রাজনীতি ক্ষেত্রে আয়াতুল্লা কাশ্‌শানীর বিপুল প্রভাব। মাত্র একদিন আগে তিনি খবরের কাগজের মারফত উল্লিখিত ধর্মঘটের আদেশ দেন; সমস্ত তেহরাণ সে আদেশ ধর্মের নির্দেশের মত পালন করে।

আমরা কাশ্‌শানীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সুন্দর তাঁর থাকার স্থান—প্রাসাদতুল্য বাড়ী—আঙিনায় ফুলের বাগিচা—বাগিচার মাঝে মাঝে পরীরা দাঁড়িয়ে পাখা মেলে উড়ি উড়ি করছে, মধ্যখানে ফোয়ারার উৎসারিত ধারা হতে ঝরে পড়ছে চূর্ণিত বারিবিন্দু ঃ হৌজের পানিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে লাল নীল মাছ, ফুলের কানে কানে গুন গুন গেয়ে ফিরছে ভ্রমর বন্ধুরা।

বাড়ীর মধ্যে গিয়েও দেখলাম, বেশ আমীরানা আছবাবপত্র ঃ মেঝেতে পুরু দামী গালিচা, দেয়ালে মস্ত দামী আয়না, দেয়ালের পাশে সুন্দর আলমারী, কারুকাজ করা আলনা, টেবিলে ফুলতোলা চাদর, বসবার জন্য মখমলে ঢাকা সোফা, এক পাশে আস্ত রূপার ফুলদানী।

আমাদের সাথে যে তেহরাণী দোভাষী ছিলেন তিনি কাশ্‌শানীর ভক্ত। আমি অবাক হয়ে এই সব দেখছি দেখে তিনি যেন একটু সঙ্কোচ বোধ করছিলেন; কৈফতের সুরে আস্তে বল্লেন—এ ইমারত আসলে কাশ্‌শানী সাহেবের নয়, তাঁর এক মুরীদ তাকে থাকতে দিয়েছেন।

আমি কিছু বল্লাম না; কিন্তু মন বলে উঠল ঃ গান্ধীজীও এমনি ভাবে তাঁর মুরীদ বিরলার বাড়ী মুছাফির থাকতেন। আচ্ছা, এই যে দরিদ্র-ব্রতী মহাত্মারা ঐশ্বর্যশালী মুরীদদের বাড়ী মুছাফিরী করে করে জীবন কাটিয়ে দেন, এঁদের মধ্যে আর শিষ্যদের মধ্যে আসলে তফাৎটা কোথায় ও কতখানি? খাওয়া, শোয়া, আছবাবপত্রের ব্যবহার—এসব ব্যাপারে তো এঁরা মোটামুটি সমভোগী। একথা সত্য যে, সম্পদশালী শিষ্যরা হয়তো দুই এক পদ এমন খাদ্য পানীয় ব্যবহার করেন যা গুরুরা

করেন না; আবার একথাও তো সত্য যে, শিষ্যরা মেহনত করে যে সব ঘর-দুয়ার খানা-পিনার ব্যবস্থা করেন, গুরুরা নির্ঝঞ্ঝাটে তা ভোগ করেন। কাজেই কাটাকাটি গিয়ে অবশেষে উভয় দল একই সমতলে এসে দাঁড়ায় না তো?

আমি বল্লাম—মন, তুমি বড় পরশ্রীকাতর হয়ে পড়ছ। আজ যাঁরা দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুয়ে, কাল তাঁরা কর্তব্যের আহ্বানে জেলখানার পাথরের উপর গিয়ে অবলীলাক্রমে শুয়ে পড়তে পারেন, তাঁদের জীবন্ত প্রাণের সচলতা কতখানি একবার ভেবে দেখ। আর বিষয় বিলাসের লোভ ছেড়ে যাঁরা দেশের, দশের বা ধর্মের কাজে নামেন, তাঁদেরে কেবল পান্তা খেতে হবে, চীর পরতে হবে, ভূমিতলে শুতে হবে, এমন তো কথা নয়। বরং সাধারণের মধ্যে যারা দিন হয়তো মাত্র ঘণ্টা দুই মাথা খাটায় তাদের চেয়ে দিন ষোল ঘণ্টা যারা মাথা খাটায় তাদের যে অতি পরিশ্রম জনিত ক্ষয়ের পূরণের জন্য অধিকতর পুষ্টিকর খাদ্যের দরকার, একথা স্বীকার করে নিয়ে তদনুযায়ী ব্যবস্থা করাই তো সমীচীন ও শোভনীয়।

তারপর ফুল ফোয়ারার কথা। এদেরে আমরা বিলাস সামগ্রী বলব কেন? আকাশে তারার ফুল ফোটে, পাহাড়ে ঝর্ণার ধারা ছোটে, মানুষ মুগ্ধ হয়ে দেখে; ভক্তি গদগদ কন্ঠে বলে ওঠে—

যেদিকে নয়ন ফিরায়ে চাই
তোমার মহিমা দেখিতে পাই,

সে কি মুগ্ধ মানুষের বিলাসিতা? না তার মনের সম্পদ, তার আত্মার খোরাক?

একে কি বলব ইরানী কবির ব্যর্থ ভাব-বিলাস? বলব কি যে বুলবুলীর মধুর কণ্ঠে নয়, ছিমুমের জহর নিশ্বাসে কবির জীবনের বাণী বেশী মূর্ত হয়ে উঠবে?

কাজেই আয়াতুল্লা কাশ্‌শানীর মার্জিত রুচি ও আমারত দেখে

আমার মন খুশীই হল। ভাবলাম, লোকটা জিন্দা-দিল; ধর্মের নামে আত্মাকে শুকিয়ে মারে নাই।

কিন্তু বেয়াড়া মন আবার তর্ক জুড়ে দিল। বল্ল—এঁরা আদতে যত ভাল মানুষই হোন না কেন, আর তুমি এঁদের পক্ষে যত ওকালতীই করনা কেন, আখেরে এঁরা হজরত ওমরের পর্যায়ে গিয়ে উঠতে পারেন কি? হজরত ওমরকেও তো জেরুজালেমের খৃষ্টান শাসনকর্তা বলেছিলেন—আমার দাওয়াত, রাতটা এখানে কাটান, আমি প্রাসাদে জায়গা করে দেই। কিন্তু তিনি বল্লেন, না, আমি গিয়ে আমার ঐ গরীব সিপাই ভাইদের সাথে মরুভূমিতে তাঁবুর তলে থাকব। আমাদের এঁদেরে শিষ্য শাগরিদরা যে প্রাসাদ দিতে চায়, সে শিষ্য শাগরিদদের গুণ; কিন্তু এঁরা প্রাসাদ-প্রলোভনে পড়েন কেন? শাক্য সিংহ যে মহাজ্ঞান লাভ করেছিলেন, সে প্রাসাদে নয়, প্রাসাদ ত্যাগ করে গিয়ে গাছতলায়। ইছলামের মহাসত্যের জন্ম প্রাসাদতলে নয়, পাথরতলে। এই সেদিন নতুন তুরস্কের যে জন্ম হল, সে আনাতোলিয়ার এক ভাংগা কুঁড়ে ঘরে, আঙ্কারার প্রাসাদ কক্ষে নয়। বড় সত্যের পক্ষে প্রাসাদে বাস করা সহজ হতে পারে, প্রাসাদে জন্মলাভ সহজ নয়।

আমি বল্লাম, মন, তুমি বড় বকুনি শুরু করেছ। এইবার একটু থাম দেখি, আমি অন্য কথা বলি।

কাশ্শানীর নিজের পোশাক পরিচ্ছদ শাদাসিধে—কিন্তু অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মাথায় টুপী, টুপীর নীচের অংশ শাদা রুমালে ঘেরা, গলা হতে টাখনু ও কবজী পর্যন্ত লম্বা জামা, সুন্দর দাড়ি, এক জোড়া তীক্ষ্ম চোখওয়ালা বুদ্ধি-দীপ্ত হাস্যময় মুখমন্ডল। দেহ মধ্যম আকার, বয়স পঁয়ষট্টির কাছাকাছি, কথা আত্ম-বিশ্বাস প্রবুদ্ধ। পাকিস্তান সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি নিজে কিছু বল্লেন না, কিন্তু তাঁর কথায় মনে হয়, কাশ্মীর সম্বন্ধে ভারতের অনুকূলে অনেক কিছু কেউ তাঁকে আগেই বলে রেখেছে। কাশ্মীর

সমস্যা আমরা তাঁকে খোলাসা করে বল্লাম। আফগান সমস্যা সম্বন্ধেও বলতে হল। বল্লেন—বেশ, আমি আগেই জওহরলালকে লিখেছি, আরো চেষ্টা করব যাতে এ দুটি সমস্যারই সন্তোষজনক সমাধান হয়। জনাব তমিজউদ্দীন খাঁ সাহেব বল্লেন—আমাদেরে দুটি নছীহতের কথা বলুন। বল্লেন—নছীহত তো আমিই আপনাদের কাছে শুনতে চাই। আচ্ছা, সে পরে শুনব। তিনটি কথা ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইছলামী তালীমের ব্যবস্থা রেখো, ধর্ম সম্বন্ধীয় কোনও বিতর্ককে ইছলামে বিভেদ সৃষ্টি করতে দিয়ো না, সংখ্যালঘুদের প্রতি সদ্ব্যবহার করো।

আমরা বর্তমান শাহিনশাকে দেখতে চল্লাম। একটা পাহাড়ের ধারে বিরাট আঙিনায় সুন্দর মাঝারি রকমের বাড়ী; চারদিকে ফুলের বাগান আর সুদৃশ্য গাছের সারি। শুধু ফুলকে নয়, গাছকেও ইরানীরা বেজায় ভালবাসে। শহরে রাস্তার দুই ধারে গাছ; সেই গাছের গোড় দিয়ে বরাবর লম্বা নর্দমা; সকালে বিকালে সেই নর্দমা দিয়ে স্রোত আসে, গাছের গোড়ায় গোড়ায় জীবন দিয়ে যায়।

শাহিনশার নিজের গাড়ী ছাড়া আর সবার গাড়ী শাহী মনজিলের বাইরের ফটকেরো বাইরে থাকে; ভিতরে যেতে পারে না। কিন্তু শাহিনশার খাছ হুকুম ছিল—আমাদের গাড়ী ভিতরে গেল। মৌলভী তমিজুদ্দীন খাঁ সাহেব বল্লেন—এটা শাহিনশার অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি আর অপার ভদ্রতার পরিচয়। শাহিনশা যখন করাচী যান, তখন আমি বাতে ন্যাংড়া ছিলাম; সেই অবস্থায় তাঁর সঙ্গে দেখা করি। আজ দেখছি, সে কথা তাঁর মনে আছে; তাই হাটার তকলীফ হতে তিনি অব্যাহতির এই ব্যবস্থা করেছেন।

শাহিনশা বাদশার ছেলে বাদশা; তাঁর বুকেও বাদশাহী দিল।

আমরা প্রথমে গিয়ে একটা কামরায় বসলাম। কিছুক্ষণ পর শাহিনশা ডেকে পাঠালেন। গেলাম। দেখি শাহিনশা তাঁর ঘরের দুয়ারে আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর সঙ্গে সেখানেই মুছাফেহা হল;

তমিজুদ্দীন খাঁ সাহেব খোন্দকার আলী আফজাল ও আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। কাছে উজীর নাজীর মোছাহেব, ছিপাছালার কেউ নাই। ঘরে গিয়ে বসলাম। গালিচা বিছানো মেঝে, তার উপর একটি মেজ আর কয়েকটি কুরছী—শাদাসিধার মধ্যে সুন্দর। মেজের উপর একটি ফুলদার ফুলদানী। তিনি আমাদেরে সিগারেট দিতে সিগারেট কেস্ বাড়িয়ে ধরলেন। ধূমপান ব্যাপারে আমরা তিন জনই নিরামিষভোজী ছিলাম, ছালাম জানিয়ে ধন্যবাদ সহ ফেরত দিলাম। এরপর এল চা, বিস্কুট, কেক, মেওয়া ইত্যাদি। এবার আমরা অস্বীকার করলাম না। শাহিনশা আমাদের শরীক হলেন। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ য়ুরোপীয় ধরণের; কথাবার্তা তিনি ইংরেজীতে বল্লেন। পাকিস্তান সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। বল্লেন—পাকিস্তানী আর ইরানী, এরা ভাই ভাই ঃ পাকিস্তানের প্রতি ইরানীদের অগাধ সহানুভূতি। আমরা ইরানের তেল সমস্যার কথা তুল্লাম। তিনি বল্লেন—ইংল্যাণ্ডের এখন বুঝবার সময় এসেছে যে সে ইরানের সঙ্গে আগের মত আর ব্যবহার করতে পারে না। বিদায়কালে শাহিনশা আবার করমর্দন করলেন; বল্লেন—পাকিস্তানী বন্ধুদের কাছে আমার ছালাম।

বাইশ মিনিট কাল পর্যন্ত শাহিনশার সঙ্গে আমাদের আলাপ-আলোচনা হল।

অত্যন্ত প্রীতিময় একটি স্মৃতি নিয়ে বাসায় ফিরলাম। পথে চলতে চলতে মনে হল—যুগের ধর্ম ঃ নইলে ইরানে আজকে এই অনাড়ম্বর, এই বিনয়ী, এই ভদ্র, এই লোকপ্রিয় শাহিনশার কথা কল্পনা করা সম্ভব ছিল? আড়াই হাজার বছর আগের কথা। এই ইরানেরই বাদশা ছিলেন দরায়ুস। তিনি কোথাও বের হলে শ্বেত বস্ত্র পরিহিত ধর্মযাজকেরা ঘাটিতে ঘাটিতে স্তোত্র আওড়িয়ে করত তাঁর অভ্যর্থনা; ফুলে আর পাতায় রাস্তা যেত ঢেকে, পথের ধারে ধারে রূপার ধূপচী হতে বের হত মনোমুগ্ধকর সুগন্ধ। সমস্ত সাম্রাজ্যের তিনি ছিলেন একচ্ছত্র অধিপতি,

সাম্রাজ্যের বাকি সবাই ছিল তাঁর গোলাম। তাঁর চারপাশে দাঁড়াত তাঁর সভাসদেরা—হাত তাদের থাকত চাদরে ঢাকা, মুখ তাদের থাকত আবৃত, পাছে বা তাদের পঙ্কিল নিশ্বাসের গন্ধ শাহিনশার পবিত্রতা নষ্ট করে; তারা তাঁর কাছে কোন কথা বলতে চাইলে নতজানু কিংবা আভূমি প্রণত হয়ে তবে তা বলতে পারত। রোজ শাহী মঞ্জিলের দস্তরখানে খেত দশ হাজার লোক—এরা ছিল তাঁর হেদরক্ষী—জগতের চারদিক হতে হত এরা সংগৃহীত—এদের মধ্যে ছিল আরবী পারসী, ছিল তাতার তুর্কী, ছিল গ্রীক মিসরী, ছিল হাবশী আর্মেণী। তাঁর বিরাট সৈন্য বাহিনী যখন পথে চলত তখন তাদের পদভরে মেদিনী দুরু দুরু কাঁপত; তারা যেখানে রাত্রিবাস করত, সেখানকার আকাশ বাতাস লক্ষ মশালের আলোকে প্রদীপ্ত হয়ে উঠত। মনে হত, কোন বিরাট নগরীতে আগুন লেগেছে, সে আগুনের অগণ্য শিখা মুহুর্মুহু আকাশের বুকে লাফিয়ে উঠছে।

রাত্রিতে পার্ক হোটেলে খেতে গেলাম। তেহরাণের প্রথম শ্রেণীর হোটেলের মধ্যে দরবন্দ এক নম্বর, আর পার্ক হোটেল দুই নম্বর। সামাজিক বালিকারা এখানেই বেশী আসে বলে মনে হল। আমরা যাদেরে দেখলাম, তাদের বেশীর ভাগই বিদেশী—য়ুরোপ আমেরিকা—, বাকিরা ইরানী।

খানার কোয়ালিটী ভাল ঃ রকম মামুলী—পাশ্চাত্য রীতি মোতাবেক। মনে হল, মধ্যপ্রাচ্যের সর্বত্রই খানা একই আদর্শে তৈরী হতে চলেছে। মক্কা-মদীনা হতে শুরু করে আলেপ্পো, বৈরুত, দামেশক, ইস্তাম্বুল, তেহরাণ—সবখানেই খানার কামরায় চেয়ার টেবিল, কাটা চামিচ, সুপ পরীজ, সালাদ, সবজী, সিদ্ধ গোশত, সিদ্ধ গোলআলু, রান্না গোশত, টিনের মাছ, পাউরুটী, চাপাতী, ফল, সোডা ইত্যাদি। কোথাও দুই চার পদ নতুন আছে, তবে সেগুলি আসল পদ নয়, ফাও পদ; কোন কোন সময় সেগুলি আসলে নতুন পদও নয়। যেমন, লেবাননের একটি হোটেলে খাচ্ছিলাম। একটা পদ এল—একদম ছফেদ—

চিনলাম না। নাম জিজ্ঞাসা করলাম, একটা ভারি সুন্দর নাম বল্ল। ভাবলাম, এত্তদিনে একটা নতুন সুস্বাদু পদ খাবার পাওয়া গেল। নিতান্ত আগ্রহে মুখে দিলাম; দেখি—ও আল্লাহ্! এ যে আমাদের চিরপরিচিত বাংলার বেগুন ভর্তা! দৈ-এর ঘোমটা পরে নয়া বৌ সেজে এসেছেন!

রেস্তোরাঁ জীবন মধ্যপ্রাচ্যের শহরগুলিতে দ্রুত প্রসার লাভ করছে। নারী জাগরণের সাড়া সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে। শিক্ষিতা নারীরা কেবল ঘরকন্নার কাজ করে তুষ্ট নয়; অবসর সময় গৃহকোণে বসে বই পড়ে কাটাতেও রাজী নয়। তারা চায় বাইরের আলো-হাওয়ার জীবন—তারা চায় বহির্জগতের কর্মময় জীবনে অংশ গ্রহণ করতে। সে জীবনে যারা সাক্ষাৎভাবে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ না পায়, তারাও বাইরের তামাদ্দুনিক জীবনে ভাগী হতে চায়। সেই জন্য বিকালের সভা, সন্ধ্যার সমিতি, রাতের ক্লাব—এগুলি হয়ে পড়ে লোভনীয়। ফলে রাতের রান্নার সঙ্গে এগুলির সংঘাত হয়ে উঠে অনিবার্য। এঁদের সকলের পক্ষে চাকর পোষণ সহজ নয়; যাঁদের পক্ষে চাকর পোষণ সহজ, তাঁদের পক্ষেও চাকরকে একেলা ছেড়ে দিয়ে আসা নিরাপদ নয়। অগত্যা রাতের খাওয়াটা বাইরে খাওয়াই সমীচীন মনে হয়। এমনি করে রেস্তোরাঁ জীবনের শুরু। এর পর বাইরের সভা সমিতি ছাড়া কেবল রেস্তোরাঁয় বসে খাওয়াই একটা লোভনীয় বস্তু হয়ে পড়ে। কারণ রেস্তোরাঁ এখন আর কেবল খানার ঘর নয়, এ একটা মিলন ক্ষেত্র, আলোচনার ছোট্ট মজলিস—এ একটা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান, একটা ইনষ্টিটিউশন।

আমরা যখন তেহরাণে, তখন তেল-সমস্যার ফলে ইরান আর ইংরেজদের মধ্যে সম্বন্ধ ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে উঠছে।

ইরানীদের তেল জাতীয়করণের দাবী সম্বন্ধে একটি বিবৃতি আমি ইংরেজীতে লিখে বিভিন্ন কাগজে পাঠিয়ে দিলাম। তাঁরা আমার কাছ থেকে আমার ফটো নিয়ে গেলেন। পরদিন ১লা অক্টোবরের তেহরাণের সমস্ত দৈনিক কাগজে আমার ফটো সহ আমার বিবৃতি ছাপা হল।

শুনলাম, আমার লেখায় ইরানী মহলে বেশ একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। উজীরে আজম ডাক্তার মোচ্ছাদেক আমাকে মোবারকবাদ জানাবার জন্য বৈদেশিক মন্ত্রীকে আমার কাছে পাঠালেন। খবরের কাগজওয়ালারা সংবাদ পাঠালেন, তাঁরা আমাকে চা-চক্রে দাওয়াত করবেন। কিন্তু ঐ দিনই আমাদের রওয়ানা হওয়ার তারিখ থাকায় আমার পক্ষে এ দাওয়াত রক্ষা করা সম্ভব হল না।

ইরানের কাব্য, ইরানের গজল, এ সবের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার কোন সুযোগ পেলাম না। একটি সঙ্গীত জলসায় যোগ দিতে বের হয়েছিলাম। তখন রাত ৮॥টা বেজেছে। খানিক দূর গিয়ে দেখি— রাস্তায় বিষম জটলা, লোকের দৌড়াদৌড়ি, পুলিশের ভীড়, গোলাগুলির আওয়াজ। অনুসন্ধানে জানলাম তার মর্ম এই ঃ তেহরাণে কমিউনিষ্টদের একটা দল আছে, নাম তুদা দল। পুলিশ সে দলের কয়েকজনকে গেরেফতার করতে গিয়েছিল; তারপর পুলিশ আর তুদাদের মধ্যে গোলাগুলি শুরু হয়ে গেছে। আরো জানলাম, কেবল তাই নয়, এই গোলাগুলি চলছে আমাদের গন্তব্য জলসার দুই শ হাত মধ্যে। ভাবলাম, অন্ধকার রাত; একটা বুলেট পথ ভুলে এসে যদি আমার সামনে হাজির হয়, তবে আমি যে সংরক্ষিত দূতাবাসের নিরীহ বিদেশী মেহমান, এ পরিচয় দেওয়ার আগেই সে অনায়াসে আমার বুকে গিয়ে ঢুকবে। তা ছাড়া, হাফিজ মাশুকের গালের তিলের বদলে বোখারা সমরকন্দ দিতে রাজী হয়েছেন, গজলের বদলে জান দিতে হবে, এমন কথা তো কোথাও বলেন নাই। ইরান দেশে এসে ইরানী কবির ফতোয়া মেনে চলাই তো শ্রেয়ঃ। ফিরে চল্লাম।

পথে মনে হল, গজল শোনা তো হলই না, গজলের দুই একটা রেকর্ড কিনে নিয়ে গেলে হয় না?

রেকর্ডের এক দোকানে ঢুকে পড়লাম। দোকানদার শরীফ লোক, পরম ভদ্রতার সঙ্গে নিয়ে বসালেন। বল্লেন—

'বান্দার উপর কি হুকুম?

'ভাল গজলের কয়েকটা রেকর্ড এনায়েত করলে নেহায়েত ছরফরাজ হই।

'কি কি গজলের রেকর্ড?

'এই ধরুন—চে তদবীর আয় মুছলমানাঁ কে মান খোদরা নামিদানম।

'নাই।

'আচ্ছা, ওটা আছে?—বদরদে দিল গেরেফতারম দাওয়ায়ে দিল নামিদানম।

'না, তাও নাই। *** কিন্তু মাফ করবেন, আমি অবাক হচ্ছি।

'বুঝেছি। ভাবছেন, বাদশা কায়কাউছের সাথে দেখা করতে যাব বলে তাঁর বাড়ী দেখিয়ে ফরমাস দিচ্ছি, না?

'প্রায় তাই।

'আমি পুরানা ছুফীদের গজল ভালবাসি কি না, সেই জন্য।

'কিন্তু কাল যে উল্টে গেছে, হুজুর।

'কেমন?

'এ জামানায় ও-সব গজল বড় কেউ শুনতে চায় না; তাই রাখি না।

'জামানার গরদিশ!

'তাই। তবে তার জন্য আমরা খুব আফছোছ করি না।

'মানে?

'এক জামানা ছিল যখন ইরানে ধন-দৌলতের অভাব ছিল না; মানুষ ঐশ্বর্য-বিলাসে হামেশা মশগুল থাকত। মানুষের মনকে দুনিয়ার সেই অবাঞ্ছিত মোহ হতে মুক্ত করার জন্য তখন ছুফীয়ানা গজলের দরকার ছিল নিতান্ত নিদারুণ। আজ ইরানের সে ঐশ্বর্য-বৈভব নাই, ইরানীর পেটে এখন খিদের আগুন, তার আজাদীর উপর এখন বিদেশী

দুশমনদের শয়তানী নজর। কাজেই এ জামানার চাহিদা আলাদা, এ জামানার সঙ্গীতও আলাদা।

'বেশ, এই নতুনকেই তবে 'মারহাবা খোশ আমদেদ' বলে অভিনন্দন করছি।

'তা হলে এখন হুকুম?

'আধুনিক গজলের কয়েকটা রেকর্ড দিন।

'কান্ কোন্টা?

'যা আপনার খুশী।

দূতাবাসের বন্ধুদের কাছে ইরানের লোকদের কথা অনেক শুনলাম; মনে হল, হ্যাঁ, গুলিস্তানের দেশের লোক বলে এদেরে মানায়। এক বন্ধু বল্লেন—'আমি তিন বছর যাবত তেহরাণে আছি, এর মধ্যে এদের কারো মুখে আমি কোন গালিগালাজ শুনি নাই ঃ ভব্যতা বিরুদ্ধ কথা এদের মুখে আসে না। এরা অসম্ভব রকমে ফুল-প্রিয়। আদালতের পিয়ন—সেও মাসের প্রথম মাইনে পেয়ে পয়লা যায় ফুলের বাজারে—ফুলের তোড়া কিনে, ফুলদানী কিনে, দুটো নতুন ফুলের চারা কিনে। ছোট ছোট বাড়ী—হয়তো গরীবের কুড়ে ঘর; বাইর থেকে দেখে কিছু বোঝা যায় না; দেউড়ী পার হলেই চোখে পড়ে উঠানের কোনে একটি ছোট্ট সুন্দর বাগান; বসবার ঘরের টেবিলের উপর দুটি ফুলদানী, মেঝের উপর বিছানো বিচিত্র গালিচা, দেয়ালে টানানো কয়েকটি ছবি। মেয়েরা মজলিসে বসে খানাপিনা করতে নিতান্ত ভালবাসে—মাঝে মাঝেই কয়েকজনে মিলে বাইরে যায়, বৌভাত খায়, হল্লা করে, গান গায়, ফিরে আসে।'

ইরানী মহিলারা ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরলেন; এখন তাঁরা ঘুমাতে যাবেন। আমরা তা হলে আজকের মত কথা বন্ধ করি।

ELEVEN BULLET CLUB
Estd. 1967
DATE ...
P.O. SHARIAKANDI,
DIST. BOGRA.

Rafiqul Islam.
A.H.O.

তেহরাণ
১লা অক্টোবর, ১৯৫১

ভাই ইবনে-খালদুন,

তেহরাণ হতে প্রথম পত্র লিখেছি কাজী সাহেবকে; কারণ তিনি ইরানের নামে অজ্ঞান;—তার কাব্য, তার গজল, তার ছুফীয়ানা ইশ্‌ক—এসব তাঁর দরদী দিলকে বহুকাল থেকে মশগুল করে রেখেছে। তুমি ইতিহাসের পোকা—পুরানা বইয়ের শুকনা পাতার ফাঁকে ফাঁকে বিহার কর; তাই তোমার জন্য ইরানের পুরানা জিনিসই কিছু রেখে দিয়েছি। তোমার কাছে তো ঐ সব কীটে-খাওয়া মালেরই কিম্মত বেশী।

কিন্তু ভাই, সত্যি বলতে কি, আমাদের আধুনিকতা-বিলাসীরা প্রাচীনের প্রতি যতই কটাক্ষ করুন না কেন, আমি তো অতীত যুগের কীর্তি-চিহ্ন পেলে কিছুতেই তার থেকে সহজে চোখ ফিরাতে পারি না। ও যেন আমারই সম্মানিত পিতৃ-পিতামহের অর্জিত সম্পদের অবশেষ—ওর বর্তমান বাজার দর অন্য লোকের কাছে যাই থাক, আমার কাছে ওর মূল্য অশেষ ঃ ওতে পাই আমি আমার অতীত পুরুষের হৃদয়ের ছাপ, তাঁদের সাধনার ইতিহাস ঃ ওদের মৌন ভাষার আবেদনে আমার বুক সাহসে, উৎসাহে, গর্বে ফুলে ওঠে। আমি নতুন অভিযানের জন্য প্রেরণা লাভ করি।

অতীতের উপর অহেতুক নির্ভর-প্রবণতা যেমন মারাত্মক, অতীতের প্রতি অহেতুক অবজ্ঞাও তেমনি মারাত্মক।

তেহরাণের কথা। ৩০শে সেপ্টেম্বর আমরা কাখে গুলিস্তান দেখতে গেলাম। কাখে গুলিস্তান মানে উদ্যান প্রাসাদ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে শাহ্‌ নাছিরুদ্দিন এই প্রাসাদ নির্মাণ করেন। প্রাসাদটির চারদিকে বিস্তীর্ণ ফুলের বাগান ঃ বাগানের মাঝে মাঝে বসবার ব্যবস্থা—শ্বেত মর্মরের বেঞ্চি—পানির চৌবাচ্চা —চৌবাচ্চায় লাল

নীল হলুদ রং-এর মাছ—শ্বেত মর্মরের পরী—তাদের কারো হাতে আলোর ঝাড়, কারো হাতে আবেহায়াতের পেয়ালা—এখানে ওখানে সেখানে ফোয়ারা—পানির ধারা পাঁচ হাত সাত হাত লাফিয়ে উঠে হীরক চূর্ণ হয়ে ঝরে পড়ছে। ইমারতটির নাম উদ্যান প্রাসাদ না হয়ে শীশ মহলও হতে পারত। কারণ প্রাসাদের ফটক পার হয়েই চোখে পড়ে কয়েকটি বড় বড় কামরা—তার দেওয়াল, তার স্তম্ভ, তার মেঝে, তার ছাদ সমস্তই বিচিত্র কাচে ঢাকা। এখানে এখন কেউ থাকে না—প্রকৃত পক্ষে এটি এখন এক রকম যাদুঘর। এখানে আছে তখতে-তাউছ—সেই ময়ূর-সিংহাসন যা আমাদেরই দেশ থেকে নাদির শা নিয়ে গিয়েছিলেন। ইরানীদের এত আদর আপ্যায়ন, এত সৌজন্য সৌহার্দ—তবু ক্ষণিকের জন্য মনের উপর কিসের একটা ছায়াপাত হল। এই প্রাসাদেরই একটি প্রকোষ্ঠে রেজা শা পাহ্‌লুভীর সিংহাসন-আরোহন-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রাসাদময় বড় বড় সুন্দর ছবি, বড় বড় মনোরম ফুলের টব, বড় বড় সুদৃশ্য আলোর ঝাড়, দুষ্প্রাপ্য বাসন-কোসন, ব্রোঞ্জ ও পিতলে তৈরী বড় বড় পাখী—বিচিত্র কারুশিল্প খচিত গালিচা—একটি ছোট্ট গালিচা লম্বায় ৬ হাত, পাশে ৪ হাত, তার দাম ৫ হাজার টাকা।

তেহরাণের যাদুঘরে গেলাম। সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট যুবক, বোধ হয় আমেরিকার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রেনিং পাওয়া বিশেষজ্ঞ। যাদুঘরের আর একটি আমলা দেখলাম। ইনি মহাফেজ অর্থাৎ কিনা তত্বাবধায়ক। এঁকে ইরানী সরকার ইণ্টারভিউ করে নিযুক্ত করেছেন, না যাদুঘরের আরো অনেক জিনিসের সাথে তাঁকেও কোন অতীতের বিস্মৃত গুহা হতে উদ্ধার করে এনেছেন, বোঝা গেল না। তাঁর বয়স অনুমান করা কঠিন। মাথায় বাবরী ঢেউ খেলানো, দাড়ি তরঙ্গে তরঙ্গে নাভি পর্যন্ত এসে নেমেছে, চোখের ভ্রূ মোটা, ঘন, লম্বা। দাড়ি, চুল, ভ্রূ, গায়ের পশম—সমস্তই সেই রং-এর, বহুকাল পাকা থাকার পর দাড়ি চুলে একটা ম্লানিমার ছায়া পড়ে যে একটা নতুন রং-এর সৃষ্টি হয়। গায়ের চামড়া

Rafiqul Islam
Ramnagar
Shantiniketan
Bolpur.

একদম ছফেদ, তাতে লোল ধরেছে, ভ্রূর উপরের মাংস চোখের উপর ঝুকে পড়ে তার খানিকটা ঢেকে ফেলেছে; হাতপায়ের লম্বা লম্বা আঙুল ক্রমে মাংসহীন হতে হতে বাজ পাখীর চোঙ্গলের চেহারা ধারণ করেছে। যীশুখৃষ্টের জন্ম-সংবাদে পূবদেশ হতে অনেক অশিতিপর বৃদ্ধ জ্ঞানীরা তাঁকে দেখতে এসেছিলেন এই কল্পনায় পাদ্রীরা বাইবেলে তাঁদের যে ছবি আঁকেন, মনে হল, তাঁদেরই একজন কালের তীর বেয়ে বেয়ে এখানে এসে হাজির হন নাই তো?

কিন্তু এই শতাব্দী-বয়সীর বুকে এখনো কি অফুরন্ত উদ্যম উৎসাহ! তিনি আমাদেরে পেয়ে পরম উল্লাসে প্রথমেই নিয়ে গেলেন দরায়ুসের (ডেরিয়াস) পাষাণে অঙ্কিত চিত্রের কাছে; এমন ঘনিষ্ট আপন ভাবে দরায়ুস সম্বন্ধে কথা বলতে লাগলেন যেন তিনি সম্রাটকে তাঁর শিশু বয়সে কোলে-কাখে করে মানুষ করেছিলেন এবং তাঁর পরবর্তী বিজয় অভিযানে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজে মোতায়েন ছিলেন। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে দরায়ুস পারস্যের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। একটি বিরাট প্রস্তর খন্ডের উপর উৎকীর্ণ রেখামূর্তি—দরায়ুস দাঁড়ানো—উজীর নাজীরেরা দূর হতে সামনে সামান্য ঝুঁকে পড়ে এক হাত তুলে ছালাম করছেন: ঠিক পূর্ববাংলার ভদ্র মহলে এখনো যে কায়দার ছালাম চলিত আছে। মনে হল, হুমায়ুন তাঁর প্রবাস জীবন অন্তে যখন পাক-ভারতে ফিরে আসেন, তখন ইরানী তমদ্দুনের আরো অনেক সামগ্রীর সঙ্গে এই কায়দার ছালামটিও তিনি সঙ্গে আনেন। তা যদি সত্য হয়, তবে আমাদের এই ছালামের বয়স আড়াই হাজার বছর। আবার দরায়ুস কয় হাজার বছর আগে কার কাছ থেকে এই ছালাম তমদ্দুনী ওয়ারেসী সূত্রে পেয়েছিলেন, তা কে জানে? ইরানের বিভিন্ন স্থান হতে অনেকগুলি মাটির পাত্র মাটি খুঁড়ে এনে এখানে জমা করা হয়েছে। অতি সুন্দর অবস্থায় তারা এখনো রক্ষিত: আর তাদের রং, চেহারা, কারুকার্য দেখলে মনে হয় না তারা বর্তমান যুগের মাটির পাত্রের তুলনায় খুব

সহজে হেরে যাবে। এদের বয়স নাকি ৭ হাজার বছরের কাছাকাছি। মুছলিম যুগের কারুশিল্পের অনেকগুলি নমুনা আছে। এ শিল্প প্রধানতঃ রেখাসর্বস্ব, মূর্তিময় নয়। কোরান শরীফের আয়াত বিচিত্র লতাপুষ্পে সজ্জিত অবস্থায় লেখা হয়েছে। নানা বর্ণের ফুল, নানা বর্ণের পাতা, তারই মাঝে মাঝে সোনালী হরফে অদ্ভুত সুন্দর হস্তলিপি। এক জায়গায় দেয়ালের গায় একটি বিরাট ছবি—রাশীয়ার সাথে ইরানের লড়াই।

ছিপাছালার মছজিদ দেখতে গেলাম। বিরাট মছজিদ—অত্যন্ত সুন্দর। এ শুধু নামাজের জায়গা নয়; এ নামাজের জায়গা, মহফেলের জায়গা, মছজিদের দফতরের জায়গা, কুতুব খানার জায়গা। মস্ত কুতুবখানা—ধবধবে ছাফ কাপড় পরা, ধবধবে পাকা দাড়িওয়ালা একজন সৌম্যমূর্তি পাতলা-দেহ বুড়ো মানুষ আমাদেরে অভ্যর্থনা করলেন—মনে হল, যেন অনেক দিন পর একজন সঠিক ধরণের লাইব্রেরীয়ান দেখলাম। কাব্য দর্শন সঙ্গীতের দেশ ইরান—এর প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে বই থরে থরে সাজানো ঃ ধর্মসংক্রান্ত বইগুলি আরো যত্নে, আরো ভক্তির সঙ্গে রক্ষিত। মছজিদ এতকাল একটি ওয়াক্‌ফ্‌ সম্পত্তির আয়ের উপর নির্ভর করত; এক্ষণে গভর্ণমেণ্ট এর সাহায্যে অগ্রসর হয়েছেন। একশ ছেলে এখানে ইদানিং পড়াশুনা করে। এরা সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন সবই পড়ে, তবে পরিণামে এদেরে শিক্ষিত করে তোলা হবে ধর্ম প্রচারক রূপে। অধ্যক্ষ আরো বল্লেন—শিয়া প্রচারকদের আসল শিক্ষা-কেন্দ্র কুম শহর—সেখানে হাজার হাজার ছেলে তবলীগী শিক্ষা পেয়ে আসছে।

বন্ধু আলী আফজাল সাহেব আমার দিকে চেয়ে বল্লেন—তেহরাণ নয়, ইস্পাহান নয়, শীরাজ নয়, বন্দর আব্বাছও নয়, একদম কুমে গিয়ে এ শিক্ষা-কেন্দ্র গড়ে উঠল কেন? আমি বল্লাম—কুম যে বহুকাল হতে শিয়া ধর্মের একটা মস্ত কেল্লা; সে সম্বন্ধে একটা গল্পও শুনিয়ে দিতে পারি। সাথীরা কান উঁচু করে দাঁড়ালেন। আমি বল্লাম ঃ—

সে অনেক—অনেক দিন আগের কথা। ইরান তখন আব্বাছীয়া খলীফাদের শাসনাধীন। একবার বাগদাদ হতে কুম শহরের জন্য এক নব নিযুক্ত সুন্নী গভর্ণর মহলে গিয়ে হাজির। তিনি কুমের প্রধানদেরে এক দরবারে ডেকে কার কি নাম জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে তাঁরা বল্লেন—কারো নাম আলী, কারো হাছান, কারো হোছেন, কারো জয়নুল আবেদিন ইত্যাদি; কিন্তু আবুবকর, ওমর, ওছমান বলে কেউ পরিচয় দিলেন না। গভর্ণর ক্ষেপে গেলেন। বল্লেন, আমি সাত দিনের মধ্যে একটি সুন্নী নাম চাই—আবুবকর, ওমর, ওছমান যে নামই হোক; এর খেলাপ হলে উপস্থিত কারো ধড়ে কাল্লা থাকবে না। প্রধানরা ফিরে গিয়ে হয়রান হয়ে খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু ও-নাম আর মিলে না। তাঁরা ভাবলেন—না, এবার আর কাল্লাটা রক্ষা করা গেল না। এমন সময় নগর প্রান্তে মরুভূমির এক কোণে একটি ভাঙ্গা তাঁবুতে পাওয়া গেল একটি ছেলে, নাম তার আবুবকর। ছেলেটির পেট ফুলা, নাক বোচা, এক চোখ কানা। তাকেই সরদারেরা নিয়ে গভর্ণরের দরবারে হাজির করে বল্লেন—এনেছি হুজুর। গভর্ণর তো ছেলে দেখে রেগে খুন। বল্লেন, কি! তোমরা তামাসা করতে এসেছ? এতদিনে একজন আবুবকর পেয়েছে তো এই তার চেহারা? প্রধানরা ভয়ে মূর্চ্ছিত প্রায়। তাদের মধ্য হতে একজন হাত জোড় করে বল্লেন—হুজুর, মারেন আর কাটেন, কুম শহরে এর চেয়ে ভাল আবুবকর পয়দা হবে না। গভর্ণর হেসে বল্লেন—আচ্ছা, মাফ।

ছিপাছালার মছজিদ দেখে দরবেশ শা আবদুল আজীমের মাজার জিয়ারত করতে গেলাম। শা আবদুল আজীম ছিলেন ইমাম ছৈয়দ মুছা রেজার ভাই। মাজার মেরামত হচ্ছিল; আমরা যাওয়ার আগের দিন স্বয়ং শাহানশা এসে সংস্কার-করা মাজারের দ্বারোদঘাটন করে গেছেন। কী সুন্দর মাজার, আর খরচ লাখ ছাড়িয়ে কোটিতে গিয়ে পৌঁছেছে কি না কে জানে? সাধারণ অবস্থায় মাজারের দুয়ার খোলা হয় না;

আমাদের জন্য বিশেষ অনুগ্রহ করে দুয়ার তাঁরা খুলে দিলেন; আমরা জিয়ারত করলাম। এই মাজারের অন্য অংশে মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আছেন শাহানশা নাছিরুদ্দীন ঃ কবরের উপরে তাঁর একটি মর্মর মূর্তি শাহী পোশাক পরে শুয়ে আছে।

শা আবদুল আজীমের দরগার সঙ্গে একটি বিপ্লবী স্মৃতি জড়িত আছে। তখন পারস্যের অধিপতি শা নাছিরুদ্দীন বিলাসের স্রোতে অঙ্গ ঢেলে দিয়ে নিজে ভেসে চলেছেন, দেশকে ভাসিয়ে চলেছেন। দেশের শিল্প বাণিজ্য, ধন সম্পদের সর্বপ্রকার পথ শাহানশা একে একে য়ুরোপীয়দের হাতে তুলে দিচ্ছেন; য়ুরোপীয় শক্তিরা আস্তে আস্তে তাদের দূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের নাগপাশে পারস্যকে বেঁধে ফেলতে শুরু করেছে।

এমন সময় আল্লামা জামালুদ্দীন আফগানী তেহরাণে উপস্থিত হলেন। ইরানের এ আসন্ন বিপদ আফগানীর তীক্ষ্ন দৃষ্টি এড়াতে পারল না। তিনি শাহানশা ও তাঁর উজীর উভয়কে বুঝাতে চেষ্টা করলেন। বাদশা আফগানীকে মনে করলেন তাঁর বিলাস-পথের বিঘ্ন, উজীর আফগানীকে মনে করলেন তাঁর ভবিষ্যৎ প্রতিদ্বন্দ্বী। কাজেই তাঁরা আফগানীকে দুশমনীর চোখে দেখতে শুরু করলেন। আফগানী অগত্যা শা আবদুল আজীমের দরগায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু কেবল আত্মরক্ষার চিন্তায় তিনি ব্যস্ত থাকতে পারলেন না। তিনি ভাবলেন, ইরান ত্যাগের আগে তিনি শা ও উজীরের অনাচারের বিরুদ্ধে একটা তুমুল আন্দোলনের সূত্রপাত করে যাবেন।

তিনি দরগায় থেকে শিক্ষাদান শুরু করলেন। বহু ছাত্র ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তাঁর কাছে নব জীবনের মন্ত্র গ্রহণ করতে লাগল। দেশের দিকে দিকে গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠতে শুরু করল—সকলের পণঃ শা আর উজীরের অনাচার হতে দেশকে রক্ষা করতে হবে।

এর কিছুদিন পর আফগানীকে গেরেফতার করে দরগা হতে বের

করে দেওয়া হল। কিন্তু তাঁর প্রবর্তিত আন্দোলনের গতিরোধ হল না। শা নাছিরুদ্দীন নিহত হলেন; ইরানের জাতীয় আন্দোলন চলতে লাগল।

আবদুল আজীমের মাজারের অল্প দূরে মরহুম রেজা শা পাহ্‌লভীর মাজার ঃ চারদিকে সুন্দর ফুলের বাগান, মাঝখানে শাদাসিধা উঁচু ইমারত, সামনে দুই জন সিপাই বন্দুক কাঁধে টহল দিয়ে ফিরছে। মাজারের অধ্যক্ষ এসে দুয়ার খুলে দিলেন। ভিতরে গেলাম। ভিতরটা অনাড়ম্বর সৌন্দর্যে মণ্ডিত, মৌন সম্ভ্রমে মুখর। নীরবে দাঁড়িয়ে মোনাজাত করলাম ঃ হে বিশ্ব-নিয়ন্তা, আজ এখানে যিনি ঘুমিয়ে আছেন, একদিন তিনি তাঁর দেশের জন্য সর্বস্ব পণ করে লড়েছিলেন, সর্বশক্তি নিয়োগে সাধনা করেছিলেন—আজ তাঁর দেশবাসীকে তুমি তাঁর সেই শক্তি, সেই সাধনা, সেই সেবা-প্রীতি দাও; তাঁর এ দূরদেশী ভক্তদের দিলেও তুমি সেই প্রেরণার সঞ্চার কর। আমিন—আল্লাহুম্মা আমিন।

মাজার সংলগ্ন একটি কামরায় আমাদেরে চায়ে আপ্যায়িত করা হল। কামরাটির দেয়ালে এখানে ওখানে সেখানে সুন্দর সুন্দর ছবি—রেজা শার জীবনের ক্রমবিকাশের একটি সুসংবদ্ধ ধারা ছবিগুলিতে ফুটে আছে। প্রথমে ছিলেন তিনি একজন সামান্য সিপাই—এ রেজা খাঁ—তরুণ, পাতলা, বুদ্ধি-দীপ্ত; তারপর কর্ণেল—দুর্দান্ত ঘোড়ার উপর ছওয়ার—দৃপ্ত শক্তির গরিমায় দেহ চঞ্চল; তারপর সেনাপতি—ইজ্জত-উদ্দীপ্ত, প্রতিষ্ঠাপন্ন, গরীয়ান; তারপর ইরান রাজ্যের মহিমান্বিত সম্রাট রেজা শা পাহ্‌লভী। বিদেশীদের করাল কবল হতে ইনি উদ্ধার করেছিলেন আপনার প্রিয় মাতৃভূমিকে। সমগ্র ইরান তাঁকে বসিয়েছিল তাদের হৃদয়ের সিংহাসনে; সেদিন সুদূর বাংলার তরুণ কবিও পরম উল্লাসে তাঁর প্রশস্তি গেয়েছিলেন ঃ

> হিংসায় সিয়া শিয়াদের তাজে শিরাজী শোনিমা লেগেছে আজ,
> নও-রোস্তম রুখেছে রুশীয়া, সফেদ দেওরেরে দিয়েছে লাজ!
> মনে হয়, আজ আবার দুরন্ত দুশমনদের ছায়া কালান্তক

সী-মোরগের ছায়ার মত ইরানী দিগন্তের পাশে পাশে নেচে ফিরছে। কিন্তু সে কথা এখন থাক।

তেহরাণে রেজা শা পাহ্‌লুভী সম্বন্ধে যা শুনলাম, তাতে মনে হল, তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের ছাপ আজো ইরানময় ছেয়ে আছে। আধুনিক আদর্শ-সংগত আলো হাওয়াময় বড় বড় দালান, দুই ধারের ছায়াদার গাছে ঢাকা প্রশস্ত রাস্তা, নতুন ধরণের বাগান, উপবন,—এ সমস্তের পত্তন তিনিই করেছেন। একবার রেজা শা এক স্কুল দেখতে গেছেন। হঠাৎ একটা ছেলে তাঁর হাতে একটা কাগজ দিল। তিনি কাগজটা হাতে নিয়ে সংগের শিক্ষা-মন্ত্রীর কাছে দিলেন। পরে শিক্ষামন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি? ছেলেটা শাসনের সর্বপ্রকার নিয়ম ভংগ করে সোজা আমার কাছে এসে কাগজ দিল—এত বড় অনিয়ম ছেলেটা কেন করল? শিক্ষা-মন্ত্রী বল্লেন, ও কিছু নয়, জাঁহাপনা; পাড়াগাঁয়ের ছেলে, আদব-লেহাজ এখনো শিখে ওঠে নাই। কিন্তু রেজা শার মন খুঁতখুঁত করতে লাগল; তিনি ভাবলেন, ছেলেটা হয়তো এমন মস্ত বিপদে পড়েছে যে ভদ্রতার বাঁধ সে মানতে পারে নাই। তিনি নিজে অনুসন্ধান করলেন। দেখলেন, ছেলেটি বিধবা মা সহ মহাবিপন্ন—ভাড়া দিতে পারে না, বাড়ীর মালিক আজ ওদেরে পথে বের করে দিয়েছে। ভদ্রঘরের মেয়ে এ মা—তিনি ওড়নায় মুখ চোখ ঢেকে গাছ তলায় বসে আছেন। ছেলেটা কি করে আর পড়বে, তারো কোন উপায় নাই। রেজা শা হুকুম দিলেন, ছেলেটার মাকে এক্ষুণি একটা সরকারী বাড়ী দিয়ে দাও; ছেলেটার শিক্ষার জন্য সরকারী বৃত্তি মঞ্জুর কর। আর ঐ সহানুভূতিহীন শিক্ষামন্ত্রীকে জানিয়ে দাও—কাল হতে সে চাকরী হতে বরখাস্ত্।

ইরান চিরদিনই কাব্য আর সংগীত, ফুল আর বুলবুল, শামা আর পরওয়ানা, ছুফী আর দরবেশের দেশ। ইরানের এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আরব ভূমিগুলির বাইরে মুছলিম এশিয়ার বাকি দেশগুলিতে কি বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল, আজো ভেবে বিস্ময় বোধ হয়। বোখারা

সমরকন্দ, কাবুল কান্দাহার, দিল্লী আগরা, ঢাকা মুর্শীদাবাদ, সামারনা আর্জেরুম—এসব শহরের বিদ্বান সমাজে ইমরুল-কায়েছ, মুতানাব্বী অপরিচিত ছিলেন এমন নয়, কিন্তু এ'রা ছিলেন আলিম ফাজিলদের কুতুবখানার মৌন মুহূর্তের সাথী; তাঁদের মহফিল মজলিসে, তাঁদের আনন্দ উৎসবে, তাঁদের বৈঠকী আলাপ-আলোচনায় তাঁদের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন হাফিজ আর ওমর খাইয়াম, উরফী আর ফিরদৌছী, ছাদী আর মওলানা রুমী। যে মজলিসে এ'দের কবিতা হতে দশ বিশ মিছরা আওড়ান না হত, সে মজলিস ভদ্রের মজলিস বলেই গণ্য হত না। পঞ্চাশ বছর আগেও বাংলার দূর পল্লীর বুকে বুকে ছুফী কবিদের ফারছী গজলের গুঞ্জনে আমাদের মিলাদ মহফিলগুলি অনাবিল আনন্দরসে জমে উঠত।

কবিতার কি অদ্ভুত প্রভাবই না এ'দের উপর ছিল!

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী। ইরানী কবি রুদাগীর আবির্ভাব কাল। বোখারার অধীশ্বর আমীর নছর সসৈন্য হিরাতে অবস্থান করছেন। সৈন্যরা বোখারায় ফিরে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব; কিন্তু আমীর সে কথা মুখেই আনেন না। অবশেষে সৈন্যরা গিয়ে কবি রুদাগীকে পাকড়াও করল। বল্ল—এইবার পরখ করব তোমার কলমের কেরামত। এমন মর্মস্পর্শী কিছু লিখে দিতে পার যাতে আমীর শীগ্‌গির দেশে ফিরে যান?

রুদাগী তখনই একটি কবিতা লিখে ফেল্লেন। তারপর দরবারে গিয়ে পড়ে শুনালেন—

হতে পারে প্রিয় আমু দরিয়ার বেলাভূমি বালুময়
আমার চরণে মখমল সম কোমল সে মনে লয়।
কলঢেউ তার উছলি উঠিবে তাজীর রিকাব বেয়ে
মত্ত আবেগে নাচিয়া উঠিবে বন্ধুরে পুনঃ পেয়ে।

খুশীর খবর! হর্ষোল্লাসে হয়ে যাও ত্বরা মাত,—
আসিতেছে প্রিয় আমীর মোদের! বোখারা জিন্দাবাদ!
তুমি যে বোখারা, নীলিমা তাঁহার, সে তোমার চন্দ্রমা,
অচিরেই তুমি জোছনায় তার হয়ে যাবে মনোরমা।
তুমি যে তাঁহার শুনো প্রান্তর, তিনি তব সাইপ্রাস,
তোমার বক্ষে পাবে পুন প্রিয় তোমার সে তরু-রাজ।

কবিতা শুনে আমীরের দিলে তুফান উঠল। তিনি এক লাফে সিংহাসন হতে নেমে এলেন এবং আর এক লাফে নিকটতম রক্ষীর ঘোড়ায় চড়ে বোখারার পানে ছুটলেন।

ফুল আর সঙ্গীত—এ উভয়কেই ইরানীরা তাদের তত্বসাধনার উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছিল। ফুল ছিল তাদের বনে, ফুল ছিল তাদের মনে, ফুল ছিল তাদের মোনাজাতে। বলছেন ছুফী কবি হাফিজ—

'আয় রব্, দর ওয়াক্তে গুল গুনাহে বান্দারা আফু কুন।'
(ফুলের মউছুমে, প্রভু, মাফ করো এ বান্দার পাপ।)

বসন্তে যখন তোমার পেলব পরশে এ ধরণীর বাগিচায় ফুল ফুটিয়ে তার পাপড়িতে পাপড়িতে এঁকে দাও বিচিত্র রঙের আলিপনা, তার বুকে কর অমৃতসম মধু সঞ্চার, আর মাখিয়ে দাও তার গায় অপূর্ব সৌরভ, সেই যে তোমার সুন্দর কোমল গন্ধবিভোর মধুময় মুহূর্ত, সেই সময়, হে প্রভু, তোমার বান্দাকে ক্ষমা করো। তোমার ভয়াল রুদ্র মুহূর্তে পুণ্যের হিসাব দিয়ে বান্দা পাড়ি পেতে পারবে না।

দরবেশ আল্লার ধ্যানে দীর্ঘকাল মগ্ন ছিলেন। তাঁর ধ্যান এবার ভেঙেগেছে। ব্যাকুল ভক্তরা জিজ্ঞাসা করছে; 'আল্লার কি মহান তত্ব নিয়ে এলেন, শাহানশা, আমাদেরে একটু বলুন।' দরবেশ কেঁদে বলেন, 'বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল, পেয়ারে ভাইয়েরা আমার, যে তোমাদের জন্য অনেক খোশখবর নিয়ে আসব। কিন্তু হায়, তাঁর তত্ব-সুধা পান করে সব যে

ভুলে গেলাম!' শেখ ছাদী এই কথাটি বলেছেন ইরানী-সুলভ ফুলের ভাষায় ঃ

'ধ্যানের কাননে ভ্রমণ করিয়া
ফিরিয়া আসিনু যবে,
কি এনেছ, সখে, উপহার দিতে?
হাসি সুধাইল সবে।
কহিনু, কি দিব? ভাবিনু কুঞ্জে
কুসুম চয়ন করি
প্রীতি উপহার দিব তোমাদেরে
আনি অঞ্চল ভরি।
হায় গো যখন গোলাব কাননে,
মত্ত সুরভি পশি
হৃদয় আমার মুগ্ধ করিল,
আঁচল পড়িল খসি!'

দরবেশ তাঁর আস্তানার নির্জন হুজরায় গভীর ধ্যানে দিন গুজরান করছেন। তপস্যার কঠোরতায় দিল তাঁর শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে উঠেছে; তাঁর পথভ্রান্ত তওবা ঐ আস্তানার আনাচে কানাচেই অনুদিন ঘুরে মরছে। অকস্মাৎ তাঁর কানে ভেসে আসে বহুকাল-না-শোনা এক জীবনময় বাণী ঃ পাশের রাস্তা দিয়ে বীণা হাতে চলেছে এক উন্মনা পথিক ঃ সে বাজায় আর গায়, গায় আর বাজায়। দরবেশ ব্যাকুল ভাবে আস্তানা হতে বেরিয়ে আসেন; বীণাবাদককে ডেকে বলেন ঃ

ভ্রান্তপথে হে বন্ধু বাদক,
চলিয়াছি এতদিন,
তুমি আছ ঠিক পথে—

আবার বাজাও,
পাঠাব তওবা মোর
ওরই ঝঙ্কার রথে।

শ্যামা আর পরওয়ানা কখনো আশিক মাশুকের, কখনো বা শুধু ইশকের প্রতীকরূপে ইরানী সাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। আশিক কবি ছাদী—তাঁর অপূর্ব আশিকানা ভাষায় বলে যাচ্ছেন ঃ

নিঝুম গগন, নিঝুম পবন
নিঝুম গভীর রাতি
নিঝুম কক্ষে জ্বলে অনিমিখ
নিঝুম মোমের বাতি।
কোমল পাখার চিকন হাওয়ায়
—ফুলের নিশাস সম—
তন্দ্রা অলস মুদ্রিত আঁখি
সহসা খুলিল মম।
হেরিনু, বেদিল পরোয়ানা এক
মুহু মুহু শামা পানে
পক্ষ ঝাপটি আসে আর যায়—
কেন কে বা তাহা জানে?
আবার ছুটিয়া আসে পুন যায়,
ফের আসে বেগে ফিরেঃ
হাসি শামা কয়—রঙীলা পতঙ্
অভিনয় এ বা কিরে?
মম জীবনের সুন্দর সখা
প্রিয় আল্লার লাগি

বিরহের শিখা মস্তকে জ্বালি
সারা রাত আছি জাগি।
মগজের মোমে মম দীপ জ্বলে
কলিজা গলিয়া ঝরে
আহা বা উহুর একটি নিশাস
তবু নাহি মোর পড়ে।
রে ভণ্ড প্রেমিক ব্যথার পরশ
দেহে বা ক্ষণেক লাগে,
তারই ভয়ে তুমি ছুটিয়া পালাও
ধিক্ তব অনুরাগে!
পরোয়ানা কয়, বন্ধুগো শামা,
কথা শুনি হাসি পায়,
বখীলের মত তিল তিল জ্বলো,
তবু লাজ নাহি তায়?
আমার বঁধুর ইশ্ক আগুনে
পাগল আমি যে তাই
উল্কার মত ছুটিয়া বেড়াই
পরাণে শান্তি নাই।
এই হের মোর দেহের আহুতি
দিনু তাঁরই প্রেমানলে—
উল্লাসি শিখা দয়িতে লইল
আপন বক্ষ তলে!

শামা পরওয়ানার এই প্রতীকবাদের মউজ ইরানের সীমা পার হয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই মোগল-ভারতের দরবারে দরবারে সে তরঙ্গাঘাতের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। সম্রাট জাহাঙ্গীর আর সম্রাজ্ঞী নূরজাহান আলোক-উজ্জ্বল শাহী বাগে সান্ধ্য-ভ্রমণ করছেন। একটা

পরওয়ানা কোথা হতে অকস্মাৎ ব্যাকুল হয়ে এসে বাতির আগুনে ঝাপিয়ে পড়ে পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। সম্রাট বল্লেন, দেখেছ, নুরজাহান? আমি ঐ পরওয়ানার মত ঃ ইশকের আগুনে অবলীলাক্রমে আত্মাহুতি দেই।

ডেকে ডেকে যারা মাথাকে ধরায় সে বুলবুল আমি নই;
আমি পরোয়ানা—পুড়ি তবু কভু আহা উহু নাহি কই।

সম্রাজ্ঞী তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন—

আমি জাহাঁপনা নহি সে পরোয়ানা নিমেষে যে যায় পুড়ি;
আমি মোমবাতি, জ্বলি সারা রাতি, তবু না দুঃখ করি।

বাদশা হেসে বল্লেন—বেগম, আমি এবারো তোমার কাছে হার মানলাম। বেগম কৃত্রিম কুর্নীশ করে বল্লেন—জাহাঁপনার মহানুভবতাকে ছালাম।

তারপর ইরানের ছুফী দরবেশদের কথা। ইছলামের মানবতাকে তাঁরা কি মনোরম রূপই না দিয়েছিলেন! রেশমের পোশাক ছেড়ে পশমের কম্বল হয়তো তাঁরা কেউ কেউ পরেছেন; গৃহের অঙ্গন ছেড়ে দূরান্তের আস্তানায় হয়তো তাঁরা কেউ কেউ আংশিক সময় কাটিয়েছেন। কিন্তু এ বিপুল মানব সমাজকে উপেক্ষা করে কেবল নিজের জন্য নাজাত তাঁরা কখনো অন্বেষণ করেন নাই। তাই তাঁদের ঐ আপাতদৃশ্যমান শুষ্ক বহিরাবরণের অন্তরালে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত তাঁদের দিল মানব-প্রেমে অনুক্ষণ উজ্জীবিত ছিল।

আল্লাকে তুষ্ট করার ভ্রান্ত চেষ্টায় যারা মানুষের মনে আঘাত হানত, ইরানের ছুফী কবি তাঁদেরে লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ

নরের হৃদয় জয় কর ভাই, শ্রেষ্ঠ হজই তাতে,
হাজার কাবার চেয়েও হৃদয় বড় জেনো তুমি,

কাবা? সে তো আজর-তনয় গড়ল আপন হাতে
হৃদয় সে যে স্বয়ং বিশ্বপতির বিহার ভূমি।*

হজরত ইব্রাহীমের কাহিনী। তাঁর বাড়ীতে বৃদ্ধ মুছাফির : তিনি নিজেই রাস্তা হতে ধরে এনে খেতে দিয়েছেন। মুছাফির 'বিছমিল্লা' না বলে খেতে শুরু করে। হজরত ক্ষুণ্ণ হন। মুছাফির বলে, আমি যে ভাই, ইহুদী; ইহুদী তো বিছমিল্লা বলে খায় না। হজরত রেগে যান। মুছাফির খাবার রেখে চলে যায়। তখনই আল্লার তরফ হতে আওয়াজ আসে, ইব্রাহীম, আমি আশী বছর এই লোকটিকে খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছি, তুমি একটা বেলাও তাকে সইতে পারলে না? হজরত হায় হায় করে মুছাফিরকে ফিরিয়ে আনতে বেরিয়ে যান।

ইরানের অন্যতম ছুফী কবি শামছে তাব্রীজ : জাতিতে জাতিতে, ধর্মে ধর্মে রেষারেষি দেখে ব্যাকুল হয়ে পড়েন। হয়রান হয়ে বলেন : আমি কি? আমি খৃষ্টান নই, ইহুদী নই, অগ্নি উপাসক নই, আমি বুঝি মুছলমানও নই! আমি যে মহামানবের মধ্যে আমাকে হারিয়ে ফেলেছি!

বেদনার্ত কণ্ঠে কবি কেঁদে জিজ্ঞাসা করেন—

ওরে ও মুমিন ভাই,
আমারে যে আমি চিনিতে নারিনু
তার তরে কোথা যাই?**

---

* দিল বদস্ত্ আর কে হজ্-এ আকবর আস্ত
আজ হাজারাঁ কাবা একদিল খোশতর আস্ত্।
কাবা বুনগাহে খলীলে আজর আস্ত্
দিল গুজার গাহে জলীলে আকবর আস্ত্।

** চে তদবীর আয় মুছলমানাঁ, কে মন খোদরা নামিদানম?

ইরানী কবিতার পেলব পরশে দুরন্ত বিজয়ী পাষাণ হৃদয়ের কবাটও অনায়াসে খুলে গিয়েছে।

তখন তৈমুর লঙের বিজয় রথ সামনের সমস্ত বাধাবিঘ্নকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। নিহতদের রক্তে ভেসে যাচ্ছে বিজয় অভিযানের পথ, আহতের হাহাকারে ভরে উঠেছে সে পথের আকাশ বাতাস।

তৈমুর শীরাজ নগরে এসে পৌছেছেন। তাঁর সম্মুখে আনীত বহু বন্দীর মধ্যে কবি হাফিজও একজন। দরবারের এক মোছাহেব বল্ল ঃ

'জাহাঁপনা, বন্দীদের মধ্যে একজন কবি আছেন,—নাম তাঁর হাফিজ।'

তৈমুর ঃ—বটে! আচ্ছা, কবি, দু-লাইন কবিতা শুনাতে পারেন?

হাফিজ ঃ—জো হুকুম—

আগার আঁ তুরকে শিরাজী বদস্ত্ আরদ দিলে মারা
বখালে হেন্দুয়শ বখশম ছমরকন্দ ও বোখারারা!*

তৈমুর ঃ—বাঃ বাঃ—চমৎকার। কিন্তু কবি, একথা সত্য যে আপনিই এ কবিতা লিখেছেন?

হাফিজ ঃ—জাহাঁপনা, একথা সত্য যে, বান্দাই এ কবিতা লিখেছে।

তৈমুর ঃ—(কৃত্রিম কোপের সঙ্গে গম্ভীর কণ্ঠে) বোখারা সমরকন্দ আমার প্রিয়তম নগর; তাদেরই সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য আমি দুনিয়া তয় করে ফিরছি। আর আপনি তা হেলায় দান করে দিচ্ছেন আপনার প্রিয়ার গালের একটি তিলের জন্য?

হাফিজ ঃ—জাহাঁপনা, ঐ রকম বেহিসাবী দানের জন্যই তো

---

* যদি সে শীরাজ সুন্দরী তুলে নেয় মোর দীর্ণ দিল ভার,
সমরকন্দ ও বোখারায় দেই বদলে তার গালের তিলটার।

আমার এ দুর্দশা।

তৈমুর ঃ—(সোল্লাসে) তোফা—তোফা! খাজাঞ্চী, এই কবিকে দশ হাজার আশরফী দিয়ে সসম্মানে বাড়ী পৌঁছিয়ে দাও।

দুদিনের জন্য এসেছিলাম এই কায়কাউস দরায়ুসের রাজ্যে, এই ছোহরাব রোস্তমের রণাঙ্গণে, এই ফেরদৌছী-হাফিজের দেশে, এই ছাদী জামীর জন্মভূমিতে, এই উরফী ওমরখাইয়ামের কাব্য কানন অঙ্গনে। এঁদের কারো শেষ শয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়াবার সৌভাগ্য হল না। মনের মুকুরে এঁদের ছবি বার বার ভেসে উঠতে লাগল; শুধু মনে মনে শ্রদ্ধা নিবেদন করেই বিদায় হলাম।

১লা অক্টোবর অপরাহ্ন দুইটার সময় আমরা তেহরাণ হতে করাচী যাত্রা করলাম। হাওয়াই ষ্টেশনে রাজা গজনফর আলী খাঁ ও দূতাবাসের অন্যান্য বন্ধুগণ হাজির থেকে আমাদেরে সর্বপ্রকার সাহায্য করলেন। তাঁদের সবাইকে আমরা কৃতজ্ঞতাময় অভিবাদন জানিয়ে বিছমিল্লা বলে হাওয়াই জাহাজে গিয়ে উঠলাম।

করাচী
হাওয়াই ষ্টেশন
৪ঠা অক্টোবর, ১৯৫১

ভাই চৌধুরী সাহেব,

আপনাকে বহুদিন হয় কোন খবর দেই নাই। আপনি বলেছিলেন, করাচীতে ফিরেই যেন আপনাকে জানাই। তাই লিখছি।

১লা অক্টোবর রাত ৮টায় আমরা করাচী হাওয়াই ষ্টেশনে পৌঁছলাম। এসেম্বলীর প্রেসিডেণ্ট মৌলভী তমিজুদ্দিন খাঁ ও এসেম্বলীর ডিপুটি সেক্রেটারী খোন্দকার আলী আফজাল সাহেবদ্বয়

আসছেন, কাজেই এসেম্বলীর সেক্রেটারী, সহকারী সেক্রেটারী, লাইব্রেরীয়ান ও সুপারিনটেনডেন্ট সাহেবরা মালা নিয়ে ষ্টেশনে হাজির হলেন। যে ছুলেহ্‌দের সাথে ছিলাম, তাঁদের ছোহবতের বরকতে আমিও ফাওয়ের উপর একটা মালা পেয়ে গেলাম। হঠাৎ টের পেলাম, আমরা তিন জনেই হাজী; ঐ সম্বোধনে আমাদের অভ্যর্থনাকারীরা আমাদের সাথে কোলাকুলি করলেন; বল্লেন, মোবারক হো— মোবারক হো।

আলী আফজাল সাহেবের ছেলেমেয়েরা ষ্টেশনে এসেছিল। তারা তাদের আব্বাকে লুফে নিয়ে বাড়ীর দিকে পালিয়ে গেল। এই চুরিত হওয়া ব্যাপারে আলী আফজাল সাহেব নিজে যে সানন্দে এবেটারী করলেন, তাতে কারো সন্দেহ রইল না; হাজার হলেও এতদিন পরে তো----! তমিজুদ্দিন খাঁ সাহেবের তাড়াহুড়া করার জন্য কোন গরজ দেখলাম না। তার নিতান্ত সঙ্গত কারণও ছিল ঃ

এ মহাভাদরে
ভরা বাদরে
শূন্য কুটীর মোর।

তমিজুদ্দীন খাঁ সাহেবের বাড়ীতে মুছাফির হলাম। তিনি পরম আদরে মেহ্‌মানদারী করলেন। কিন্তু তাঁর সহ-ব্যথী হয়ে অনুভব করলাম, বাড়ীটা খা—খা—করছে।

আজ রাত দশটায় হাওয়াই আফিসে চলে এলাম। এখান হতে রাত দুইটায় হাওয়াই ষ্টেশনের বাস্‌ ছাড়বে। এখানে এই চার ঘণ্টার কারাজীবন যাপন করতে হবে। উহ্‌!

দুইটি, চারটি করে যাত্রী ক্রমে এসে জমা হচ্ছে। এক কাফেলায় দশটি লোক এসে পড়ল। বুঝলাম এঁরা হাজী, বাড়ী ফিরছেন।

জিজ্ঞাসা করে জানলাম—ঢাকার বাসিন্দা; পাট আর ধানের কারবার করে টাকা করেছেন, তারই শুকরীয়া স্বরূপ আল্লার পথে কিছু খরচ করে এলেন। অত্যন্ত খোশ মেজাজ, চোখে মুখে তৃপ্তি আর সাত্বিকতার দীপ্তি। দলের একজন হাজী অত্যন্ত চটপটে, তাঁর মুখ হতে সিগারেট আর নামে না; উর্দু জবানে বাতচিত করতে উগ্র উৎসাহ—হাওয়াই ষ্টেশনের কর্মচারীর সঙ্গে কারণে অকারণে গিয়ে আলাপ শুরু করে দেন—'আচ্ছা, উড়োজাহাজ কখন্ ছাড়তা হ্যায়? ঢাকামে গিয়া কখন্ পোঁছতা হ্যায়? রাস্তামে খাওয়া দাওয়া ক্যায়া দেওয়া হোতা হ্যায়? কর্মচারীটির রসজ্ঞান আছে, রাগ করেন না; তাঁর ঠোঁটের তীর বেয়ে মৃদু হাসির সূক্ষ্ম ধারা ধীরে ঢেউ খেলে যায়; তিনি খোশ তবিয়তের সঙ্গে সব ছওয়ালের জওয়াব দিয়ে যান। আমি তাঁর সিগারেট খাওয়ার ধূম দেখে আমার সাথীকে বল্লাম— এ ভদ্রলোক নিশ্চয় হালে সিগারেট এস্তেমাল করছেন? সাথীর কৌতূহল হল। তিনি কাফেলার একজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বল্লেন—লোকটি নেহায়েত ভাল—আগেও ভাল ছিলেন, এখনো ভাল আছেন। কোন দিন তামাক চুরুট খেতেন না। মক্কা শরীফে গিয়ে যখন দেখলেন যে সেখানকার লোকেও তামাক সিগারেট খায়, তখন থেকে ভীষণ ভাবে তামাক সিগারেট শুরু করলেন।

একটি মস্ত জোয়ান—একা বসে আছেন—চুপ চাপ। কাছে গিয়ে আলাপ শুরু করলাম। ব্যথায় ভরা তাঁর সেই বিরাট বুক। বাড়ী পেশোয়ার—পেশা তেজারতী—ধন দৌলতের মালিক—অনেক হাজার টাকা জাকাত দেন—বিবি হজে গিয়েছিলেন,—সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন জোয়ান বড় ছেলেকে—সে সব সইতে পারবে, বুড়া মাকে মদদ দিতে পারবে—পথে এসে সেই ছেলেই মারা গেছে—বিবি জেদ্দায় আটক আছেন—তাঁকেই আনতে যাচ্ছেন। তাঁর চোখ ছলছল করে উঠল---মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন।

রাত ১১টা, ১২টা, ১টা বেজে গেল। যাত্রীদের চোখে ঘুম নেমে এসেছে। সবাই বসে বসে ঝিমাতে শুরু করেছেন—দুই একজন চালাক বান্দা—তাঁরা সটান শুয়ে পড়লেন। কারো কারো নাকের বাঁশীতে বিচিত্র সুর বেজে উঠছে।

এই জন-অরণ্যে কি জানি কেন অকস্মাৎ আমার একা—নিতান্ত একা মনে হচ্ছে। চিন্তার স্রোত কালের উজান বেয়ে চলে যাচ্ছে আজ হতে ক্রমে দশ, বারো, পনর, বিশ বছর আগের ঘটনাবলীর দিকে। তখন আমরা করটিয়ায় ছিলাম—আমি, আপনি, ছৈয়দ সাহেব, সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব, ম্যানেজার সাহেব, মৌলভী সাহেব, কাজী সাহেব, স্বয়ং চাঁদ মিঞা সাহেব। প্রায় প্রতি বিকালেই আমরা একত্র বসতাম—পুকুরের পারে—দুর্বার মখমলের উপর—কত আলাপ, কত আলোচনা, কত স্বপনের জাল বুনন, ধর্মের কত সমস্যার বিশ্লেষণ। কতবার বলেছি—যদি আমরা কখনো যাই, এক সঙ্গে হজে যাব। অন্যের পক্ষে মক্কার পথ হয় কষ্টের পথ, আমাদের পক্ষে মক্কার পথ হবে গজলের পথ, কাব্যের পথ, আনন্দের পথ, সাত্বিক উৎসবের পথ। কিন্তু সে একত্রে যাওয়া আর এ জীবনে ঘটে উঠল না। মনে আছে, চৌধুরী সাহেব, করটীয়া বড় তরফের ডাকবাংলার সামনের সেই নিম গাছটির কথা? ওরই তলে একদা সন্ধ্যায় আমি, আপনি আর মৌলভী আহ্ছান উল্লা সাহেব বসে আলাপ করছিলাম। নিম গাছের ডাল আর পাতার ফাঁকে ফাঁকে নবমীর চাঁদ চুপি চুপি উঁকি দিচ্ছিল। আমাদের মজলিসে চলছিল চা, তামাক আর গল্প। সাতটা, আটটা বেজে গেল—আমরা তবু আলাপে মশগুল। নয়টা বাজে বাজে হল। আপনি উঠতে চাইলেন। আমি আপনার জামার দামন ধরে টেনে ওমর খাইয়ামের সুরে বল্লাম—বন্ধু, আজ আরো কিছুক্ষণ এখানে বস ঃ এই গাছ, এই চাঁদ, এই রাত, সব এমনি থাকবে, শুধু আমরা এখানে আসর জমাবার জন্য থাকব না। বন্ধু, সেদিনের সেই ছোট্ট কথাটুকু আজ কত সত্য হয়েছে; তাই ভাবুন। আমাদের সে তারার সভা

নিদারুণ ভাবে ভেঙ্গে গেছে, আর কোন দিনই তা জমবার নয়। আটিয়ার চাঁদ বহু দিন হয় ডুবে গেছে, অকালে নিভে গেছে তাঁর বংশ-প্রদীপ মছউদ আলী; রসের রাজা কাজী মহফুজুর রহমান ওপারে চলে গেছেন, চিরস্নেহশীল বন্ধু ছৈয়দ বদরুদ্দোজা আর নাই, দরাজদিল ধর্মপ্রাণ ম্যানেজার মৌলভী আবদুল খালেক এ মায়ার জগৎ হতে মহাপ্রয়াণ করেছেন, জ্ঞান-গরীয়ান মওলানা বদিউর রহমান পরলোকে, কৌতুক-স্নিগ্ধ খোন্দকার তাজাম্মুল হোছেন চলে গেছেন পাবনা কলেজে, কাব্যামোদী ছৈয়দ আবদুল হালীম চলে গেছেন সুসং দুর্গাপুর, আপনি শরীফ আবুল খায়ের চৌধুরী চলে গেছেন রাজশাহী, আমি বান্দা চলে এসেছি ঢাকা। করটীয়ায় আমাদের সে আসরের চার পাশে বুনেছিলাম মহুয়ার চারা—আমাদের আসরের নাম দিয়েছিলাম মহুয়া মজলীস। সে মহুয়া গাছ এখন বড় হয়েছে; কিন্তু সে মজলিস আর সেখানে নাই। শুনতে পাই মাঝে মাঝে মওলানা আহ্ছান উল্লা আর মৌলভী ছেকেন্দার আলী সে গাছের তলে গিয়ে বসেন, কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পারেন না; একটা 'আহ্!' বলে উঠে উদাসীন ভাবে অন্যত্র চলে যান।

স্কুলের ক্লাসে মিসেস হিমান্সের কবিতা পড়েছিলাম, এখনো কিছু কিছু মনে পড়ে—তারা কয়টি ভাই—এক বোঁটার ফুলের মত একই পরিবারের কোলে তারা কত নিবিড় স্নেহের বন্ধনের মধ্যে বড় হয়েছিল—তারপর এল সংসারের ডাক—একজন গেল নৌবহরে, নীল আতলান্তিকের গভীর তলদেশে—সে মরকত শয্যায় শুয়ে আছে,—আর একজন গেল স্থল-সৈন্য বাহিনীতে,—সাহারার ধু-ধু মরুবুকে বেছে নিয়েছে সে তার শেষ শয়ন স্থান, আর একজন বুঝি গেল উত্তর-মেরু অভিযানে, চিরশুভ্র তুষার-স্তবকের তলে সে পড়েছে ঘুমিয়ে।

আচ্ছা, আপনি তো ছাচ্চা-দিল মানুষ, বরাবর সাত্বিক জীবন যাপন করে আসছেন—আপনি কি ওপারের কিছু আভাষে হলেও দেখতে পান? সভা ভেঙ্গে যারা আগেই চলে গেলেন, তাঁরা কি আমাদের জন্য তথায়

প্রতীক্ষায় থাকবেন? ফের কি সেখানে আমরা মিলিত হব? আবার জমবে কি তথায় আমাদের মহুয়া মজলিস?

খট্ খট্ আওয়াজে চিন্তার স্রোতে বাধা পড়ল। চোখ তুলে চাইলাম। দেখি—আমার সহপাঠী জাহাঙ্গীর খাঁ। জাহাঙ্গীর খাঁ প্রাণের প্রাচুর্যে চির-চঞ্চল—করাচীতে চাকরী করে,—ছুটীতে দেশে চলেছে। আমাকে দেখেই সে উল্লাসে চীৎকার করে উঠল ঃ

'হ্যালো, আল-হজ্, তবে মক্কার এবারের আগুন হতে সত্যি জান নিয়ে ফিরে এলে?

'এত বড় জল-জ্যান্ত মানুষটা চোখের সামনে দেখেও কি তোমার সন্দেহ হচ্ছে, ভাই?

'আচ্ছা, পরখ করে দেখতে দাও ঃ হ্যাঁ—এই নাক, এই চোখ, এই মুখ—না, এ ভূতের নয়, প্রেতের নয়, পরমাত্মারও নয়—এ তোমার। স্বীকার কচ্ছি, ভাই, তুমি তুমিই আছ।

'যাক, বেঁচে গেলাম।

'কিন্তু, ভাই, এত দেশ দুনিয়া তয় করে ফিরছ, সঙ্গে তো কিছু দেখছি না—কি নিয়ে এলে?

'নিয়ে এলাম শুধু একটি জিনিস।

শুধু একটি জিনিস? শুনতে পারি সে মহামূল্য জিনিসটি কি?

'সেটি মানুষের প্রতি আমার অবিচল শ্রদ্ধা।

'বটে!

'হ্যাঁ,—আর একেই আমি আমার জীবনের পরম সম্পদ মনে করি।

'আল্লা, রছুল, মক্কা, মদীনা—এর কোনটি সম্বন্ধেই তোমার কিছু বলবার নাই?

'আল্লাকে আমি দেখি নাই, দেখেছি তার বান্দাকে, আর কিঞ্চিৎ দেখেছি বান্দার প্রতি তার অপার দরদের দরিয়াকে। রছুলুল্লার দেশে গিয়েছিলাম। মক্কা, মদীনা, তায়েফ, আরাফাতের ধূলায় তাঁর যে পবিত্র

পদচিহ্ন দেখে এলাম, সেও এই মানুষের প্রতিই তাঁর অফুরন্ত দরদের সুস্পষ্ট পরিচয়।

RAMNOGOR ELEVEN BULLET CLUB
Estd. 1967
P.O. SHARIAKANDI,
DIST. BOGRA.

'তারপর?

'আল্লা রছুলের এই প্রেম-মহীয়ান মানুষকে আমি দেশে দেশে দেখে এলাম। দেখলাম, তারা বর্ণে এক নয়, ধর্মে এক নয়, চেহারায় এক নয়, চরিত্রে এক নয়, ভাষায় এক নয়, ভঙ্গীতে এক নয়—কিন্তু একটি বিষয়ে তারা সবাই এক—তারা দরদী মানুষ। সাময়িক স্বার্থবুদ্ধি, সাময়িক ক্রোধ, সাময়িক নির্বিচার সংস্কার তার দরদী দিলকে সাময়িক ভাবে ছায়াচ্ছন্ন করতে পারে, চিরতরে তাকে ঢেকে রাখতে পারে না। এই মানুষের প্রতি আমার অবিচল শ্রদ্ধা—তার মহান ভবিষ্যতের প্রতি আমার অপরিমেয় বিশ্বাস।

পোঁ—পোঁ—পোঁ, হাওয়াই ষ্টেশন—যাত্রী 'বাসের' বাঁশী বেজে উঠল। গিয়ে উঠলাম।

নীড় ছাড়া পাখী নীড় পানে ফিরে চল্ল।

RAMNOGOR ELEVEN BULLET CLUB
Estd. 1967
DATE ... ...
P.O. SHARIAKANDI,
DIST. BOGRA.

পদচিহ্ন দেখে এলাম, সেও এই মানুষের প্রতিই তাঁর অফুরন্ত দরদের সুস্পষ্ট পরিচয়।

RAMNOGOR ELEVEN BULLET CLUB
Estd. 1967
P.O. SHARIAKANDI,
DIST. BOGRA.

'তারপর?

'আল্লা রছুলের এই প্রেম-মহীয়ান মানুষকে আমি দেশে দেশে দেখে এলাম। দেখলাম, তারা বর্ণে এক নয়, ধর্মে এক নয়, চেহারায় এক নয়, চরিত্রে এক নয়, ভাষায় এক নয়, ভঙ্গীতে এক নয়—কিন্তু একটি বিষয়ে তারা সবাই এক—তারা দরদী মানুষ। সাময়িক স্বার্থবুদ্ধি, সাময়িক ক্রোধ, সাময়িক নির্বিচার সংস্কার তার দরদী দিলকে সাময়িক ভাবে ছায়াচ্ছন্ন করতে পারে, চিরতরে তাকে ঢেকে রাখতে পারে না। এই মানুষের প্রতি আমার অবিচল শ্রদ্ধা—তার মহান ভবিষ্যতের প্রতি আমার অপরিমেয় বিশ্বাস।

পোঁ—পোঁ—পোঁ, হাওয়াই ষ্টেশন—যাত্রী 'বাসের' বাঁশী বেজে উঠল। গিয়ে উঠলাম।

নীড় ছাড়া পাখী নীড় পানে ফিরে চল্ল।

RAMNOGOR ELEVEN BULLET CLUB
Estd. 1967
DATE ... ...
P.O. SHARIAKANDI,
DIST. BOGRA.